লোক-সংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী এম. এ., পি. এইচ. ডি.



বুক ট্রাস্ট
৩০/১ বি. কলেজ রো. কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, ১৩৮৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

অঙ্গসজ্জা : আশিস পাল ও পল্লব মুখোপাধ্যায়

বুক ট্রাস্ট ৩০/১ বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং লিপি মুদ্রণ ৫২/১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে যশোদা মাইতি কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

লোক-সংস্কৃতি চর্চায় আমার হাতেখড়ি যাঁর কাছে

অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

শ্রীচরণেষু

সূচী



বাংলা ছড়ার পাঠান্তর

রবীন্দ্রনাথ যদৃচ্ছভাসমান মেঘের সঙ্গে বাংলা ছড়াগুলিকে তুলনা করে বলেছেন : 'উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছ-ভাসমান।' বাস্তবিক লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রেই যদিও এই পরিবর্তনশীলতা লক্ষিত হয়ে থাকে, তবু বাংলা ছড়ার ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা যেন সর্বাধিক।

ব্যক্তিবিশেষের রচনা সকলের উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু তাকে ইচ্ছামত পরিবর্তিত করার অধিকার কারো নেই। কেবল লেখক নিজেই প্রয়োজনবোধে এক সংস্করণে প্রকাশিত রচনা অন্য সংস্করণে পরিবর্তন করার অধিকারী এবং প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করেও থাকেন। কিন্তু লোকসাহিত্য যেহেতু সংহত সমাজের সৃষ্টি ব্যষ্টির সৃষ্টি নয়, তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার রীতি প্রযুক্ত হয় না। অর্থাৎ একই উপাদান, একই রচনা বিভিন্ন জনের হাতে পড়ে বিভিন্ন রকম রূপ লাভ করে। তবু লোকসাহিত্যের অপরাপর উপাদান যেমন—প্রবাদ, ধাঁধা, গান কিংবা লোককথার তুলনায় ছড়ার রাজ্যেই পাঠান্তর কেন সর্বাধিক লক্ষিত হয়, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশেষভাবে সেই বিষয়েই আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমরা কয়েকটি ছড়ার প্যঠান্তর উদ্ধার করছি।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'ছড়া' পর্যায়ে কুঞ্জলাল রায়ের সংগৃহীত একচল্লিশটি ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে দশ সংখ্যক ছড়াটি হল—

আগডুম বাগডুম
ঘোড়াডুম সাজে,

লাল ঘেঘর,
ঘাঘর বাজে,
বাজাতে বাজাতে
চল্লো ডুলি,
ডুলি গেল সেই কমলাপুলী,
কমলা পুলীর টিয়েটা
সুর্য্যি মামার বিয়েটা
হাড় মড় মড় কেলে জিরে,
রসুম কুসুম পানের বিড়ে,
চল পিয়ারী হাটে যাই,
হাটে যেয়ে কি খাই,
পান কোশাটা কিনে খাই,
একটি পান ফোঁপরা,
দু সতীনে ঝগড়া
শাস্তের উপর ধেয়ে নাচে,
জল তোলাবার বয়স আছে,
দিনের ভাগে খায় কি ?
কেলে গোরুর দুধ,
তেল কুচ্‌কুচ্‌ বেগুন ভাজা, কুচ্‌ ॥

এই ছড়াটিরই আর একটি পাঠান্তর কুঞ্জলাল রায়ের সংগৃহীত চোদ্দ সংখ্যক ছড়ায় বিধৃত হয়েছে—

আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ডান সিগড়ি ঘুংগুর বাজে ॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো ধুলি।
ধুলি গেল মোর কমলাপুলি ॥
কমলা পুলির টিয়েটা।
সুর্য্যি মামার বিয়েটা ॥
হাড় মড় মড় কাল জিরে।
রসুন কসুন পানের বিঁড়ে ॥
আয় লঙ্গ হাটে যাই।
পান সুপারি কিনে খাই ॥
একটী পান কোঁকড়া।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ॥

পান খাবি না খিলি খাবি।
টোস্কা মেরে চলে যাবি ॥
নাচ দুয়ারে ব্যাঙের কুটী।
ঝাপ দিয়ে দিয়ে একটী মুটী ॥

এই একই ছড়ার আরও একাধিক পাঠান্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে বিভিন্ন জনের সংগ্রহে। যেমন ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত 'ছড়াছড়ি' (১৩৫৪) পুস্তিকায় এই ছড়াটিরই ঈষৎ পরিবর্তিত এক রূপের সন্ধান মেলে—

অ্যাংটুল ব্যাংটুল ঘোড়াটুল সাজে।
ঢাল মেঘর ঘোঘর বাজে ॥
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল কমলাপুলি ॥
কমলাপুলি টিয়েটা।
সুয্যিমামার বিয়েটা ॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
পান সুপারি কিনে খাই ॥
একটি পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
মামার নামে টগর ফুল ॥

মুর্শিদাবাদে এই ছড়াটির অন্য যে এক রূপ প্রচলিত আছে সেটি হল—

আগডুম্ বাগডুম্
সাজে কুজে।
খুকু বাঁধে খুকু খাই,
হেন খুকু দুঃখ পায়।
হেন কা ছুটা পানের বাটা,
তুলে আনগা কাপাস কোটা
ইলির ভুয়ে বিলি ফল,
শাক শীতল কামরা ॥

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই ছড়াটির চারটি পাঠের মধ্যে একটি পাঠ উদ্ধার করা গেল —

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাই মির্‌গেল ঘাঘর বাজে॥
বাজতে বাজতে প'ল ঠুলি।
ঠুলি গেল কম্‌লাফুলি॥
আয় রে কম্‌লা হাটে যাই।
পান গুয়োটা কিনে খাই॥
কাঁচ কুমড়োর ঝোল।
ওরে জামাই গা তোল্‌॥
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে—
কদম তলায় কে রে।
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ —
মাথায় কাপড় দে রে॥

এবারে অন্য একটি ছড়ার পাঠান্তরের সন্ধান নেওয়া যাক।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত [১৩০৩, বৈশাখ] কুঞ্জলাল রায় সংগৃহীত চল্লিশ সংখ্যক ছড়াটি হল ঘুমপাড়ানির ছড়া, যেটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত -

তালগাছ কাটম।
বোসের বাটম॥
গৌরী গো ঝি,—।
তোমার কপালে বুড়ো বর
আমি কর্ব্বো কি॥
চোখ থাক তোর মা বাপ,
চোখ থাক তোর খুড়ো।
এমন বরকে বে দিয়েছে,
তামাক খেকো বুড়ো॥
বুড়োর নস্য গেল ভেসে।
বুড়ো তামাক খাবে কিসে॥

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ছড়াটির আর একটি পাঠ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছড়াটি ছিল এইরকম—

তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী॥

টংকা ভেঙে শংখা দিলাম, কানে মদনকড়ি ॥
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি ॥
চোখ খাও গো বাপ — মা, চোখ খাও গো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাকখেগো বুড়ো।
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে ॥

এইবার যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া'য় প্রকাশিত ২১১ সংখ্যক ছড়াটি উদ্ধার করা গেল—

ধন ধন ধন,
বাড়ীতে ফুলের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই
তার কিসের জীবন ?
তারা কিসের গরব করে ?
আগুনে পুড়ে কেন না মরে ?

পরবর্তীকালে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এই ছড়াটির কয়েকটি পাঠান্তর প্রকাশ করেছেন। বর্ধমান থেকে সংগৃহীত ১৯ সংখ্যক ছড়াটি হ'ল—

ধন ধন ধন।
বাড়ীতে নটের বন।
এধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন ॥
তারা কিসের গরব করে।
উনুনে পুড়ে কেন না মরে ॥

২৩ সংখ্যক ছড়াটি হ'ল—

ধন ধন ধন
দর্প নারায়ণ ॥
এ ধন যার ঘরে নাই সে কিসের গরব করে।
এ ধন যার ঘরে নাই সে বৃথায় জীবন ধরে ॥

শেষোক্ত ছড়াটি বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত।

এইবার রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ৬২ সংখ্যক ছড়াটির পাঠ উদ্ধার করা গেল—

হরম বিবির খড়ম পায়।
লাল বিবির জুতো পায়॥
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই—
ঢাকা গিয়ে ফল খাই।
সে ফলের বোঁটা নাই॥

অপরপক্ষে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সংকলিত 'লোকসাহিত্যে ছড়া' গ্রন্থের ৩৭ সংখ্যক ছড়াটি হ'ল—

অরম দিদির খড়ম পায়।
লাল দিদির জুতা পায়॥
আয় লো দিদি ঢাকা যাই,
ঢাকা যাইয়া ফল খাই॥
এই ফলের গুটা নাই।
খাইলে ফল মরণ নাই॥

কাসিমপুরীরই নেত্রকোণা থেকে সংগৃহীত অনুরূপ ছড়াটি হ'ল—

নরম বিবির খড়ম পাও,
উঠ্ঠ্যা বিবি কালাই খায়।
কালাই খাইয়া ঢাকা যাও।
ঢাকা গিয়া ফল খাও॥
এই ফলের গুটা নাই।
খাইলে ফল মরণ নাই॥

এ'রকম উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উদাহরণের আধিক্য আর না ঘটিয়ে এইবার আমরা ছড়ার এই বিভিন্ন পাঠান্তরের কারণ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব।

কবিতায় যেমন একটা ভাবসংগতি রক্ষা করার আবশ্যকতা আছে, ছড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই ; বরং ছড়ার ক্ষেত্রে আদ্যন্ত যদি ভাবসংহতি বজায় থাকে, তবে তাতে ছড়ার মর্যাদারই হানি ঘটে। আদর্শ ছড়ায় তাই একটি অখণ্ড ভাব কিংবা ভাবনার পরিবর্তে স্থান লাভ করে অসংলগ্ন কয়েকটি ভাব, টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ছবি। আর এই কারণেই অনেকেই ছন্দোনির্মিতি কৌশলকে অবলম্বন করে ছড়া রচনায়

প্রয়াসী হন। সম্পূর্ণ একটি ছড়া রচনার ক্ষমতা কিংবা অবকাশ না থাকলেও অনেকেই পংক্তি বিশেষে, কখনও বা বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগে নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখেন। এক্ষেত্রে ছড়ার মূল কাঠামোটি কিন্তু বজায় রাখা হয়। এইভাবে একটি ছড়ার পাঠান্তর ঘটে।

আবার অনেক সময়ে অনিচ্ছাকৃতভাবেও ছড়ার অংশবিশেষ পরিবর্তিত হয়ে যায়। লোকসাহিত্যের ছড়া স্মৃতি নির্ভর হওয়ায়, অনেক সময়ই তা সম্পূর্ণ না হলেও পংক্তি কিংবা শব্দবিশেষ মানুষ বিস্মৃত হয়ে যায়। তারপরে ছন্দ বজায় রেখে বিস্মৃত অংশ নিজের পছন্দমত শব্দ বা চরণে পূরণ করে নেয়। এই ব্যাপারে অবশ্য নারীদেরই বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ পূর্বে আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল গৌরীদান প্রথা। অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হ'ত এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা দেওয়া হ'ত দূর-দূরান্তরে। এইভাবে কন্যা—বিবাহসূত্রে পিত্রালয়ে শোনা ছড়া স্মৃতিসূত্রের মাধ্যমে শ্বশুরালয়ে নিয়ে উপস্থিত হত। এক্ষেত্রে ছড়াগুলি একান্তভাবে স্মৃতিবাহিত হবার ফলে স্বাভাবিক কারণেই কিছু কিছু অংশ বিস্মৃতির গহ্বরে নিমজ্জিত হত এবং পরিবর্তিত হত। বিশেষতঃ ছড়ার ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযোজ্য হবার কারণ হল এই যে ঘুমপাড়ান, ছেলে ভুলান, স্নান করান প্রভৃতি দায়িত্বগুলি বিশেষভাবে নারীদের ওপরেই ন্যস্ত। তাই অল্পবয়সী কন্যারা তাদের শৈশবে ও বাল্যে জননী অথবা জননী-স্থানীয়াদের মুখ নিঃসৃত এইসব বিষয়ক ছড়াগুলির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেত, যা পরবর্তীকালে তাদের গার্হস্থ্য জীবনেও কার্যকরী হত অনেকখানি!

মানুষ মাত্রেরই কমবেশী সৃষ্টির ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সৃজনী ক্ষমতা সকলের থাকেনা। এক্ষেত্রে ছড়ায় যেহেতু ভাবসঙ্গতি রক্ষার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকেনা তাই ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেকেই পংক্তি বিশেষ বা শব্দ পরিবর্তিত করে নিজস্ব পংক্তি বা শব্দ যুক্ত করে স্বাধীন ভাবে রচনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই কোনো বিষয়কে হুবহু অবিকৃতভাবে প্রকাশ করেনা, করতে পারে না। আমরা যে কোনো প্রকাশেই অতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় দিই, অথবা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সংযোজন—বিয়োজন নীতির অনুসরণ করি। এভাবেও বহু ছড়ার পাঠান্তর ঘটে।

স্বতন্ত্র পরিবেশও ছড়ার পাঠান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অতি পরিচিত—

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবে কিসে ॥

—এই ছড়াটি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত। কিন্তু চট্টগ্রামে এটি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল—

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে।
গুলগুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে ॥

অর্থাৎ চট্টগ্রামে 'বর্গী'র স্থলাভিষিক্ত হয়েছে 'গরকী' শব্দটি যার অর্থ সামুদ্রিক ঝড়। চট্টগ্রামের মানুষ যেহেতু বর্গীর হাঙ্গামা প্রত্যক্ষ করেনি তাই তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত 'গরকী' শব্দটি অনায়াসেই 'বর্গীর' স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে অপরিচিত বুলবুলির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে 'গুলগুলি'।

স্থান ভেদে উচ্চারণে তফাৎ ঘটে। আঞ্চলিকতার প্রভাবে ধ্বনিগত পার্থক্যও ঘটে ছড়ার ক্ষেত্রে।

ছড়ার পাঠান্তরের ব্যাপারে অপত্যস্নেহও অনেকখানি দায়ী। কারণ স্নেহময়ী জননী ছড়ার মাধ্যমে আত্মজ সন্তানের প্রতি অন্তরের অন্তহীন স্নেহকে প্রকাশ করতেন। ফলে সব সময় প্রচলিত ছড়ায় গতানুগতিক বক্তব্য কিংবা উপমায় অনেক সময় তাদের মন ভরত না। নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা নতুন নতুন বক্তব্য কিংবা বক্তব্য প্রকাশের উপযোগী শব্দ নিজেরা সৃষ্টি করে নিতেন। যেমন আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত [১৩০৯] নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি—

আয়ু চান্দ আয়ু আয়ু।
আইলা দেমু বাইলা দেমু,
মাছ কুটি মেজা দেমু,
চুড়া ঝাড়ি কুরা দেমু,
কলাছুলি বাকল দেমু
চান্দু কপালে পুড়ুস ॥

পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়—

আয়ু চান্দ আয়ু চান্দু।
কলা দিমু মোলা দিমু;
ধেয়ন গাইয়র দুধ্দ দিমু

গাইয়র্ নাম চুঙুরী,
ডেকার নাম ভুঙুরী ॥ পুড়ুস্ ॥

বিপরীতক্রমে অনেক ছড়া শিশুরাও আবৃত্তি করে আনন্দ পায়। উচ্চারণের দৌর্বল্যহেতু তারাও অনেক সময় শব্দ বা বাক্যাংশ বিকৃত অথবা পরিবর্তিত রূপে উচ্চারণ করে। ছড়ার পাঠান্তরের এও আর এক কারণ। যেমন নিম্নের এই ছড়াটি—

তাই তাই তাই।
মামার বাড়ীত্ যাই ॥
মামারত্ আছে টুন্যা ভাই।
সঙ্গে খেলা খাই ॥
ও দুধে ভাতে খাই।
চল মামার বাড়ীত্ যাই ॥

পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল—

তাই তাই তাই।
নানার বাড়ীত্ যাই ॥
হাম্বার দুধু খাই।
হাম্বার দুধু ন দিলে,
হাতুয়া ভাঙি ধাই।

তবে ছড়ার মূল পাঠ কোনটি এবং কোনগুলিই বা পাঠান্তর সকল ক্ষেত্রেই তা নিশ্চয় করে জানার কোন উপায় নেই। তাই ছড়ার সব ক'টি পাঠই গুরুত্বপূর্ণ, সব পাঠই সংগ্রহযোগ্য।



বাংলা ছড়ার প্রেক্ষাপটে অতীত বিলাস

পথিক আপন মনে পথ চলে, বেশ কিছুদূর চলার পর ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে কোন একটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন আশ্রয়ের তলে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকায়—উদ্দেশ্য কত পথ অতিক্রম করে এসেছে, ফেলে এসেছে ইতিমধ্যে কি পরিমাণ পথ, আর গন্তব্যস্থলেরই বা কত বাকি, সে সম্পর্কে ধারণা করা। অর্থাৎ যেখানেই থামে সেইস্থানই হয়ে ওঠে সন্ধিস্থল—অতিক্রান্ত আর অতিক্রমনীয়ের হিসেব-নিকেশের জায়গা। আমরা জীবন—পথ পরিক্রমা কালেও কি ঠিক এমনতর আচরণ করি না? জীবনের কিছু পর্যায় অতিক্রমণের পর ফিরে তাকাই - গন্তব্য ভবিষ্যতের পথে হলেও দৃষ্টি মাঝে মাঝে নিবদ্ধ করি দূরে অথবা সুদূরে অতীতে। এ নিবদ্ধ করার পেছনে এক বিচিত্র মানসিকতা কাজ করে। এক সময়ে যা ছিল আমাদের অতি পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ, এক সময়ে তাই যখন অতীতের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন তার প্রতি এক গভীর মমত্বপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপের তীব্র আকর্ষণ অনুভব না করে পারি না। এই জন্যেই বলা হয়েছে Past is always golden। সব অতীতই যে স্বর্ণময় তা হয়ত নয়, তবু এক সময়ের পরিচিত, জীবন চর্যার সঙ্গে যা ছিল যুক্ত, তার প্রতি এক প্রকার দুর্বলতা আমাদের সকলেরই কম-বেশি থেকেই যায়।

তাছাড়া আমাদের সভ্যতার ক্ষেত্রে যে বিবর্তনের ছন্দটি অনুসৃত হয়, তার মূল্যায়ণের পরিপ্রেক্ষিতেও এই পিছন ফিরে তাকানোর ব্যাপারটি থাকেই, মানে তাকানোটা খেয়াল খুশীর ব্যাপার থাকে না, সেখানে একপ্রকার অনিবার্যতার তাড়না যুক্ত হয়ে যায়।

সাহিত্যকে বলা হয়েছে সমসাময়িক সমাজ জীবনের দর্পণ বা আরও খোলামেলা ভাষায় দলিল। সাহিত্যের স্রষ্টা যিনি, তিনিও সর্বোপরি সামাজিক জীব। সমাজ সচেতনতা তাঁর সাহিত্যে তাই স্বভাবতঃই প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া শিল্পী যেমন ক্যানভাসে ভিন্ন ভিন্ন রঙের তুলির লেপনে চিত্রকে মূর্ত করে তোলেন, তেমনি সাহিত্য স্রষ্টা সমাজ জীবনের ক্যানভাসে তাঁর বক্তব্যকে শিল্পোত্তীর্ণ করে উপস্থিত করেন। ধ্বনিকে যেমন বর্ণের প্রতীকে জীবন্ত করে তোলা হয়, কিংবা প্রাণ যেমন অবয়বে পূর্ণতা পায় তেমনি আরকি।

ছড়ার রাজ্যেও আমরা সাহিত্যের এই ন্যূনতম চাহিদা পূরিত হয়েছে দেখতে পাই। একথা ঠিকই যে ছড়ার রচয়িতাদের মূল লক্ষ্য ছিল অবিমিশ্র আনন্দ দান, অবিমিশ্র আনন্দ রসঘন পরিবেশের সৃষ্টি, তবু সচেতনভাবে না হলেও অসচেতন মন সমসাময়িক সমাজজীবনের নানা উপকরণকে আশ্রয় করেছে। আজ এসবের অনেকই স্মৃতির যাদুঘরে রক্ষিত হবার দাবী রাখে।

বহু বিবাহ প্রথা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজে দুষ্ট ক্ষতের মত বিদ্যমান ছিল, আর কত পারিবারিক জীবনে যে এই অভিশপ্ত প্রথার কারণে অকালে নিরানন্দের অভিশাপ নেমে এসেছে তার আজ আর কোন সঠিক হিসাব মিলবে না। নারীকে বলা হয় সর্বংসহা ধরিত্রীর প্রতীক। কিন্তু পতিসৌভাগ্যের অংশ দিতে এই সর্বংসহা নারীর একান্ত বিমুখতা। এ ব্যাপারে সে চরম স্বার্থপর। তাই অংশীদার সতীনের বিরুদ্ধে নারীর জেহাদের অন্ত নেই। ব্রতের ছড়ায় তার সেই জেহাদের সোচ্চার প্রতিফলন ঃ

ময়না ময়না ময়না।
সতীন যেন হয় না ।।
হাতা হাতা হাতা।
খাই সতীনের মাথা ।।
বেড়ি বেড়ি বেড়ি।
সতীন মাগী চেড়ী ।।

দেবতার কাছে প্রার্থনার সময় সর্বাগ্রে তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এই বাসনা –

এইজন্য আমি পূজি ভোলা মহেশ্বরে,
সতীন হলেই যেন সদ্য সদ্য মরে,
এই ভিক্ষে মাগি প্রভু তব পায়,
আশীর্বাদ কর প্রভু যেন সতীন নাহি হয়।

সতীন যন্ত্রণা যে কি আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় তা আর অনুমান করা যাবে না। তবে যে সব মহিলার স্বামীদের মহিলা বন্ধুপ্রীতি প্রবল, তারা এর জ্বালা কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন!

বহুবিবাহ প্রথার মত আর একটি অমানবিক প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল গৌরীদান প্রথা। এখন যদিও অষ্টাদশীর পূর্বে কোন বালিকার বিবাহদান আইনত দণ্ডণীয়, কিন্তু এককালে আমাদের সমাজেই ছিল গৌরীদান প্রথা। বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য নাবালিকার বিবাহ দিয়ে অভিভাবকরা কুল রক্ষা করতেন, পালন করতেন সন্তানের প্রতি তাদের কর্তব্য। কিন্তু এই বীভৎস আচরণের বিরুদ্ধে ছড়ায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে—

আম কাঁঠালের পিঁড়িখানি ঘি ম' ম' করে,
তারির উপর বাপ খুড়ো কন্যা দান করে।
বাপ যায়রে নায় খুড়ো যায়রে তড়ে
শিশুকালে বিয়ে দিলি সদায় আগুন জ্বলে।।

পিতামাতার প্রতি ভুক্তভোগী হতভাগিনী কন্যার ভর্ৎসনা তীব্র হয়েছে অন্য একটি ছড়ায়—

টংকা ভেঙে শংখ্য দিলাম, কানে মদন-কড়ি,
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়োর চাপদাড়ি।
চোখ খাও গো বাপ মা চোখ গো খুড়ো,
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো।

সন্তানবাহুল্য বর্তমানে নিন্দনীয় হলেও, কিছুকাল আগে পর্যন্ত সন্তান বাহুল্যকে মা ষষ্ঠীর করুণা বলে মানুষ শ্লাঘা বোধ করত এবং বহু সন্তানের জনক-জননী সমাজে অতিরিক্ত সম্মানের অধিকারী হতেন। একটি ছড়ায় যতগুলি নক্ষত্র, ততগুলি ভাই পাবার বাসনা প্রকাশ করে বলা হয়েছে—

চন্দ্র সূর্য পূজন, সোনার থালে ভোজন,
রূপার ঘট, রূপার গাড়ু।
আমার যেন হয় শাঁখা সোনার থাড়ু।।
যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই।
নক্ষত্র পূজা করে ঘরে চলে যাই।।

আজকের দিনে 'গাড়ু' কিংবা 'থাড়ুর' ব্যবহার না থাকলেও, কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত এ দুটির সঙ্গে আমাদের কিন্তু গভীর পরিচয় ছিল।

একটি সেঁজুতি ব্রতের ছড়াতে প্রকাশিত হয়েছে নিম্নরূপ বাসনা ঃ

সাঁঝ ভোজন সেঁজুতি, ষোল ঘরে ষোল ব্রতী।
তার এক ঘরে আমি ব্রতীর ব্রতী
হয়ে মাগলাম বর,
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর ॥

আজকের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে এবং সেইসঙ্গে সন্তান জন্মের প্রকৃত কারণ সচেতনতার ফলে এতাদৃশ প্রার্থনা শুধু অভাবনীয় নয় গর্হিত বলে বিবেচিত হবে। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য আধুনিক বাঙ্গালী সমাজে ব্রত পালনের রেওয়াজ প্রায় অন্তর্হিত।

বাঙ্গালী সম্পর্কে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণা—তারা কূপমণ্ডূক এবং যুদ্ধবিমুখ জাতি। যদিও ঐতিহাসিক ভাবে এ ধারণা সমর্থিত হয়নি, বরং বাংলার বার ভুইঞা এবং 'আগাডোম বাঘাডোম' ছড়া ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙ্গালী যে এক সময়ে যোদ্ধৃজাতির খ্যাতিলাভ করেছিল তাই প্রমাণিত হয়। অন্য ছড়ার মাধ্যমেও বাঙ্গালী যে এক সময়ে যুদ্ধ বৃত্তিকে অবলম্বন করেছিল তা অনুমিত হয়। একটি ছড়ায় নারী প্রার্থনা জানিয়ে বলেছে ঃ

পাকা ধান মর্তমান
আমার স্বামী নারায়ণ
যখন যাবেন রণে
নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে।

সব স্ত্রীই চায় স্বামী সোহাগিনী হয়ে থাকতে, তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে স্বামীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য স্ত্রীকে স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন হতে দেখা গেছে ছড়াটিতে। 'রণ এয়ো ব্রত' নামে বিশেষ এক ব্রত অনুষ্ঠিত হত যুদ্ধক্ষেত্রে গত স্বামীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনকে সুনিশ্চিত করতে। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরেও যদিও বাঙ্গালীদের জন্য বিশেষ কোন বাহিনী গঠিত হয়নি, কিন্তু এক সময়ে যে বাঙ্গালী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং নিয়মিতভাবে যুদ্ধে অংশ নিত এসব ছড়াতে অতীতের সেইসব স্মৃতি ফসিল হয়ে আছে—

রণে বনে আয়তী
বনে জনে সুয়তী।
রণে এয়োব্রত করে হই যেন স্বামীর গো।
যতকাল থাকব বেঁচে যেন না পড়ে আমার নো ॥

এক সময়ে কড়ি ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত ছিল

এটি। এখনও লক্ষ্মীপুজোর হাঁড়ি চুপড়িতে গৃহস্থরা সযত্নে কড়ি রক্ষা করেন। তবে কড়িকে আগের মত বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার রেওয়াজ আর নেই। একটি ছড়ায় উল্লিখিত হয়েছে ঃ

লক্ষ্মী দেবী দিলাইন বর,
চাইল কড়িটি বাইর কর।
চাইল আনিয়া দিল কড়ি।
তারে করব লড়ি দড়ি ॥

এইবার একটি বহুল পরিচিত ছড়ার অংশ বিশেষ উদ্ধার করা গেল, যেটিতে সেকরাকে ডেকে মোহর কেটে খোকার জন্য গহনা গড়িয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে—

খোকা আমাদের সোনা,
চার পুকুরের কোণা।
বাড়িতে সেকরা ডেকে, মোহর কেটে
গড়িয়ে দেব দানা

অপর একটি ছড়াতেও মোহরের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে—

কুঁচ কুঁচুতি কুঁচই বন,
কেনরে কুঁচুই এতক্ষণ ?
মোহর এল ছালা ছালা,
তাই তুলতে এত বেলা।

'মুহর' ফার্সী শব্দ, এর থেকেই এসেছে 'মোহর' শব্দটি। মুঘল আমলে মোহর বা শীলমোহর অঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। বর্তমানে তামা, দস্তা, রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু নির্মিত মুদ্রার প্রচলন থাকলেও স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন নেই। কয়েক বৎসর আগে সীমিত সংখ্যায় নেহেরুর মূর্তি খোদিত কিছু স্বর্ণমুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়েছিল মাত্র। কিন্তু সাধারণভাবে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন আর নেই।

রাজশক্তি যে ভাষা বা ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সেই ভাষা এবং ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বলাবাহুল্য সাময়িক লাভের আশায়। একটি ছড়ায় যেন স্বামী ফার্সী পড়ে, এই অভিলাষ অভিব্যক্ত হয়েছে কেননা তখন মুসলমান শাসনাধীনে ফার্সী জানা মানুষের কদর ছিল—

আর্শী আর্শী আর্শী
আমার স্বামী পড়ুক ফার্সী।

বর্তমান যুগকে আমরা অনায়াসে গণতন্ত্রের যুগ বলে চিহ্নিত করতে পারি। রাজতন্ত্র যে এযুগে অচল তা প্রায় এক স্বীকৃত সত্য। কিন্তু কিছুকাল আগে পর্যন্ত রাজতন্ত্রের ছিল আড়ম্বরপূর্ণ অধিষ্ঠান, তাই ছড়াতে রাজার বউ, রাজার রাণী, রাজার ঝি ইত্যাদি হবার বাসনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য আজকের দিনে হলে কোন রমণী রাজরাণী বা রাজার ঝি হবার পরিবর্তে মন্ত্রী পত্নী বা মন্ত্রী দুহিতা হবার আকাঙ্ক্ষা জানাত। রাজ পরিবার ভুক্ত হবার বাসনা সম্বলিত ছড়ার কিছু অংশে উদ্ধার করা গেল—

কোঁড়ার মাথায় ঢালি মউ
আমি যেন হই রাজার বউ।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি চিনি,
আমি যেন হই রাজার রাণী।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি,
আমি যেন হই রাজার ঝি।

এরোপ্লেন—রকেট যুগে আমরা ক্রমেই গতিবান হয়ে উঠছি, আর পরিত্যক্ত হচ্ছে মন্থর গতিসম্পন্ন যান। একসময়ে আমাদের দেশে যে চৌদোলা ছিল ব্যবহারিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় এক উপকরণ, যান, বর্তমানে যার সাক্ষাৎ মেলে না, ছড়ায় তার উল্লেখ লক্ষ্য করার মত—

আসে যায় বর মহাশয় চার ঘোড়ার গাড়ি
তার পিছনে খুকুরাণী চৌদোলাতে চড়ি।

দোলনা বা শিবিকার মতই পালকিও ছিল. এক অত্যাবশ্যকীয় যান, বিশেষত বিবাহের ক্ষেত্রে –

কোন্ গাঁয়ের বর।
নিমাই সরকারের বেটা পালকি বের কর ॥

কিংবা, আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিনসে কাহার দেব পালকি বহাতে ॥

অপর একটি ছড়াতেও 'পালকি' উল্লিখিত হয়েছে

এ মাসটা থাক দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকী সাজিয়ে ॥

'কাঠা' ছিল প্রাচীনকালে প্রচলিত এক পরিমাপ। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'অভয়ামংগলে' প্রদত্ত আত্মপরিচয়ে উল্লেখ করেছেন—

মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।

ছড়াতেও এই পরিমাপের উল্লেখ লক্ষণীয়—

যে দিবে কাঠা কাঠা।
তার হবে লাল ব্যাটা ॥
যে দিবে মুঠি মুঠি।
তার হবে কাল কাল সাত বিটি ॥

মাগনের ছড়ার অন্যত্র বলা হয়েছে—

বল ভাই শিব, এক কাঠা চাল দশটি বড়ি নিব।

দিন পরিবর্তনের সংগে সংগে বহু উপকরণের ব্যবহারে যেমন ছেদ পড়েছে, তেমনি পরিত্যক্ত হয়েছে বহু শব্দ। একদিন যেসব শব্দের সংগে সকলেরই পরিচয় ছিল, অব্যবহারের ফলে তা ক্রমে পরিণত হয় দুর্বোধ্য শব্দে। এমনই একটি শব্দ হ'ল 'মটকি'। একটি ছড়ায় বলা হয়েছে—

খুকুর বালা টাকার ছালা
মট্‌কী ভরা ঘি,
খুকুর ভাতে ভোজ হল না
ছি ছি ছি।

আগেকার দিনে যখন ঘিয়ের প্রাচুর্য ছিল, তখন মাটির জালা বা কেঁড়েতে তা রাখার রেওয়াজ ছিল। এই মৃন্ময় পাত্র পরিচিত ছিল 'মটকি' নামে। আজ ঘি যেমন সুলভ নয়, তেমনি সুলভ নয়, 'মটকি'ও।

জমিদারী প্রথা বিলোপের সংগে সংগে এর সংগে যুক্ত কয়েক শ্রেণীর কর্মচারীর উপাধি বা পদও বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন নায়েব, গোমস্তা ইত্যাদি। জায়গা-জমির দেখাশোনার ভার ন্যস্ত থাকত নায়েবের ওপর। জমিদার বা ভুস্বামীর স্থানীয় প্রতিনিধি ইনি। একটি ছড়ায় বলা হয়েছে—

খোকা হবে নায়েব।
দেখবে কত সায়েব ॥

পতিবন্দনা সূচক একটি ছড়ায় বর্ণিত হয়েছে কত বিচিত্র ধরনের অলঙ্কারের কথা, আজকের অলঙ্কার বিলাসিনীরা আর যেগুলির সন্ধান রাখেন না—

গলায় সাজ কতকগুলো।
চিক, চৌদানী, মুড়কীমালা।
মাথায় সাজ কতকগুলো।
স্বর্ণ সিঁথি কলাটে পেড়া।
নাকের সাজ কতকগুলো।
ফুল ঝুমকো পিপলতা।

চিক, চৌদানী, স্বর্ণ সিঁথি—এসব অলংকারের প্রচলন প্রায় রহিত হয়ে গেছে অথবা হতে বসেছে বলা চলে। আর একটি ছড়াতেও বেশ কিছু অলংকার উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলির চল বর্তমানে আর নেই। যেমন অনন্ত, চন্দ্রহার, সূর্যহার, কাটা, বাঘের নখ, খাড়ু ইত্যাদি।

লাউলের ঘরের ছেইলারে গো কি কি গয়না দিমু ?
হাত জোড়া বালা দিমু হাত জোড়া অনন্ত দিমু ॥
গলা জোড়া চন্দ্রহার দিমু গলা জোড়া সূর্যহার দিমু।
বুক জোড়া পাটা দিমু বাঘের নখ বাঁধাইয়া দিমু ॥
কোমর জোড়া তোড়া দিমু পাও জোড়া খাড়ু দিমু।

আভরণাদির মত অঙ্গ সজ্জার বহু উপকরণ যেগুলি প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হ'ত, আজ আর সেগুলি ব্যবহৃত হয় না। যেমন একটি ছড়ায় বলা হয়েছে—

রাজার দুহিতা করাইব বিয়া।
কুংকুম কস্তুরী চন্দন দিয়া ॥

কুঙ্কুমের ব্যবহার যদিবা হয়, কস্তুরীর ব্যবহার বর্তমানে রহিত বলা চলে। কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য যাদের কল্পনা করা হত, তাদের অন্যতম হল পরী। সুন্দরী মেয়ে, পিঠে তার এক জোড়া ডানা, পাখীর মত উড়তে পারে সে।

ঘুমের পরী আসে যায়
আঁধার ঘরের আঙ্গিনায়
চুপি চুপি আয়রে ঘুমের পরী
খোকা খুকুর চোখে ঘুম নাই।

কিংবা,

পরীর পাখায় হাওয়া লেগে
ঘরে যারা ছিল জেগে
ঢুলে ঢুলে মায়ের কোলে
ঘুম আয় ঘুম ।।

আজকের শিশু যেমন রাজা-রাজড়ার গল্প শুনতে রাজি নয়, তেমনিই রাজি নয়, পরীর গল্প শুনতে। শিশুদের রাজ্য থেকে পরীরা দীর্ঘদিন হল নির্বাসিত। কারণ আজকের শিশুরা অনেক বাস্তববোধ সম্মত, কিংবা বলা চলে জন্ম প্রাজ্ঞ। তাই বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই, তাকে সহজে স্বীকার করে নিতে তাদের মন সায় দেয় না। পরীদের মত অনেক কিছুরই এখন স্থান ছড়ার যাদুঘরে। কৌতূহলী পাঠককে এসবের সন্ধান পেতে, হাজির হতে হবে ছড়ার রাজ্যে।



বাংলা ছড়ায় কুসুম বিলাসিতা

বাংলা ছড়া, ধাঁধা কিংবা প্রবাদে যেসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, ফুল তাদের অন্যতম। অবশ্য ছড়া, ধাঁধা এবং প্রবাদে ফুল উল্লিখিত হলেও এবং উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হলেও একই মানসিকতার প্রতিফলন কিন্তু সর্বত্র ঘটেনি। বরং লক্ষ্য করলে আমরা তিনটি ক্ষেত্রে তিন ধরনের মানসিকতার সন্ধান লাভ করব। ধাঁধায় প্রথমত আঞ্চলিক ফুলগুলি তেমন স্থান পায়নি, যেসব ফুল স্থান পেয়েছে, সেগুলি প্রবাদ কিংবা ছড়ার তুলনায় সংখ্যাতেই শুধু কম নয়, মূলতঃ আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশেষত্বসম্পন্ন ফুলগুলিই উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষতঃ ধাঁধার রচয়িতারা ফুলের আকর্ষণীয় রঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তাঁদের বিষয় করে নিয়েছেন। ধাঁধায় যেসব ফুল স্থান পেয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে অতসী, কেয়া, মনসা, শাপলা, শালুক, শিউলি, ভেলা, পদ্ম ইত্যাদি। আর একটি কথা—ধাঁধায় প্রত্যক্ষ বর্ণনায় ফুল উপস্থাপিত হয়নি। পরোক্ষ বর্ণনায় যাকে আমরা ইংরেজিতে 'round about way of talking' বলি, সেইভাবে ফুলগুলির বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ, ধাঁধায় বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা করাই হল রচয়িতাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা প্রবাদে ধাঁধার তুলনায় শুধু অধিক সংখ্যক ফুলই উল্লিখিত হয়নি, সেই সঙ্গে ধাঁধার তুলনায় ফুলকে নিয়ে রচিত প্রবাদের সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ার মত। ধাঁধা কিংবা ছড়ার মত প্রবাদে শালুক, কেয়া, চাঁপা, বকুল, মালঞ্চ ইত্যাদি যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি এমন অনেক ফুল স্থান পেয়েছে যেগুলি ধাঁধা কিংবা ছড়ায় অনুল্লিখিত থেকে গেছে—যেমন গোলাপ

কাশ, ধুতরা, বক ইত্যাদি। প্রবাদে মূলতঃ মানব চরিত্র অথবা প্রকৃতি বিশ্লেষণই প্রাধান্য লাভ করে, তাই বিভিন্ন প্রকার ফুল উল্লিখিত হলেও সেগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপমান হিসাবেই উপস্থিত করা হয়েছে, উপমেয় প্রায় সর্বত্রই মানুষ।

কিন্তু বাংলা ছড়ায় বিভিন্ন ধরনের ফুল উল্লিখিত হলেও প্রথমতঃ ফুলগুলির মাধ্যমে প্রবাদের মত কোন ভিন্ন বক্তব্যকে যেমন উপস্থিত করা হয়নি, তেমনি ধাঁধার মত এখানে পাঠক কিংবা শ্রোতার বুদ্ধিবৃত্তি যাচাইয়েরও কোন প্রয়াস যুক্ত হয়নি। প্রত্যক্ষভাবে ফুলকে উপস্থিত করা হয়েছে নিছক এক বিশুদ্ধ আনন্দ দানের জন্য, মনোমত এক পরিবেশ রচনার অভিপ্রায়ই এখানে মুখ্য। বাংলা ছড়ায় ব্যবহৃত ফুল প্রসঙ্গে অন্য কোন বক্তব্য প্রকাশের আগে কি কি ফুল উপস্থাপিত হয়েছে, তার কিছু পরিচয় নেওয়া যাক।

প্রথমে বহুল পরিচিত ফুলগুলি নিয়ে রচিত ছড়ার আংশিক উল্লেখ করা গেল। একটি ছড়ায় কেতকী ফুল উল্লিখিত হয়েছে এইভাবে -

মণির বাড়ী দূরেথুন দূর ;
সম্বাদে আনাইয়সু কেতকী ফুল
কেতকী ফুলের শতেক পাখর ;
মণির জামাই রসিক নাগর।

বাংলা দেশের একটি অতিপরিচিত ফুল হল কদম্ব। একটি ছড়ায় এই নিয়ে বলা হয়েছে—

ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে
ঢাকন খুলে দেখো
বড় বউর খোকা হয়েছে।

মালঞ্চও অনুল্লিখিত থাকেনি।

এক ফুল খোটেন সুর্যাই
আরো ফুল চান।
মালিয়ার মালঞ্চ পুষ্প
অধরে যোগান ॥

চাঁপা গন্ধে ও বর্ণে এক রমণীয় ফুল। বাংলা ছড়ায় সে কয়েকবারই উল্লিখিত হয়েছে নানা প্রসঙ্গে। শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে শীতের শিকার হতভাগ্য ছেলেরা রোদের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে যে ছড়া বলে, তাতে বলা হয়েছে—

গাঙের পারে চাম্পা ফুল,
চনচনাইয়া রৈদ তুল।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'প্রার্থী' কবিতায় 'সূর্য' তুমি আমাদের উত্তাপ দিও' পংক্তিটি প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়। বিবাহের ছড়াতেও চাঁপা ফুল উল্লিখিত হয়েছে ঃ

উলু উলু মাদারের ফুল,
বর আসছে কতদূর।
বরের মাথায় চাঁপার ফুল;
কনের মাথায় টাকা।

অন্য একটি বিবাহের ছড়ায় বরের তুলনায় কন্যার অধিকতর রূপৈশ্বর্যকে প্রতিপন্ন করতে তাকে কনক চাঁপা ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

আশালতা পালং পাতা
তোমার নাকি বিয়ে,
হাওড়া থেকে বর এসেছে
টোপর মাথায় দিয়ে।
বর দেখে যাও, বর দেখে যাও
রান্নাঘরের ঝুল।
কনে দেখে যাও কনে দেখে যাও
কনক চাঁপার ফুল।

আর একটি ছড়াতেও চাঁপার সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে জামাইয়ের শ্বশুরালয়ে আসার কথা বলা হয়েছে—

নন্দে গেছে গাঙের কুল,
ফুইটা রইছে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইছে আনন্দে।

এখানে জামাই যে শুধু চাঁপা ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে আনন্দিত চিত্তে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়নি, তা আমরা অনুমান করতে পারি, তার অন্যবিধ আকর্ষণও ছিল, যদিও ছড়ায় সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়নি।

একটি ছড়ায় সম্ভবত এক বোন তার ক্রন্দনরত ভাইকে ভোলাবার মোক্ষম

উপায় হিসাবে 'ঝনঝনান্যা' নাম্নী এক বুড়ীর বিবাহ দানের কথা বলেছে। বুড়ীর বিবরণে বলা হয়েছে—

বুড়ীর দাঁতে মিশি
আর তাতেই, ভাই দেখ্যা খুশী।

এর ওপর বুড়ীর পাকা চুলেভরা মাথার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে চাঁপা ফুলের ভূমিকায় ক্রন্দনরত ভাইটি শুধু কান্নাই ভোলে না, তার আনন্দিত চিত্তের নৃত্য শুরু হয়ে যায় ঃ

বুড়ীর মাথায় পাকুনা চুল,
লটুকিয়া রইছে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলের গন্ধে,
ভাই নাচে আনন্দে।

বাড়ীর নিশানা বোঝাতেও চাঁপা গাছ উল্লিখিত হয়েছে—'ভাইগো বাড়ী কতদুর? গাছের আগায় চম্পা ফুল'। বকুল ফুলও ছড়ায় উল্লিখিত হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে 'বকুল ফুল' এই পাতানো সম্পর্কেরই উল্লেখ ঘটেছে ঃ

শানের ঘাটে নাইতে গেলাম
ওহে বকুল ফুল,
না হল মোর সাবান কাচা।
ওগো বকুল ফুল।

আগেকার দিনে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দানের রীতি ছিল, এই সর্বনাশা রীতি প্রচলিত ছিল 'গৌরীদান' প্রথা নামে। একটি ছড়ায় এ হেন গৌরীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

আন গৌরীরে ডাক দিয়া,
নাগেশ্বরের তল দিয়া।
নাগেশ্বরের ফুল রেণু রেণু
গৌরীর মাথায় বান্ধছে বেণু।

শীতকালে গাঁদা ফুলের ছড়াছড়ি বাংলাদেশে। একটি ছড়ায় একই সঙ্গে গাঁদা ফুল এবং 'গাঁদাফুল' নামে পাতানো সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে ঃ

বৌ-এর মাথায় লটকা চুল,
কোথায় পাব গাঁদা ফুল।
গাঁদা ফুলের ছড়াছড়ি
আয় গাঁদা ফুল মোদের বাড়ী।

এইবার কিছু অনভিজাত বা অন্ত্যজ ফুলের দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। বাংলা ছড়ায় মাদারের ফুলের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরেই এসেছে। যেমন একটি ছড়ায় বলা হয়েছে ঃ

উলু উলু মাদারের ফুল।
বর আসছে কতদূর।।
বর আসছে বাঘনাপাড়া।
বড়ো বউগো রান্না চড়া।।

বিবাহের সূত্র নানা প্রকারের হতে পারে, কিন্তু শিমুল ফুল তুলতে গিয়ে যে কারো বিবাহ হওয়া সম্ভব, এ তথ্য একমাত্র ছড়ার রাজ্যেই লাভ করা সম্ভব ঃ

উলু উলু শিমুলের ফুল
মুকুট মাথায় দিয়া।
শিমুল ফুল তুলতে গেলাম
তাইতে হল বিয়া।।

একটি ছড়ায় আমরা শালুক ফুলের উল্লেখ পাচ্ছি এইভাবে ঃ

আলুক মালুক শালুক রে
বনশালুকের পাতা,
হরির নামে কেটে দেব
ছোট ঠাকুরের মাথা।

ছড়াটি থেকে অনুমিত হয়, কোন বধূ তার পুত্রসম দেওরকে ভয় দেখিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করার উদ্দেশ্যেই এমন কথা বলেছে। অবশ্য যুক্তি হিসাবে যে এটি অকাট্য এমন কথা বলা যাবে না, তার থেকে হয়ত ছড়ার রচয়িত্রী বনশালুকের পাতার সংগে মিল রাখতে হাতের কাছে অন্য কোন সহজলভ্য শব্দ না পেয়ে ছোট ঠাকুরের মাথাকে অবলীলাক্রমে বসিয়ে দিয়েছে, এক্ষেত্রে অন্ত্যানুপ্রাসের ঝোঁকে যে ভয়ংকর শপথ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে, তার পরিণামের কথা চিন্তা করার আর অবকাশ মেলেনি।

এইবার এমন কয়েকটি ফুলের উল্লেখ করা যাক, যাদের হদিস শুধু বাংলাদেশে কেন, বোধ করি এই মর-জগতে করা যাবে না। এইসব ফুলের

মধ্যে রয়েছে কলুদ, পড়ি ফুল, নাক ফুল, নাকী ফুল, কাজি ফুল, ওড় ফুল, ভেরণের ফুল ইত্যাদি।

প্রথমে কলুদ ফুলের উল্লেখ আছে যে ছড়াটিতে, তার অংশবিশেষ উদ্ধার করা গেল ঃ

আমি তো বটে নন্দ ঘোষ
মাথায় কাপড় দে ।।
হলুদ বনে কলুদ ফুল
তারার নামে টগর ফুল ।।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর একটি কবিতায় 'কলুদ ফুল' কথাটি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত অভিধানে 'কলুদ'-এর উল্লেখ না থাকলেও আচার্য সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'আমার মনে হয় কলুদ ফুল কাল্পনিক নয়, এ ফুল আছে।'[১]

বিবাহে নানাবিধ ফুল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ওড় ফুলের দ্বারা বিবাহ রূপ সর্বশ্রেষ্ঠ মাঙ্গলিক কার্যটির অনুষ্ঠান সংঘটিত হওয়ার বিবরণ ছড়া ছাড়া অন্যত্র শুধু দুর্লভ নয়, অলভ্য—

একটি নিলেন গুরু ঠাকুর
একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি
ওড় ফুল দিয়ে ।।
ওড় ফুল কুড়ুতে গিয়ে
বয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি
ঠিক দুক্কুর বেলা।

যে বিবাহের জন্য বিশেষভাবে ওড় ফুল অনিবার্য, সে বিবাহের শুভলগ্ন কোন চন্দ্রালোকিত রাত্রে অথবা গোধূলি বেলার পরিবর্তে কঠিন দ্বিপ্রহর হওয়াই স্বাভাবিক, সেটাই বাঞ্ছনীয়।

যমুনাবতীর বিবাহোপলক্ষে আর একটি বিচিত্র কুসুমের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেটি হলো কাজি—

১. লোক-সাহিত্যের ভাষা ; সুকুমার সেন ; বেতার জগৎ ; ৭ জুন, ১৯৭৭

যমুনাবতী সরস্বতী
কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবে শ্বশুরবাড়ী,
কাজিতলা দিয়ে ॥
কাজি ফুল কুড়তে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত ঝুম ঝুম পা ঝুম ঝুম
সীতারামের খেলা।

অনুরূপভাবে একটি ছড়ায় ভেবণের ফুলের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে—

আইজ ঢুপীর লেডাপেডা
কাইল ঢুপীর বিয়া ॥
ঢুপীবে যে লইয়া যাইবে
ভেরণ তলা দিয়া ॥
ভেরণের ফুল ফুট্যাছে
ডাহা ডাহা অইয়া।
ঢুপী ছেঁড়ী চাইয়া কান্দে
সোয়ামীর মধ্যে হিয়া।

একটি ছড়ায় ক্রন্দনরত শিশুকে ভোলাতে হনুমানের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে, এ আবার যে সে হনু নয়, যার লেজে বাঁধা আছে কাটারি, পাঠক মনশ্চক্ষে চিত্রটি কল্পনা করতে পারেন—

খোকা খোকা কাঁদিস না হনু এসেছে
হনুর লেজে কাটারি বাঁধা
কাটতে এসেছে।

এরপর শিশুকে অন্যমনস্ক করতে ফুলের গাছ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে—

ও খোকা, এটা কি ফুলের গাছ ?
পাখী আমার পাকী ফুলের গাছ।

এক্ষেত্রে 'পাকী ফুল' বলে কোন ফুলের গাছ বাস্তবে নাই থাকুক, যে উদ্দেশ্যে ক্রন্দনরত শিশুকে ফুলের গাছ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তা যে সার্থক হয়েছে, স্বীকার করতেই হবে। কারণ শিশুটি ক্রন্দন ভুলেছে, আর ভুলেছে বলেই সে 'পাকী ফুলে'র গাছের কথা বলতে পেরেছে।

একটি ছড়ায় আমরা 'নাকফুল' নামে এক বিচিত্র ফুলের সন্ধান পাই—

আয় গো ছেলে মেয়েরা
মেন্দি তুলতে যাই,
মেন্দি ডালার ভাব লাগ্যা
নাক ফুল ছিঁড়্যা যায়।
নাক ফুলের উছিলায় বিয়া হইয়া যায়।

এখানে 'নাক ফুল' বলতে কি নাক-ছাবিকে বোঝান হয়েছে? নতুবা এ হেন কোন ফুলের অস্তিত্বের সন্ধানের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে অনাগত কোন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর জন্য!

বাংলা ছড়ার রাজ্যে ফুলের রাজকীয় আধিপত্যের সন্ধান দিতে আর উদাহরণ বৃদ্ধি করে লাভ নেই। তার থেকে আমরা উদাহৃত ফুলগুলি থেকে কিছু সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করতে পারি। আর সেই চেষ্টার প্রথমেই যেটি উল্লেখের দাবি রাখে তা হল যে বাংলা ছড়ার রাজ্যে কোন ফুলই গন্ধ অথবা মনোহরণ সৌন্দর্যের কারণে উল্লিখিত হয় নি—অর্থাৎ যেসব ফুল ছড়ায় উল্লিখিত হয়েছে সেজন্যে যত না ঐ ফুলগুলির কৃতিত্ব, তদপেক্ষা অনেক বেশি কৃতিত্ব ছড়া রচয়িতার।

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পারি যে, ছড়ায় উল্লিখিত ফুলগুলি আকৃতিতে অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুদ্র। কারণ যাদের মনোরঞ্জনের জন্য ছড়াগুলি সৃষ্ট, তাদের প্রতি সুবিচার করতেই সম্ভবত বৃহদাকৃতির ফুলগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। ছড়ার রাজ্যে পরিচিতের তুলনায় অপরিচিত ফুলের রাজকীয় আধিপত্য। এর কারণ, রচয়িতাদের পরিচিত ফুলের বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রে মন ভরে নি, তাই বাস্তবে তেমন কোন ফুল থাক বা না-থাক, সেজন্য অপেক্ষা না করে ছড়ার রাজ্যে এনে হাজির করে দিয়েছেন। এদিক দিয়ে কাব্য সংসারে নিজেরাই মনোমত ফুল কল্পনা করে বাস্তবিকই তাঁরা 'প্রজাপতি'র ভূমিকা পালন করেছেন। নতুন ফুল সৃষ্টি করতে গিয়ে ছড়ার রচয়িতারা যত না অর্থের ওপর দৃষ্টি দিয়েছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন ধ্বনি সামঞ্জস্যের ওপর। সেই কারণেই আমরা হলুদ বনে 'কলুদ' ফুলের সন্ধান পেয়েছি, সন্ধান পেয়েছি 'পাকী' ফুল গাছের। এতসব আলোচনার পরেও পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, ছড়ার রাজ্যে বিশেষ কোন ফুলের প্রতি কি রচয়িতারা পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন? এর উত্তরে বলতে হয়, হ্যাঁ, আর এই প্রসঙ্গে যে ফুলটির নাম উল্লেখ করতে হয়, সেটি হল চাঁপা। ছড়ায় কখনও সেটি উপস্থাপিত হয়েছে 'চম্পা' নামে, কখনও বা 'চাম্পা' রূপে।



বাংলা ছড়ায় অপ্রাকৃত উপাদান

বাংলা ভাষায় আমরা প্রায় এক অর্থেই অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত এবং 'অলৌকিক' শব্দগুলিকে ব্যবহার করে থাকি। নয় প্রাকৃত অর্থে 'অপ্রাকৃত' আবার নয় লৌকিক অর্থে অলৌকিক। 'অতি যে প্রাকৃত' অর্থে অতি-প্রাকৃত। আমরা এই শব্দগুলির সাহায্যে দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে চাই। প্রথমত যে বা যার অস্তিত্বের সন্ধান এই মরজগতে মেলে না। আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় যাদের দেখা পাই না তাদের বলা হয় অপ্রাকৃত বা অলৌকিক। অর্থাৎ এদের অস্তিত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৌভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি বিরলক্ষেত্রে উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয়ত এরা যেহেতু আমাদের পরিচিত জগতের বাসিন্দা নয় ভিন্নতর জগতের এরা, তাই কল্পিত হয় এরা এমন একটা শক্তির অধিকারী যে শক্তির সাহায্যে এরা অনায়াসে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। অর্থাৎ কার্য-কারণ সূত্রের সাহায্যে এদের ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যাত হতে পারে না। অনৈসর্গিক শক্তির অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের আকৃতির ক্ষেত্রেও একপ্রকার বিরল বৈশিষ্ট্য কল্পিত হয় সচরাচর যে ধরনের আকৃতির সন্ধান মেলে না। কিংবা বলা চলে আকৃতির বিভিন্নতার সঙ্গে শক্তির বৈচিত্র্যযুক্ত এক বিশেষ ধরনের প্রাণীকে অপ্রাকৃত প্রাণী বলে বলা হয়। সব ক্ষেত্রেই অপ্রাকৃত অর্থে সে বিশেষ কোন প্রাণীকে ইঙ্গিত করা হয় তা কিন্তু নয়, অনেক সময়েই আকৃতি বিহীন বিমূর্ত সত্তা কর্তৃক অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপকেও আমরা অপ্রাকৃত অর্থে বুঝিয়ে থাকি বা বুঝে থাকি। মোটের উপর বিশ্লেষণের অতীত বিরল কোন ঘটনা অথবা বিরলদর্শন কোন প্রাণী বিশেষের ক্ষেত্রেই এই ধরনের বিশেষণ প্রযুক্ত হয়।

ছড়ার রাজ্যে আধিপত্য মূলতঃ যেহেতু শিশুদের তাই এখানে অলৌকিক কোন ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে বিরলদর্শন বা বিরলশ্রবণ প্রাণীদের অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে। এবংবিধ কল্পনার পেছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল তা হল শিশুর মনোরঞ্জন অথবা শিশুচিত্তে ভীতি উৎপাদন। বিমূর্ত বিষয়ে শিশুর অনাগ্রহ, তার কল্পনাশক্তি তত প্রখর নয়। তাই ছড়াকাররা সে পথে না গিয়ে শিশুদের উপযোগী যে সব চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন আমরা তারই কিছু পরিচয় পাব বর্তমান নিবন্ধটিতে।

শিশু সরলমনের অধিকারী। আর সেইসঙ্গে বয়স্কদের ওপর তার একান্ত নির্ভরতা—এই দুইয়ের সুযোগ নিয়ে বয়স্ক ব্যক্তিরা যথেচ্ছভাবে প্রাণীদের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন বিভিন্ন ছড়ায়। শিশুর অভিজ্ঞতার জগৎ সীমিত। তাই বয়স্ক ব্যক্তি যখন প্রাণী বিশেষের অস্তিত্বের কথা বলেন, স্বভাবতঃই শিশু অবলীলাক্রমে সে অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। সন্দেহের বিষ বাষ্প থেকে মুক্ত শিশু মন কোন প্রশ্ন করে না, কোন সংশয় প্রকাশ করে না, নির্বিচারে, নির্দ্বিধায় সব মেনে নেয়।

অপ্রাকৃত প্রাণী কল্পনার পেছনে যে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য কাজ করে তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হল আনন্দ দান এবং ভীতি উৎপাদন। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে আবার দেখা যাবে ভীতি উৎপাদন প্রসঙ্গেই এই সব প্রাণীরা অধিক মাত্রায় কল্পিত হয়েছে। শিশু সহজে ঘুমুতে না চাইলে ভয় দেখিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করা হয়, অনুরূপভাবে শিশু খেতে না চাইলেও ভয় দেখান হয়। অজানা এক আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে শিশু অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাওয়া ঘুমানোর মত কাজগুলি নির্বিবাদে সম্পন্ন করে। আর একটি কারণেও ভীতি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শিশু যুক্তি মানে না, কিন্তু ভয়কে মানে। তাই তার অকারণ ক্রন্দন কিংবা অর্থহীন বায়না থামাতেও নানাবিধ কল্পিত প্রাণীদের সাহায্য নিতে হয়। যদিও মনস্তাত্ত্বিকেরা শিশুদের ভয় দেখানোর ব্যাপারে ঘোরতর বিরোধী, শিশুচিত্ত এতে দুর্বল হয়ে পড়ে, তবু শিশুদের অভিভাবকদের এছাড়া বুঝিবা গত্যন্তরও নেই। ভয় দেখিয়ে অনেক অবাঞ্ছিত মুহূর্তের হাত থেকে তাঁরা সহজেই রেহাই পান। একটি ছড়ায় বলা হয়েছে ঃ

কটকটেটা বলে আমি এই গাছে আছি
যে ছেলেটা কাঁদে তার জুলপি ধরে নাচি।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ছড়াকার নিজেকে গোপন রেখেছেন, একেবারে 'কটকটে'র সরাসরি বক্তারূপে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, যাতে শিশুর ওপর

তার প্রভাব দ্রুত কার্যকরী হয়। ক্রন্দনরত যে শিশুকে থামাতে 'কটকটে' নামক এক প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে, সে শিশুর জুলপী ধরে নাচবার ভয় দেখিয়েছে। যে শিশুর এখনও হয়ত জুলপি ওঠেনি, তবু কটকটের সাবধান বাণীকে তার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি সে কান্না থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে আর একটি ছড়ায় ক্রন্দনরত শিশুকে ভয় দেখান হয়েছে 'একনেড়ে' নামক প্রাণীর কথা বলে—

একনেড়ে কুলে বেঁড়ে, তালগাছে থাকে
যে ছেলেটা কাঁদে তার কানে ধরে নাচে।

এমনিতে শিশুকে কান ধরবার ভয় দেখালে হয়ত সে একটুকুও ভীত হত না, কিন্তু এক নেড়ে কান ধরবে বললে তখন আর তার পক্ষে অবিচল থাকা সম্ভব হয় না। সে কান্না থামায়, চুপ করে।

শিশু বেড়াতে যাবার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। নিজের বাড়ীতে তার মন টেঁকেনা মোটেই। অথচ সব সময় শিশুর ইচ্ছামত তাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শিশু জানে তার মোক্ষম অস্ত্র হল ক্রন্দন। চোখের জলে সে সকলকে সহজেই মাত করতে পারে। তাই নিজের ইচ্ছাপূরণ না হওয়ায় সে ধরে তার পথ। ধুলায় লুটিয়ে পড়া ক্রন্দনরত শিশুকে ত আর যুক্তি দিয়ে বোঝান সম্ভব নয়, অগত্যা তাই জটাবুড়ির শরণাপন্ন হতে হয়—

নন্দ কিশোর ধুলায় ধূসর ধুলা মেখেছে গায়
চোখের কাজল মুখে মেখে পাড়া বুলতে যায়।
পাড়ায় আছে জটাবুড়ি কটমটিয়ে চায়।

একে ত যে সে বুড়ি নয় জটাবুড়ি, তার ওপর তার চাওয়াটাও স্বাভাবিক নয়, একেবারে কটমটিয়ে চাওয়া। প্রশ্ন উঠতে পারে, 'জটাবুড়ি' বলতে শিশু কি বোঝে? এসব ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ আসল ব্যাপার নয়, ব্যঙ্গার্থই আসল। অপরিচিত শব্দ শুনেই শিশু অনেকটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, অর্থ না বুঝুক, এটুকু বোঝে যে তার পক্ষে ক্ষতিকারক ভীষণ দর্শন কোন প্রাণী অপেক্ষারত। ব্যাস তাহলেই কাজ।

ক্রন্দনরত শিশুকে ভোলাতে একটি ছড়ায় কোন প্রাণীর পরিবর্তে একটি ফুলের প্রলোভন দেখান হচ্ছে, যে ফুলটিও অপ্রাকৃত, নাম গগন ফুল, আর যার দাম দু'এক টাকা নয় একেবারে একলক্ষ টাকা।

তুলে এনে দিব গগনফুল।
একটি ফুলের লক্ষটাকা মূল ।।
যে ফুলে গড়াব হার সোনার।
যাদুরে কেঁদোনা আর।

শিশুর কাছে লক্ষ টাকার প্রকৃত তাৎপর্য অস্পষ্ট থেকে যায়, তবে এটুকু সে হয়তো বোঝে, যে ফুলের কথা বলা হয়েছে তা খুবই দুর্লভ, খুবই মহার্ঘ, ঠিক তারই মতন। তাই প্রলুব্ধ হয়ে সে তার কান্না থামায় পাছে এমন মহার্ঘ একটি ফুল তার হাতছাড়া হয়ে যায় এই আশঙ্কায়। অথবা ফুলের মূল্য সম্পর্কে কিছু না বুঝেও কান্না থামায়, থামায় ছড়ার মাধুর্যমণ্ডিত আবৃত্তিতে।

আয়রে পাখী চঞ্চলা,
খেতে দেব দুধ কলা।

পাখী মাত্রই চঞ্চল, কিন্তু তাই বলে 'চঞ্চলা' বলে কোনো পাখীর সন্ধান পক্ষীতত্ত্ববিদদেরও গোচরীভূত নয়। তাই চঞ্চলা পাখীটিকেও আমরা অপ্রাকৃত জগতের বলেই কল্পনা করে নিতে পারি।

বাংলা দেশে দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, কোকিল, বউ কথা কও এবং আরও হরেক রকম পাখীর সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু 'লটকুনা' নামক পাখীর সাক্ষাৎ এখানে মেলে না, এই পাখীর সাক্ষাৎ পেতে হলে হাজির হতে হবে ছড়ার রাজ্য। শিশুকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে যেতে জননী বা জননী স্থানীয়াকে আয়াস করতে হয় দস্তুরমত। শিশু সহজে ঘুমের রাজ্যের বাসিন্দা হতে চায় না, আর এ ব্যাপারেও মোক্ষম অস্ত্র হল ছড়া। একটি ঘুম পাড়ানি ছড়ায় বলা হয়েছে ঃ

আয়রে পাখী লটকুনা
ভেজে দিব তোরে বর-বটনা।

'লটকুনা' পাখীর সাক্ষাৎ শিশু বিনিদ্র অবস্থায় না পেলেও ঘুমের রাজ্যে নিশ্চিত করেই পেয়ে থাকে, তাই তারই লোভে শিশু দ্রুত নিজেকে সমর্পণ করে দেয় ঘুমের রাজ্যে।

শিশুকে অকৃত্রিম আনন্দ দানের জন্য যেমন 'লটকুনা' পাখীর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে, তেমনি কল্পনা করা হয়েছে ভুঁড় শিয়ালের—

আখ বনের পাশে
ভুঁড় শিয়ালী নাচে ।।

শিয়াল ডাকে, কিন্তু তার নৃত্যের খবর বড় একটা পাওয়া যায়না। অবশ্য শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য এ হেন শিয়াল শুধু নৃত্য কেন এর থেকে কঠিন কোন কাজ করতে সদা প্রস্তুত থাকে। এখন প্রশ্ন হল ভুঁড় শিয়াল কি প্রাণী? ভুঁড়ি বিশিষ্ট শিয়াল কি? কেউ কেউ অবশ্য ভোঁদড়ের অপভ্রংশ 'ভুঁড়' শব্দটির উৎপত্তি বলে মনে করেছেন। তবে কি একই সঙ্গে ভোঁদড় আর শিয়ালীর নৃত্যরত হবার কথা বর্ণিত হয়েছে, যাই হোক ভুঁড় শিয়ালীকেও ছড়ার রাজ্যের এক প্রাণী বলে মেনে নিতে হয়।

শিশুকে আনন্দ দানের জন্য আর একটি বিচিত্র পাখীর অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে, সেটি হল 'হাট্টিমা টিম' পাখী। এই পাখীটি যেমন বিচিত্র, তেমনি বিচিত্রতর এর ডিম পাড়া। বাসায় ডিম পাড়ার পরিবর্তে এই পাখী ডিম পাড়ে মাঠে। এর ওপর তাদের আকৃতিও আবার সেই রকম। মাথায় এদের দুটি খাড়া শিং। ছড়ার বর্ণনানুযায়ী—

হাট্টি মা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম।

শিশু এ হেন পাখীর বর্ণনায় যত না ভয় পায়, তদপেক্ষা মজা পায় অনেক বেশী। বলা যায় শিশুর মজা পাবার সম্ভাবনা থেকেই এই পাখীর উৎপত্তি।

ঠোঁঠী ঠোঁঠ কড়লী আঠার বিলে চরে,

ঠোঁঠ যুক্ত যে কোনো পাখীকেই ঠোঁঠী বলা চললেও কড়লী পাখীটির অস্তিত্ব আমাদের জানা নেই। তাই অনুমিত হয় এটি মরলোকের নয়।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে আনন্দ দানের তুলনায় ভয় পাওয়ানোর উদ্দেশ্যেই অপ্রাকৃত প্রাণীদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি ছড়ায় 'কটি টিং টিং' এর ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছে—

ওপারে যেও না ভাই,
কটি টিং টিং এর ভয়,
তিনটে মানুষের মাথা কাটা,
পায়ে কথা কয়।

শুধু এই প্রাণীটির নামকরণটিই বিচিত্র নয়, বিচিত্র দর্শনের ও রীতির প্রাণীও বটে সে। তা না হলে তার পায়ের সাহায্যে কথা বলা সম্ভব হত না, আর তিনটি মানুষের মাথা কাটার মত আকৃতিও তার হত না।

অপর একটি ছড়ায় বর্ণিত হয়েছে 'হুট টুমাটুম হুলো পাঁদারুর' কথা—

তাল গাছেতে হুট টুমাটুম হুলো পাঁদারু
চোত মাসের গরমীতে মলো মাগরু ।।

কিংবা হুতুম থুমো সম্পর্কিত সেই ছড়াটি—

তাল গাছেতে হুতুম থুমো-
কাল আছে পাঁদারু ।
মেঘ ডাকছে বলে বুক করছে গুরু গুরু ।

'কাল ভুত' তেমন অপরিচিত না হলেও তাকে অপ্রাকৃত জগতের বাসিন্দা বলেই ধরে নিতে হয়—

কত কি যে মজা কসে
দাঁত গাবাব বসে
ও বাবারে কালো ভুতে
আর যাব না জোছনা রাতে ।।

পরিচিতের তুলনায় অপরিচিত, অজ্ঞাত প্রাণীর প্রতিই আমরা যেন অধিক আকর্ষণ বোধ করি। সেই জন্যই কি এই সব অপ্রাকৃত প্রাণীদের ভীড় ঘটেছে ছড়ার রাজ্যে? যাই হোক, এ সব অপ্রাকৃত প্রাণীদের স্বরূপ ব্যাখ্যা কোন পরিণত বয়স্ক জীব বিজ্ঞানীর কাজ নয়, এদের স্বরূপ জানার জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে শিশুদের কাছেই।



বাংলা ছড়ার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ

আচার্য সুকুমার সেনের একটি মন্তব্যকে উদ্ধৃত করেই বর্তমান নিবন্ধ শুরু করা যেতে পারে। আচার্য সেন মন্তব্য করেছেন : 'আমাদের লোক-সাহিত্য চর্চায় হাতে খড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু হাতে খড়ি নয় এ বিষয়ে আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রও কানে দিয়ে গেছেন।'[১]—আপাত-ভাবে মন্তব্যটিকে আতিশয্যদোষে দুষ্ট বলে মনে হওয়া স্বভাবিক দ্বিবিধ কারণে। প্রথমতঃ আচার্য সেনের রবীন্দ্র-ভক্তি সর্বজন বিদিত। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক বুঝিবা নিছক ভাবালুতা প্রসূত হয়ে সত্য বিবর্জিত এই মন্তব্য করতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হ'ল উচ্ছ্বাস প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেহেতু আমাদের প্রত্যেকেরই কম-বেশি দুর্বলতা, যেহেতু তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাই বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের যেকোনও প্রসঙ্গে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকার কথা প্রকাশে আমাদের সীমাহীন উৎসাহ। এক্ষেত্রেও হয়ত বা সেই উৎসাহেরই প্রতিফলন ঘটে থাকবে। অতএব সেন মশাইয়ের মন্তব্যের যাথার্থ বিচারে প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল আমরা বাংলা ছড়া, লোককথা, লোকসঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল কিংবা এইসব উপাদান সংগ্রহ, চর্চা,

১. ভূমিকা : বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস।

বা বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনা করা থেকে বিরত থাকব, আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে বাংলা ছড়া চর্চার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে। সামগ্রিকভাবে লোক-সংস্কৃতির পরিবর্তে এই "ছড়া" সম্পর্কিত আলোচনা স্বভাবতই আংশিকতায় সীমাবদ্ধ থাকলেও বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় রবীন্দ্রনাথের স্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হবে বলে বর্তমান লেখকের বিশ্বাস।

১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ই চৈত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরূপে আগত ও কলকাতাস্থিত কলেজের ছাত্রদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফে যে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।'[২]

বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জমান ছড়াগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃ ভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, ···আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটো বড়ো অনেক জিনিষ অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

'বঙ্গদর্শনে'র প্রবন্ধটি রচনার বছর নয় পূর্বে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রতে'র (১৩০৩) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।' আমরা সচরাচর অন্যকে যে উপদেশ দান করি, নিজেরা ব্যক্তিগত জীবনে তা অনুসরণ করি না। রবীন্দ্রনাথ শুধু ছাত্রদের ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েই কর্তব্য সমাপন

২. বঙ্গদর্শন : বৈশাখ সংখ্যা ১৩১২।

করেননি, নিজেও সেই দায়িত্ব পালন করেছেন সাধ্যমত। শুধু অঘোরবাবুর গ্রন্থের ভূমিকাই তার প্রমাণ নয়, প্রমাণ ১৩০১ সনের ১৬ই আশ্বিন তারিখে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' নামে প্রবন্ধপাঠ, যেটি 'সাধনা' পত্রিকার ১৩০১ সনের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় (পৃঃ ৪২৩—৪৭৪) ঐ একই নামে প্রকাশিত হয়। প্রমাণের এখানেই শেষ নয়। রজনীকান্ত গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় (১৩০১ বঙ্গাব্দ ; মাঘ ; পৃঃ ১৮৯—২০২) প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছড়া এবং সেগুলির আলোচনা। উল্লেখযোগ্য, লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আবেদন কেবল ছাত্রদের উদ্দেশে ১৩১২ বঙ্গাব্দেই উচ্চারিত হয়নি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রেও তিনি আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, 'এক্ষণে সাহিত্য পরিষদের পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাহারাও যথাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহ কার্যে সাহায্য করিবেন' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ; ১৩০১ ; মাঘ ; পৃঃ ১৯২ ;)।

ছড়া সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় প্রবন্ধ 'মেয়েলি ছড়া'ও প্রকাশিত হয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় (পৃঃ ৩৭৪—৩৭৯ ; ৩য় সংখ্যা ; ১৩০২)। ছড়া সম্পর্কে তাঁর শেষ প্রবন্ধ 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৫ সনের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'লোক সাহিত্য' গ্রন্থে এই প্রবন্ধগুলিই সংকলিত হয়, তবে পরিবর্তিত নামকরণ নিয়ে। যেমন 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়া সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়, 'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ১' ; সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়া সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধের নামকরণ করা হয় 'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২' নামে। রবীন্দ্রনাথ সংকলিত ছড়ার সংখ্যা ৮১। তবে তিনি ছড়া সংক্রান্ত আলোচনায় এছাড়াও যেসব ছড়া ব্যবহার করেছেন, সেগুলিকে ধরলে তাঁর সংকলিত ছড়ার সংখ্যা হবে শতাধিক।

লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্যক-রূপে অবহিত, তথাপি ছড়ার প্রতি যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ এবং অন্তরের অকৃত্রিম দুর্বলতা ছিল সে সত্য অনস্বীকার্য। বাল্যাবস্থা থেকেই কবি ছড়ার রাজ্য সম্পর্কে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ছন্দোবন্ধ পদের যে বিশেষ আবেদন, কবি তা অনুভব করেছিলেন 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই শব্দ নিচয় থেকে, কবির কাছে 'আদি কবির প্রথম

কবিতা' রূপেই যা প্রতিভাত হয়েছিল। এরপর 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই সুপরিচিত ছড়াটি যে কবির শৈশবে 'মেঘদূত' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এবং মোহমন্ত্র রূপে তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল, কবি তা অকপটে স্বীকার করেছেন। দীর্ঘ ৩৪ বৎসর পরেও এর প্রভাব থেকে যে কবি মুক্ত হতে পারেননি, এতেই প্রমাণিত হয় ছড়াটির প্রতি কবির অমোঘ আকর্ষণের বিষয়টি। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ছড়ার ছন্দে রচনা করেন 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' শীর্ষক কবিতাটি। 'ছেলেবেলা'য় কবি উল্লেখ করেছেন তাঁর সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে পাড়াগেঁয়ে ছড়া সুর সংযোগে গাইতে শিখেছিলেন। কবির ভাষায়, '…এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখেনা, আপনা-আপন নাড়ীতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন ভোলানো প্রথম সাহিত্য—শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন ভুলানো গান শেখানোর সুরু সেই ছড়ায় এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়ে ছিল।' কবির বক্তব্য যে আতিশয্য দোষে দুষ্ট নয়, তারই প্রমাণ মেলে সে সময়ে তাঁর লেখা কয়েকটি ছড়ার উল্লেখে। 'জীবন স্মৃতি'তে কবি উল্লেখ করেছেন ঠাকুর বাড়ীর খাজাঞ্চী কিশোরী চাটুজ্জেও কবিকে ছড়ার জগতের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন তাঁর বাল্যকালেই—

দুত লয়ে আউড়ে যেত লব কুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া ;

পরিণত বয়সে কবি যে ছড়া সম্পর্কিত আলোচনায় বাল্য জীবনের এই সব সুমধুর স্মৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তাঁর স্বীকারোক্তিতেই মেলে। কবির 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থগুলিতে এবং তাঁর অন্যান্য কাব্যে সংকলিত বহু কবিতায় তাঁর ছড়া প্রীতির নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছড়া সম্পর্কিত আলোচনায় ছড়ার প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হবার কারণগুলি উল্লেখ করেছেন। ছড়ার সঙ্গে কবির বাল্য স্মৃতি যে যুক্ত ছিল, ছড়ার প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হবার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও ছড়ার কাব্যরস, মাধুর্য, এর অসংলগ্নতা, চিরত্ব, অনায়াস রচনা কৌশল, ছড়ার সঙ্গে আবৃত্তিকারিণীর সুধা স্নিগ্ধ সুরের উপস্থিতি, ছন্দোনির্মিতি কৌশল এবং চিত্র ধর্মিতা কবি চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। সব মিলিয়ে ছড়ার কাব্যরসে কবি অভিষিক্ত

হয়েছিলেন, '...তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।'

আজকের লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীরা বিষয়ানুবন্ধন - লোকসংস্কৃতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটির ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় আধুনিক বিচারে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন না, তথাপি বাংলা ছড়ার বিশ্লেষণে তাঁকে এর সঙ্গে ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করতে দেখা গেছে।

আপাতভাবে যে ছড়াগুলিকে নিছক শিশু ভোলানাথদের উপভোগ্য বলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অদ্বিতীয় প্রজ্ঞায় সেইসব ছড়ায় ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান লাভ করেছিলেন -

'শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষ মধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন, একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও আমার টুকরা জগৎ বলিয়া মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে... ।'

আপাত অসংলগ্ন অর্থহীন বলে প্রতিভাত ছড়াগুলি থেকে যে মূল্যবান নৃতাত্ত্বিক উপাদান লভ্য, সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সচেতনতার পরিচয় মেলে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি থেকে—

'যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্র তীরে কর্দম তটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখীদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল-- অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম, পদচিহ্ন রেখা সমেত পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে,.... তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে।'

আমাদের ভাষা ও সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন সঞ্জাত যে রূপের সঙ্গে আমরা বর্তমানে পরিচিত, সেই পরিচিতির পূর্ণতা লাভের জন্য ছড়াগুলির অপরিহার্য ভূমিকা সম্পর্কেও কবি ছিলেন সম্যক রূপে অবহিত। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে... ।'

ছড়ার মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব বিষয়েও কবির সচেতনতার পরিচয় মেলে।

ছড়াগুলিতে যে আমরা অসংলগ্ন চিত্রের পরিচয় পাই, রবীন্দ্রনাথ তার কারণ যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি শিশুদের কাছে যে কোনকিছুই অসম্ভব কিংবা অসঙ্গত নয় তারও মনোবিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, 'ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছুই নাই কারণ, তাহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই।' মানবমনের বিভিন্ন স্তর ও ক্রিয়া সম্পর্কে কবির অবহিতির পরিচয় আমরা পাই যখন তিনি বলেন, 'সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মত যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন অলক্ষ্য বায়ু প্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্তন পূর্বক ক্রমাগত মেঘ রচনা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যদি কোন অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্ব প্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম'—মন্তব্য থেকে।

কবি আরও বলেছেন,

'...আমাদের মনের মধ্যে বিশ্ব জগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প—এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ সকল সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ।'

আমরা জানি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ছড়ার পাঠান্তরই সর্বাধিক। নিছক ছন্দোনির্মিতি কৌশলকে আশ্রয় করে একই ছড়া যে নিত্য কত নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করে, রবীন্দ্রনাথ এই সত্য সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'ইহারা সজীব, ইহারা সচল, ইহারা দেশকালপাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীর কাছে পাঠান্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানী না হয়েও কিন্তু বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। ·· ছড়ার··· নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।' শুধু মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হননি কবি, তাঁর সংকলিত 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটির সর্ব মোট চারটি

পাঠ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সংকলিত ২৯ সংখ্যক ছড়ার ৪র্থ পংক্তিতে আছে—

পাক দিয়ে দিয়ে নিয়ে বেড়াব
আমাদের ছেলে।

পাদটীকায় কবি এর পাঠান্তর উদ্ধার করে দিয়েছেন—

হিন্দলা দিয়ে বেড়াবে যেন বড়ো মানুষের ছেলে ॥

কবির সংকলিত ৩৩ সংখ্যক ছড়ায় আছে—

সয়দা বাদের ময়দা, কাশিম-বাজারের ঘি
একটু বিলম্ব করো, খোকাকে লুচি ভেজে দি ॥

এর পাঠান্তর সংযোজিত হয়েছে—

উলোর ভুঁয়ের ময়দা রে সয়দা বাদের ঘি।
শান্তিপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি ॥

লোক সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের রচনা হয়েও তা সংহত সমাজের সৃষ্টি-রূপেই পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষ সংহত সমাজের মুখপাত্ররূপে রচয়িতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাই লোককথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদির রচয়িতার কোনো সন্ধান মেলে না। রবীন্দ্রনাথ যে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাঁর সেই সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি—

'কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না।' বলাবাহুল্য, শিষ্ট তথা পরিশীলিত সাহিত্যের সঙ্গে লোক-সাহিত্যের নানা পার্থক্যের মধ্যে এটি যে অন্যতম, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন এই ভাবে।

এইবার আমরা রবীন্দ্রনাথের আলোচনার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আলোকপাত করতে পারি। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা আংশিকতা দোষে দুষ্ট রবীন্দ্রনাথ কৃত ছড়ার শ্রেণী বিভাগটি তেমন স্পষ্ট নয়। আসলে তিনি নিজেও হয়ত এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন না। প্রথমে তিনি নামকরণ করেছিলেন 'মেয়েলি ছড়া', আসলে ছেলেদের ভোলাবার জন্য মেয়েরাই ছড়া আবৃত্তি করে থাকে, সেই কথা মনে রেখেই এবং বিধ নামকরণ করেছিলেন; পরে পরিবর্তিত নামকরণ করেন 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। কবি এক্ষেত্রে ছড়ার ব্যবহার কারিণীকে বাদ দিয়ে ছড়ার উপলক্ষ্য বা শ্রোতাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'গ্রাম্য সাহিত্যে' আবার ছড়াকে 'গ্রাম্য ছড়া' বলে অভিহিত করেছেন। 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে ছড়াগুলিকে যে তিনি 'হরগৌরী বিষয়ক' এবং 'কৃষ্ণ রাধা বিষয়ক'

এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন তাও যথাযথ হয়নি। আসলে এগুলি গ্রাম্য গীতি। কবি কৃত বিভাগে ব্রতের ছড়া স্থান পায়নি। ছেলে ভুলানো ছড়ার সঙ্গেই কবি ছেলে খেলার ছড়াকেও স্থান দিয়েছেন। বলাবাহুল্য উভয়ের চরিত্র কিন্তু এক নয়। কবি তাঁর সংকলিত ছড়াগুলির সংগ্রহস্থল বা সংগ্রহসূত্র সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ করেননি। ১৩০১ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কবি উল্লেখ করেছিলেন সংকলিত ছড়াগুলি 'কলিকাতায় সংগৃহীত' বলে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এগুলি সবই কলকাতা থেকেই সংগৃহীত হয়নি, সংকলিত ছড়াগুলির মধ্যে ২৪ পরগণা, হুগলী এবং যশোহর জেলার ছড়াও আছে। আর আছে বিক্রমপুর থেকে সংগৃহীত ছড়া। কেবল বিক্রমপুর থেকে সংগৃহীত ছড়াগুলির ক্ষেত্রে সংগ্রহস্থল উল্লিখিত হয়েছে। ঢাকা বিক্রমপুরের প্রাদেশিক ভাষায় রচিত ছড়াগুলির ভাষা কবি পরিবর্তন করেছিলেন। লোক সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহে বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কবি সচেতন থেকেও এবং ব্যক্তিগত রুচিবোধের কোন স্থান লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ কিংবা আলোচনায় নেই জেনেও কবি পরিচিত একটি ছড়ার 'সেই যে বোন গাল দিয়েছে ভাতারখাকী বলে' পংক্তিটির অন্তর্গত 'ভাতারখাকী' শব্দ বিশেষকে পরিবর্তন করে 'স্বামী খাকী' করেছিলেন। এই পরিবর্তন লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞান অনুমোদিত নয়।

পরিশেষে আচার্য সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। একথা সত্যি যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লোকসাহিত্য আলোচনায় অংশ গ্রহণের কমপক্ষে ষাট বছর আগেই বাংলা লোক সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছিল। রেভারেণ্ড উইলিয়াম মর্টনের দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ (১৮৩২), রেভারেণ্ড লঙের প্রবাদমালা' (১৮৬৮), টি. এইচ. লিউনের ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত Hill Proverbs of the Inhabitants of chittagong Hill Tracts' ইত্যাদি তার প্রমাণ। এমনকি কেরীর ইতিহাস মালায় (১৮১২) অথবা ১২৯১ সালে প্রকাশিত 'নব্য ভারত' পত্রিকায় বাংলা ছড়াও সংকলিত হতে দেখা গেছে। তথাপি রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি বাঙ্গালীকে আমাদের জাতীয় সম্পদরূপে লোক সংস্কৃতির গুরুত্ব, তার সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন, ব্যাপকভাবে বাঙ্গালীকে লোকসংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সক্রিয়তায় বাঙ্গালী ব্যাপক ক্ষেত্রে এই অবহেলিত বিষয়ের চর্চায় মনোযোগী হয়। এই জন্যই আচার্য সেন মন্তব্য করেছেন 'আমাদের লোক সাহিত্য চর্চায় হাতে খড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।' আজও আমরা তাঁরই নির্দেশিত পথের পথিক।



বাংলা লোক-সঙ্গীতের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র

বাংলা লোক-সঙ্গীত সংহত সমাজের সৃষ্টি; শুধু সংহত সমাজের সৃষ্টি নয়, সংহত সমাজের জন্যে সৃষ্ট। তাই বিষয়বস্তু নির্বিশেষে আমাদের লোক-সঙ্গীত সংহত সমাজের দ্বারা আদৃতও হয়েছে। আমাদের সমাজের অন্তর্গত হলেন মুখ্যতঃ হিন্দু এবং মুসলমান। তাই সংহত সমাজের সৃষ্ট লোক সঙ্গীতে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু কিছু বিষয় স্থান পেয়েছে সত্য, কিন্তু ততোধিক সত্য হ'ল উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পর পরস্পরের সৃষ্ট সম্পদকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছেন। আসলে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি যতটা প্রকট, নিরক্ষর মানুষের ঐক্যবদ্ধ সমাজে সেই ভেদ বুদ্ধি ততটা প্রকট নয়। একই প্রাকৃতিক পরিবেশে, প্রায় একই রূপ জীবিকার অধিকারী হয়ে, একই ধরণের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এইসব মানুষ 'আজান' এবং 'হরিধ্বনি'কে সমান পবিত্র বলেই মানেন। এখানে পীরের দরগা এবং দেবতার পবিত্র স্থানের মধ্যেকার ব্যবধান খুবই কম। বাংলার লোক-সঙ্গীতে তাই সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা কিংবা বিশ্বাসের প্রতিফলন যাই ঘটে থাকুক শেষপর্যন্ত তা অ-সাম্প্রদায়িক সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক-সংগীতে কতখানি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা অভিব্যক্ত হয়েছে সেই বিষয়ের আলোচনাতেই নিবন্ধটির সূত্রপাত।

আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের মূলে থাকে বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও আস্থা। আমরা বিশেষ যে ধর্মে আস্থাশীল, অনেক ক্ষেত্রেই সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে অন্য ধর্মকে ছোট করে দেখি তুচ্ছ করে দেখি অন্য ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদেরও। আসলে অন্ধ বিশ্বাস

প্রশ্রয় দেয় যুক্তিহীনতাকে আর যুক্তিহীনতা আহ্বান করে আনে অর্থহীন সংস্কার এবং সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধিকে।

পরম পুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জলের উপমা দিয়ে সব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সব ধর্মেরই তুল্য মূল্যের কথা। তবু অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস আজ বিংশ শতাব্দীর শেষদশকেও বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির দিনেও বীভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করে আমাদের তথাকথিত সভ্যতার আবরণের ভেতরকার উৎকট রূপটিকে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আজ থেকে বহুকাল আগে সৃষ্ট লোক-সংগীতে অর্থহীন সংকীর্ণ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে যে স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে তা আমাদের একদিকে যেমন করে বিস্মিত, তেমনি সেই সঙ্গে আমাদের লোক-কবিদের সম্পর্কে করে তোলে শ্রদ্ধাশীল। উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানে বিভিন্ন দিকে প্রণাম নিবেদন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

আমরা পছিমে বন্দনা করি গো
আমরা আল্লাবী-ধাম।
তাহারি কারণে তাহার চরণে
আমরা জানাইলাম সেলাম।
আমরা উত্তরে বন্দনা করি গো
ঐ না দেবী মায়ের চরণ,
তাহারি কারণে আমরা জানাইলাম প্রণাম।
আমরা পুরব বন্দনা করি গো
ঐ না ধর্ম নিরঞ্জন,
তাহারি চরণে আমরা জানাইলাম সেলাম।
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি গো
ঐ না ক্ষীর নদী-সাগর,
সেখানে হারাইছে সেরা আলি খেলাড়ি পাথর।

পশ্চিম দিক 'আল্লার ধাম' বলে যেমন সেই দিকের উদ্দেশে লোক-কবির সেলাম নিবেদিত হয়েছে, তেমনি আবার উত্তরে 'দেবী মা'য়ের চরণের প্রতিও কবি তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদের একটি বাউল গানে আল্লা এবং হরি যে মূলতঃ এক, উভয়ের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কিত সর্বপ্রকার সংশয় যে অর্থহীন, আন্তরিক

ভাবে যাঁরই স্মরণ নেওয়া যায়, তাঁরই করুণায় চিরবাঞ্ছিত অরূপ রতনের সন্ধান লাভ ঘটে এই সত্যটিকে প্রকাশ করে বলা হয়েছে ঃ

ভোলা মন আমার, কেন তুমি অচেতন,
ও তোমার মনের কোণে সন্দেহ যে অকারণ ॥
কেবা আল্লা কেবা হরি ভাব তুমি অকারণ।
সেই দীননাথ ভবের কাণ্ডারী,
ও মন, যারে ভজ তারেই পাবে মিলবে তোমার অরূপ ধন ॥

যথার্থ ভক্তি মার্গের পথিক যিনি, তিনি জানেন রাম রহিমে কোন ভেদ নেই। আল্লা এবং হরিকে আমরা যতই কেন রূপগত বিচারে পৃথক করে দেখি স্বরূপে উভয়েই এক। একটি গাজীর গানে লোক-কবি আমাদের চেতনার রাজ্যে সত্যের সেই মর্মবাণীকেই উপস্থিত করেছেন ঃ

মুসলমানে বলে গো আল্লা হিন্দু বলে হরি
নিদানকালে যাবেরে ভাই একই পথে চলি (রে)
দোয়া নি করিবা আল্লারে।

মুসলমান সমাজের ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত গনেও এই একই সত্য অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম অথবা ঈশ্বর নিয়ে অর্থহীন যে দ্বন্দ্বের অবতারণা করে, ভক্ত কবির কাছে তা যে কতখানি মূল্যহীন, পরম সত্যকে যিনি একবার অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে কোন প্রকার জাগতিক সংস্কারই যে বড় হয়ে দেখা দিতে পারে না তার পরিচয়ও নিম্নোদ্ধৃত ফকিরী গানটিতে পাওয়া যায় –

আমি তোমার কাঙালী গো সুন্দরী রাধা
আমি তোমার কাঙালী গো
তোমার লাইগ্যা কাইন্দা ফিরে
হাছন রাজা বাঙালী গো।
হিন্দুরা বলে তোমায় রাধা
আমি বলি খোদা,
রাধা নামে ডাকলে
মুল্লা মুন্সীরে দেয় বাধা।
হাছন রাজা বলে আমি না রাখিব জুদা,
মুল্লা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা।

মালদহের একটি গম্ভীরা গানে শিবকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে তাঁর

উপস্থিতি সর্বত্র, কখনও বা তিনি মক্কাবাসী, আবার কখনও তিনি শ্মশান-বাসী, কখনও আবার কালীর পাটে তাঁর অবস্থান

বুড়া ভারী ঘুস্‌্কিছিলান থাকে সব ঘটে,
কখন দেখি মক্কা, কাশী কখন শ্মশানঘাটে,
কখন কালীর পাটে,

(ও) বুড়া হোয়্যা কাজি, মক্কার হাজী আছে আড়্যাতে চড়্যা ॥

নদীয়া থেকে সংগৃহীত একটি বাউলগান এবারে উদ্ধার করা গেল যে গানে পরম শক্তিমান ঈশ্বরকে জগৎ সংসারের সবকিছু বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঈশ্বর নিজেই ভাল, নিজেই মন্দ, তিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালী, তিনি সৃষ্টির সর্বত্রই বিরাজমান, সর্বরূপে তাঁর স্থিতি, এমন কি তিনিই মুসলমান।

যে ভাবেতে রাখেন গো, সাঁই, আমি সেই ভাবে থাকি।
অধিক আর বলব কি ॥
কখনও দুগ্ধ চিনি, ক্ষীর ছানা মাখন ননী,
কখনও নুন আমানী, কখনও আলবুলো শাক ভুকি ॥
কুল আলম তোমারি ওহে কুদরুত নিহারী,
তুমি কালী, তুমি কৃষ্ণ, তুমি হক বারী,
তুমি দাও, তুমি দেলাও, তুমি খাও তুমি খেলাও,
তৈয়ারী ঘর ছেড়ে তুমি পালাও, আমারে ঘুরাচ্ছ দিয়ে ফাঁকি ॥
তুমি সর্ব ঘটে রও, তুমি সর্বরূপ হও,
ভালকথা মন্দকথা, সকল তুমি কও।
তুমি হও রোগীর ব্যাধি, তুমি বৈদ্যের ওষধী
তুমি গো সকল জীবের বল বুদ্ধি,
তোমার ভাব বুঝাবার ঠকঠকী।
ভবে দুঃখ দিতে তুমি, ভবে সুখ দিতে তুমি,
মান অপমান তোমার হাতে, সুনাম বদনামী।
কয়ছে বিন্দু যাদু, দয়াল, তুমি চোর তুমি সাধু,
দয়াল গো, তুমি মুসলমান হিন্দু,
আমি সে কুবির চাঁদ বলে ডাকি ॥

অর্থাৎ ঈশ্বরের কোন বিশেষ জাত নেই, তিনি সকল জাতের উর্ধ্বে। অথবা তিনি সব জাতের মধ্যেই বিদ্যমান।

আর একটি বাউল গানে উল্লিখিত হয়েছে যে ভগবান তাঁর ভক্তদের বিচার করেন ভক্তির নিরিখে, জাতের নিরিখে নয়। কথায় বলে ভক্তের ভগবান অতএব ভক্তিই হবে ভক্তের একমাত্র শক্তি যা তাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করবে—

ভক্তের প্রেমে, ওগো, বাঁধা আছে সাঁই
হিন্দু কি মুসলমান বল্যা
তার জাতের বিচার নাই।
ভক্ত ছিল কবীর জোলা ও যে পাইয়াছে ব্রজের কালা
ও তার সাধন জোরে পায়।
দেশে রামদাস মুচি ছিল সাধনে তার বুদ্ধি সিদ্ধ হৈল
ও আমি শুনি গুরুর ঠাঁই ॥

জীব মাত্রেরই পরিণাম মৃত্যু। অতএব বিষয় বাসনায় নিমজ্জিত থাকলে এবং সময়মত সাধনমার্গের সন্ধান লাভে বঞ্চিত হলে পরিণামে অন্তহীন দুঃখ ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে তাই সদ্‌গুরুর শরণ নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—

ও চাঁদ-বদনে বল, ও গোঁসাই,
ও বান্দার এক দোমের ভরসা নাই।
আপন বাড়ী আপন বিষয়
সবাই রবে, দিন গেলরে আমার ॥
বিষদ বিষ খাবি যেদিন হারাবি
এখন কাঁইদলে কি আর পাবি ভাই ॥
চাঁদ বদনে বল ও গোঁসাই ॥
কিবা হেন্দু যুবনের চেলা
পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা
পিছে কাল শমন ধইরবে তখন বিপদ ঘটিবে ভাই ॥
চাঁদ বদনে বল ও গোঁসাই'

এই মানব দেহভাণ্ডকেই বাউল সাধকেরা ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পনা করেছেন। সাধনার জন্যে তাই বাউল সাধক অন্যত্র যাবার প্রয়োজন বোধ করেন না— এমন কি তীর্থক্ষেত্র বলে পরিচিত স্থানেও নয়। অমাদের দেহ যে পাঁচটি উপাদানে তৈরী, তা হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম। মৃত্যুর পরে এই পঞ্চভুতে জীব বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু কই এই সব উপাদান

গুলির তো পৃথক কোন জাতিগত পরিচয় নেই। সব মানুষের ক্ষেত্রেই উপাদানগুলি এক। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বাউল সঙ্গীতে দেহসাধনার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

ও মন পাগলারে, তোর দেহের মধ্যে কত রং দেখরে চেয়ে।
এই যে দেহেতে আছে তারা পঞ্চ ভাই (আছে তারা পঞ্চ ভাই)
ওরা হিন্দু কিংবা মুসলমান পরিচয়ও নাই।
এই যে দেহেতে আজ নব নব নারী (আছে নব নব নারী)
দিন থাকিতে চিনে লও, মন, কার কোন বাড়ী।
এই যে দেহেতে আছে গয়া গঙ্গা কাশী (আছে গয়া গঙ্গা কাশী)
বৃন্দাবনে কানাইয়া রাজার মোহন বাঁশী।

এইবার হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি নিয়ে রচিত কয়েকটি গান নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে বাংলা লোক-সংগীত প্রায় সবই ধর্মকেন্দ্রিক। এর কারণ আমাদের সংহত সমাজ জীবনের আদ্যন্ত ধর্মীয় আচার-আচরণ অধিকার করে আছে। অবশ্য বাংলার লোক-সংগীত সাধারণভাবে ধর্মকেন্দ্রিক হলেও এমন মনে করার কারণ নেই যে সমস্ত লোক-সংগীতেই গভীর অধ্যাত্ম ভাব প্রকাশিত। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে ধর্মীয় আধারে সংহত সমাজ জীবনের আশা-আকাংক্ষা, ব্যর্থতা-নৈরাশ্য, আনন্দ-দুঃখই বেশি করে স্থান লাভ করেছে। লোক-সংগীত লোক-কবিদের আন্তরপ্রেরণাতেই রচিত, তাই এই সংগীতের বক্তব্যে কোনপ্রকার কৃত্রিমতার স্থান নেই। লোক-কবিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গানগুলি রচনা করেছেন, কেউ বাইরে থেকে জোর করে সংগীতের বিষয়বস্তু চাপিয়ে দেয় না বা এই ব্যাপারে নির্দেশ দানেরও কোন প্রশ্ন ওঠেনা। তাই লোক-কবিরা যখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে ব্যথিত হয়ে নিজেদের অন্তরের বেদনা প্রকাশ করেন কিংবা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বাঞ্ছিত সম্প্রীতির জন্য আকাংক্ষা প্রকাশ করেন, তখন তা স্বভাবতই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ না করে পারেনা।

পুরুষানুক্রমিক ভাবে যে বাস্তুভূমিতে মানুষ বাস করত, সাম্প্রদায়িক গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বাস্তুভিটা ত্যাগে উদ্যত এবং বাস্তুভিটা ত্যাগী মানুষদের জন্যে একটি জারি গানে কি আন্তরিক দুঃখই না প্রকাশিত হয়েছে, সেই সংগে বাস্তুত্যাগী মানুষদের প্রতি করুণ অনুরোধ উচ্চারিত হয়েছে তারা যেন পিতৃপুরুষদের ভিটা ত্যাগ না করে—

স্বাধীন দ্যাশে লোক পালাইল
এমন খবর শোনছ নি ?
বাপ দাদার ওই ভিটা ছাইড়্যা,
চলছে সব বিদ্যাশে কি ?
হিন্দু-মোছলমান একই জাত ভাই,
একই দ্যাহের দুইডা হাত,
কেউ কারু নয় শত্তুররে ভাই,
দুইয়ে, দুইয়ে মিত্তির হয়
রোজ সকালে আজান গান,
আর বেরাম্ভনের মোন্তর পাঠ,
সন্ধ্যাকালে নেমাজ পড়ে,
কূলনারী পীদ্দম দ্যায়,
এক সাথেতে রইছি মোরা,
এক সাথেতে করছি খেলা,
একই সঙ্গে চলছি ফিরছি
এখন ক্যানে ভিন্ন ভাব ?
(ও ভাই) পরের কথায় পরের ভরসায়
ছাইড়ো না দ্যাশ মাথা খাও।

মালদহের গম্ভীরা গানে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বড় বেশী করে স্থান পেয়েছে লক্ষ্য করা যায়। একটি গম্ভীরা গানে শিবের কাছে দুঃখ করে বলা হয়েছে, যে হিন্দু-মুসলমান গভীর সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করত এবং পুজার্চনায় অংশ গ্রহণ করত, এখন সেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কতই না অকারণ বিরোধ যার পরিণামে দুই সম্প্রদায়ের মানুষকেই ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে—

হায়রে আল্লা কি হোল, হিন্দ-মোসলেম দুই মোলো।
দেখছি জাতিয়ারী জাতিয়ারী কোর‍্যা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পোল ॥
মোসলেম কোহছে হাম বাড়া, হিন্দু দেয় নাকো সাড়া।
ভোলা তোমার দেশে একুন ভেসে দোটানা ভাব দাঁড়ালো ॥
ভোলা তুমি মুসলমানের আদব, হিন্দুর শিব শিব বোম্ বোম্।
হামরা দুয়োভায়ে কততুক পুজা
মানধোৎ কি মজা ছিল ॥

অধ্যাত্ম জগতের মানুষ হয়েও লালন আমাদের অর্থহীন জাতিভেদ

প্রথা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সচেতন করে দিয়ে গেছেন নানা সঙ্গীতের মাধ্যমে—

জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে
কেউ মালা কেউ তজবি গলায়
তাইতে তো জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে।

সাধক কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আচার-অনুষ্ঠান নয়, অকৃত্রিম ভক্তির মাধ্যমে সেই পরম অভিলাষিত ঈশ্বর লাভ সম্ভব—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই ॥

আমাদের গীতিকাগুলিতেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পরিচয় লভ্য। পীর বাতাসীর পালায় কবি রজনীগোপাল বন্দনা অংশে সংগীতের আসরে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর শ্রোতাকেই বন্দনা যেমন করেছেন, তেমনি বন্দনা করেছেন উভর সম্প্রদায়ের পবিত্র ক্ষেত্রগুলির—

সভাজনে বন্দুম রে ভাই হিন্দু মোছলমান।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে
মক্কা মদিনা বন্দুলাম মুই কাশী গয়া খান ॥

'ছুরত জামাল—অধুয়া সুন্দরী' পালায় ফৈজু ফকির যে উদার দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারিনা। হিন্দু ও মুসলমানের পরিণতি সম্পর্কে কবি উল্লেখ করে বলেছেন

হিন্দু ভাই মইরা গেলে নিব গাঙ্গের ভাটি।
মোছলমান মইরা গেলে তারে পাইড়া দিব মাটি ॥

অন্যত্রও কবি বলেছেন ঃ

হিন্দু মোছলমান দেখ আছে দুনিয়ায়।
এক আল্লার সরজন জানাইও সভায় ॥

'দেওয়ান ঈশা খাঁ মদনদালি'তে কালিদাস একটি মন্তব্য করেছেন, বলেছেন—

সেই ঈশ্বর সেই আল্লা এক কইরা মানি।
কথায় আর কাজে কেনে করি দুইখানি ॥

বর্তমানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কিংবা জাত-পাতের রাজনীতি যখন ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করার মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে তখন আমরা শুভবুদ্ধির মানুষরা যেন লোককবিদের আবেদন তথা বক্তব্যের দ্বারা চালিত হই।



বাংলা লোক-সংগীতে সমসাময়িক জীবন ও প্রতিক্রিয়া

লোক-সাহিত্য সম্পর্কে কোন কোন মহলে এমন একটা অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় যে এর উপাদান নাকি সবই বিগত দিনের। অর্থাৎ লোক-সাহিত্য বর্তমানকে স্বীকার করেনা, অতীতের বিষয়বস্তুর সংগেই এর সম্পর্ক। আর এই কারণে এই রকম সিদ্ধান্তও করা হয়ে থাকে যে লোক-সাহিত্য বৈচিত্র্যহীন, যুগের পরিবর্তনকে স্বীকার না করে নেওয়ার ফলে এই সাহিত্য ঠিক আধুনিক পদবাচ্য হবার যোগ্যতা লাভের অধিকারী নয়। লোক-সাহত্য সৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ, এমন কথাও বলতে শোনা যায়। একথা ঠিকই যে সাহিত্যের সজীবতা নির্ভর করে যুগের চলমানতাকে স্বীকার করে নেওয়ায়। যে সাহিত্য সমসাময়িক জীবনকে স্বীকার করেনা বা সমসাময়িক জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে যা যুক্ত তাকে অস্বীকার করে, সেই সাহিত্যের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। যথার্থ সাহিত্যকে অনেকগুলি দাবী মেটাতে হয়—তার মধ্যে একটি হল—তা অবশ্যই সমসাময়িক জীবনকে প্রতিফলিত করবে। লোক-সাহিত্যও সর্বোপরি সাহিত্য, তাই সমসাময়িক জীবন তথা যুগকে বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করার দায় লোক-সাহিত্যেরও। আর বলাবাহুল্য এই দায় মেটাবার পরিচয় যদি আমরা লোক-সাহিত্যে পাই, তাহলে কোনমতেই আমরা তাকে বৈচিত্র্যহীন বলে অভিহিত করতে পারিনা কিংবা পারিনা লোক-সাহিত্য রচনার ধারা রুদ্ধ একথা বলতে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে আমরা লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে কেবল বাংলা লোক-সংগীতের কিছু পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করব।

একথা ঠিকই যে বাংলা লোক-সাহিত্যের সিংহ ভাগ অধিকার করে আছে ধর্ম এবং ধর্ম সংক্রান্ত কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়। গতানুগতিক তথা প্রথাসিদ্ধ বিষয়ও বাংলা লোক-সঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সমসাময়িক কালের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের স্বাক্ষর বহন করছে এমন লোক-সঙ্গীতের সংখ্যাও খুব কম নয়। আমাদের গ্রাম বাংলার সংহত সমাজের তথাকথিত নিরক্ষর মানুষগুলির যুগচেতনার পরিচয়বাহী কয়েকটি সংগীতের উল্লেখ করে আমরা দেখাতে প্রয়াস পাব যে, আমাদের লোক-সংগীতের ধারা কত সজীব, আর সেই সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে লোক-সাহিত্য সৃষ্টির ধারা ব্যাহত হবার নয়। চলমান জীবনের সব কিছুকে শুধু আয়ত্ত নয়, আত্মস্থ করে, নিত্য নতুন উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে তার যাত্রা এখন সমান গতিশীল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনটির সঙ্গে সমাজ সংস্কারক পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামটি গভীরভাবে যুক্ত এবং যে আন্দোলন সমগ্র বাঙ্গালীর জীবনে সৃষ্টি করেছিল এক তীব্র আলোড়ন—তা হ'ল বহু বিতর্কিত বিধবাবিবাহ আন্দোলন। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত কিন্তু এই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে বিদ্যাসাগরেরই দুর্দমনীয় প্রয়াসে। সে যুগে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এবং এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার পক্ষে-বিপক্ষে তীব্র জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। একটি লোক-সংগীতেও এই বিষয়টি স্থান পেয়েছে এবং সংগীতটিতে বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের প্রতি সমর্থন জানান হয়েছে। সেদিনের পল্লী-বাংলার সংহত সমাজ বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত প্রয়াসকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল, সংগীতটি তারও এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিঃসন্দেহে—

ওরে বিদ্যেসাগর দিবে বিয়ে
বিধবাদের ধরে,
তারা আর ফেলবেনা চুল,
বাঁধবে বেণী গুঁজবে রে ফুল,
শাঁখা শাড়ী পরবে নতুন করে।
হায়রে ঐ বেজো মণ্ডল,
বেটা বলবে নেহাৎ গাড়ল,
শয়তানি সব যাবে চুলোর দোরে।

বেটা বলে কিনা বিদ্যেসাগর নিরেট বোকা,
একেবারেই মাথা মোটা,
নইলে বিধবাদের এমনি করে,
বসাতে চায় আদর করে ॥
দেখরে বেটা চেয়ে এবার,
নতুন বনে চলল সেজে নতুন বরের ঘরে,
উলু দেওগো জননীরা বধূ নেওগো ঘরে,
ঘষা সিঁথে নতুন করে সিঁদুর দেওগে ভরে ॥

স্বভাবধর্মে মানুষ গতানুগতিকতায় অধিকতর আস্থাশীল এমন কি এক্ষেত্রে যুক্তির দ্বারা চালিত হতেও মানুষের আপত্তি লক্ষিত হয়। আর এ ব্যাপারে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের পার্থক্য যৎসামান্যই। দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি-নীতিকে বাদ দিয়ে সেই স্থানে নূতনকে স্বীকার করে নেওয়া অনেকের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। এমনটিই ঘটেছিল ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে তদানীন্তন ভারতসরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন মুদ্রার প্রচলনে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে ষোল আনায় টাকা এই হিসাব চলে এসেছে। কিন্তু ১৯৫৭ সাল থেকে মুদ্রার ক্ষেত্রে যখন দশমিক হিসাবকে স্বীকার করে নেওয়া হল, তখন দেশের বহু মানুষই এই নতুন হিসাব-ব্যবস্থাকে সহজ মেনে নিতে পারেন নি। বেশ কিছু লোক-সংগীতে আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে এই প্রসঙ্গে এবং অবশ্যই সেই মানসিকতা পরিবর্তিত হিসাব নীতির প্রতিকূলেই—

স্বাধীন ভারত নূতন পয়সা হবে গুণিতে।
যত আছে মূর্খলোক, তাদের হইল দুঃখ !
এইবার হাট বাজার পারিবে না করিতে ॥
ষোল আনা ছিল জানা, সেটা করিল মানা !
একশ পয়সায় একি টাকা, পারিবে কি গুণিতে
লেখাপড়া কর সবাই চিনিবে গো একেলাই।
এই ভারতে লেখাপড়া হবে এবার শিখিতে ॥
এক দু আনা ভাঙ্গিলে, টাকাই আনা যায় চলে
ঐ রাগে যাও স্কুলে বলিছে জগন্নাথে ॥

একটি গম্ভীরা গানেও নয়া পয়সার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে—

লয়্যা পয়সা উঠিয়্যা নানা বাঁধাল জঞ্জাল
একশ পয়সায় এক টাকা এ কি বা ভ্যাজাল
কিনাবেচার বেলায় গোলমাল
হামরা চাষার বেটা, এ কোণ ল্যাঠা হিসাব বুঝব
কেমন করয়্যা ॥

১৯৬৩ সালে তৎকালীন ভারত সরকার কর্তৃক স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে বাইশ ক্যারেটের সোনার পরিবর্তে চোদ্দ ক্যারেটের স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণের আদেশ জারি করা হয়। সে সময়ে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। বিশেষত এই আইন প্রবর্তনের ফলে স্বর্ণকারদের জীবিকায় টান পড়ে। বহু স্বর্ণকার এই সময় আত্মহত্যা করেন, অনেকেরই জীবিকা বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের একটি 'বয়াতী'র গানে এই স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়কে উপজীব্য করা হয়েছে—

ও আমার দ্যাশের কথা বলব কি তা শোনরে সাধু ভাই,
ও হেথায় বুদ্ধিমানের রাজত্বেতে বলার কিছু নাই।
ও ছিল সোনার অলঙ্কার, ও তায় পিতল দিয়ে দেয়,
সোনারূপো কেড়ে নিয়ে শেষে পিতলে চোখ বাঁধায়।
কত লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিল সোনার কারিগর,
নয়া আইনে কাবু হইয়া হইল দিগম্বর।
বেকার হইল কর্মকার,
ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া আর্সেনিকে দেয় চুমুক,
অধম নিবারণ কয় বিনয় করি সরকার মশাইর
চোখ খুলুক।

বিহার রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে অবস্থিত মানভুম জেলা ১৯১১ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর বঙ্গ দেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১১ সালে তৎকালীন ইংরেজ সরকার অবিভক্ত বাংলা দেশের পশ্চিমাংশ থেকে মানভুম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলা নিয়ে বিহারের সংগে যুক্ত করে দেন। স্বভাবতঃই মানভুম-জেলার অধিবাসীরা পশ্চিমবঙ্গের সংগে যুক্ত হবার ন্যায্য দাবী জানাতে থাকেন। এরই ফলে 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন' ১৯৫৬ সালে ইংরেজ আমলের বিহার রাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের মানভুম জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের সংগে যুক্ত করে দেন। মানভুম পশ্চিমবঙ্গের ষোড়শতম জেলায় পরিণত হয় এবং 'পুরুলিয়া' এই নামে পরিচিত হয়। বলা বাহুল্য, প্রতিবেশী বিহার রাজ্য থেকে মানভুমের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তি

খুব সহজে সাধিত হয় নি। এজন্যে অনেক আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে এই জেলার মানুষকে। একটি টুসু গানে মানভুমের মানুষের বাংলা ভাষাকে তাদের মাতৃভাষারূপে স্বীকারের দাবী ঘোষিত হয়েছে। অনায়াসে অনুমান করা চলে যে গানটি ১৯৫৬ সালের পূর্ববর্তীকালে রচিত, যখন মানভুম ছিল বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং মানভুমের মানুষের ওপর বলপূর্বক হিন্দী ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল—

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তাকে ?
বাংলা ভাষারে ।
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাতপুরুষের আমলে ।
এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড
এই ভাষাতেই চেক কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাতপুরুষের হক পাটা ॥
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি
ভাষার চির অধিকার,
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার ॥

ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সবই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ দেশের মানুষের সঙ্গে তাই ভোট বা নির্বাচনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একটি টুসু গানে স্থান পেয়েছে এই নির্বাচনের কথা—

আমার টুসু ভোট দিচ্ছে
ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্জিনে,
নিমির টুসু ভোট দিচ্ছে
কাঁচা কয়লার গোদামে ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জমিদারী অধিগ্রহণ বিলের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একটি গম্ভীরা গানেরও উল্লেখ করা গেল—

জমি বেচতে জোতদারের দালাল বেড়ায় ঢুঁর‍্যা,
থাকবে না আর জমি-জমা নিয়ে লিবে ক্যারা,

গাঁ হাক পাছে না দুনিয়া ঢুঁর‍্যা,
এখন গালে দিয়া হাত, প্যাটে যায় না ভাত, থ্যাকছে
বিছানায় পড়্যা ॥

স্পষ্টতঃই গানটিতে জমিদার এবং জোতদারদের প্রতিক্রিয়া চিত্রিত হয়েছে জমি হারাবার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে। শুধু জমিদারী অধিগ্রহণই নয়, ধান লেভি দেওয়ার বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে মুর্শিদাবাদের একটি হাবুগানে—

আইন এল ধান ধরা ভেবে হোল সব সারা
বড় বড় জোতদাররা হোল আধমরা
হিচাক্ দোম হিচাক্ দোম
যার ধান নাই সে গেদা গোম
ধান ধরতে বাবুরা এল জল খেতে দোব ওল তোল !

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িককালে রচিত একাধিক লোক-সংগীতে। বিশেষত গম্ভীরা গানে। গম্ভীরা গানেই রাজনৈতিক বিষয়ের উল্লেখযোগ্য প্রাচুর্য—

তোদের দলতন্ত্রই হল সার
দেশবাসী শুধু করলে হাহাকার
অষ্টমাসে অষ্টরম্ভা যুক্তফ্রন্টের উপহার।

অপর একটি গম্ভীরা গানে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী শরিক দলগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যে বিবাদে লিপ্ত হয়ে দেশবাসীর আস্থা হারিয়েছিল সেই প্রতিক্রিয়াটুকু উপস্থাপিত হয়েছে—

দলে দলে করিস বিবাদ—গদী রাখবার তরে
এই গদীর মোহ ছেড়ে মোদের দেখবি কি প্রকারে।
দুর্নীতিযুক্ত করবি শাসন দূর হবে প্রবলের শোষণ
এই আশাতেই দেশবাসী তাড়িয়েছিল সব কংগ্রেসী
আজ আটমাস পরে সত্য করে বলতো কি বা ফলিল ফল
খাদ্য সমস্যা দিনে দিনে প্রবল।

পশ্চিমবঙ্গে একসময়ের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে পি. ডি. এফ গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছিল এবং এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী আশুতোষ ঘোষ এবং ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের। শেষ-পর্যন্ত পি ডি. এফ. গভর্ণমেণ্ট অবশ্য স্থায়িত্ব লাভ করেনি, রাষ্ট্রপতির

শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের একটি পাঁচালী গানে এই সব বিষয়কেই প্রকাশ করা হয়েছে।

সামনে আসছে ইলেকসন শুনে খারাপ হল ব্রেন
দেহের ভিতর চলছে যেন সাড়ে বারটার ট্রেন
আশু ঘোষ দেখি একেবারে দিলে শেষ করে
কাঁচা কাঁঠাল কিলিয়ে দিলে ভুঁতি বার করে
যুক্তফ্রণ্ট বলে, আমাদের সুখ নাই কপালে
কষ্ট করে একা পুঁতলাম দোন বাইব বোলে
প্রফুল্ল দাদা লড়িয়ে দিলেও আমাদের গুণের ভাই।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি। সব দলেরই মুখ্য লক্ষ্য এদেশে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা, জনগণের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করা। মাদ্রাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, পরবর্তীকালে অবিভক্ত কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট কামরাজ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। একটি গানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল এবং সেই দলগুলির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কথা বর্ণিত হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে কামরাজের প্রসঙ্গও—

গণতন্ত্রী, ধনতন্ত্রী, দলতন্ত্রী
গান্ধীবাদী, সাম্যবাদী, সুবিধাবাদী শত শত
কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, স্বতন্ত্রদল
দেশসেবার কম্পিটিশন চলে,
সবাই আনবে দেশে রামরাজ
অতিশয় ব্যস্ত তাই কামরাজ।

ইদানীংকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল মানুষের রকেটের সাহায্যে চন্দ্রাভিযান। মুর্শিদাবাদের একটি সঙের গানে সেই চন্দ্রাভিযান সম্পর্কে বলা হয়েছে—

চন্দ্রলোকে যাচ্ছি আমি ভাই
ভব ছেড়ে যাচ্চ আমি নিয়ে শেষ বিদায়॥
যাব আমি রকেটে চড়ে শূন্যটিকে দেখব ঘুরে
অষ্ট গ্রহ দেখব সবে আছে কে কোথায়,
ভারতে লোক হল বেশী জায়গা থাকে তো দেখে আসি
কতকগুলো ছাটাই করে পাঠাব সেথায়।

আধুনিককালে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতির ফলে আমরা নানা ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সুবিধা ভোগের সুযোগ পাচ্ছি। এমনই একটি সুবিধা হল কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা গবাদি পশুর ক্ষেত্রে। একটি সঙের গানে এই বিষয়টিও স্থান পেয়েছে—

বলে ও দিদি কাজ হচ্ছে কলে কৌশলে
ঐ যে ইঞ্জেকসনে বাছুর হচ্ছে বিয়ে দাও তুলে ॥

কিছুকাল আগে 'শোলে' নামে খ্যাত একটি জনপ্রিয় হিন্দী ফিল্ম এসেছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে এখানকার প্রেক্ষাগৃহে চলেছিল। একটি টুসু গানে এ হেন 'শোলে' ছবিটি সম্পর্কে গ্রামবাংলার মানুষের বিশেষত স্ত্রীলোকদের প্রতিক্রিয়াটি ধরা পড়েছে :

'রূপকথা'তে এসেছে 'শোলে' দেখতে যাবো দল মেলে।
ও মেজদি ও সেজদি যাবে গো 'শোলে' দেখতে ?
কি বা মিয়া কি বা ছেলা যাচ্ছে 'শোলে' দেখতে
'শোলে' বইটা কি যে ভালো, কি যে ভালো লেগেছে।

এই ভাবে সমসাময়িক নানা ঘটনা অবলম্বনে রচিত অসংখ্য সংগীতের উল্লেখ করতে পারা যায়। মোটের ওপর লোক-সাহিত্য যে যুগের চলমানতার সঙ্গে তাল রেখে চলে, এই সত্যটিই প্রমাণিত হয় এর থেকে নিঃসন্দেহে।



টুসুগানে সমাজ চেতনা

রাঢ় বাংলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত টুসু বা তুষু বর্তমানে বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলেই পরিচিত আর এই পরিচিতির মূলে টুসু পূজা এবং টুসু গানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুর ছাড়াও অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে যাকে আমরা দায়ী করতে পারি তা হল এই গানে প্রকাশিত রচয়িতাদের সমাজ-চেতনা। এই গান একান্তভাবেই সংহত সমাজের নারী সদস্যাদের দ্বারা রচিত ও গীত হয়ে থাকে। তাই স্বভাবতঃই নারীদের সমস্যা, তাদের নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভ কিংবা ইচ্ছার বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটেছে টুসু গানে। গানগুলি মূলতঃ তাৎক্ষণিক রচনা, তাই এসব গানে আমরা যে সমাজ-চেতনার পরিচয় পাই তাতে অনেক সময়ই সমসাময়িক সমস্যার প্রতিফলন ঘটে থাকে, তাছাড়াও যে সব সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে নারী সমাজের বেদনার কারণ হয়েছে, তাদের পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে বিঘ্নিত করেছে, সেগুলি সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মুখর হয়ে উঠতে দেখা যায়।

আজকের সমাজে বহু বিবাহপ্রথা অপ্রচলিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে বহু বিবাহপ্রথা আমাদের সমাজে কায়েম থেকেছে আর এই সূত্রে সতীন-প্রথার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। টুসু গানে অন্যসব বিষয়ের তুলনায় সতীনের প্রতি যেভাবে জেহাদ ঘোষিত হয়েছে, তাতেই বোঝা যায় আমাদের সমাজের নারীরা এই প্রথাকে কতখানি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। নারী যতই সহনশীলা হোক, আর এ ব্যাপারে তাকে যতই আমরা ধরিত্রীর সঙ্গে তুলনা করি, কিন্তু পতিপ্রেমে দ্বিতীয় কোনো ভাগীদারকে সে কোনোমতেই বরদাস্ত

করিতে রাজি নয়। এই অসন্তোষই প্রমাণ করেছে নারী পতিপ্রেম আস্বাদনে কতখানি আন্তরিক। এখন প্রশ্ন হল টুসু গানে সতীনের বিরুদ্ধে জেহাদ এত ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশের কারণ কি? বিজ্ঞান বলে জড় জগতে প্রতিটি ক্রিয়ার সমান প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আমাদের মানসিকতার ক্ষেত্রেও এই সূত্র বোধকরি সমানভাবে প্রযোজ্য। পুরুষশাসিত সমাজে অবোলা রমণী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সতীনের সংগে ঘর করতে বাধ্য হলেও এ ব্যাপারে তার অনীহার অন্য কোনো প্রকাশ মাধ্যম না পেয়ে সঙ্গীতকেই তার মাধ্যম করে নিয়েছে। টুসু পূজা এক্ষেত্রে উপলক্ষ্যের কাজ করেছে মাত্র। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, অভিমান এবং অবিচারের প্রতিশোধ নিয়েছে নারী টুসু পূজা উপলক্ষ্যে রচিত গানের মধ্য দিয়ে। এইসব গানে একটা বিচিত্র মানসিকতা লক্ষ্য করার—সতীনের বিরুদ্ধে জেহাদ যতই তীব্রভাবে অভিব্যক্ত হয়ে থাকুক, যার কারণে সতীনের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে, সেই পতিদেবতাটির বিরুদ্ধে কিন্তু কোন অভিযোগ বা অনুযোগই উচ্চারিত হয়নি। একটি গানে সতীনকে কাঁদাবার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

আলতা কাপড় খেনি চালতা রঙে গাবাবো
কুলির ধারে শুকাত দিয়ে ঐ সতীনকে কাঁদাবো!

টুসুকে একটি গানে সতীনের দেওয়া পান খেতে নিষেধ করা হয়েছে :

উপর কুলে গেছলে তুসু নামো কুলে যেয়োনা
উখানেতে সতীন আছে পান দিলে পান খেয়োনা।

অপর একটি গানে এর কারণটি উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে পানের মধ্য দিয়ে ক্ষতিকারক ওষুধ সতীন খাইয়ে দিতে পারে, তাতে জীবনহানির পর্যন্ত আশঙ্কা থাকতে পারে—

নামো পাড়ায় সতীন আছে পান দিলেও খেওনা
পানের ভিতর ওষুধ আছে ফিরে আসতেও হবে না।

শুধু পানই বা কেন, তৃষ্ণার জল পর্যন্ত এই একই কারণে খেতে নিষেধ করা হয়েছে—

ও পাড়া যেওনা তুসু, ও পাড়াতে সতীন আছে
জল দিলে জল খেওনা, পান দিলে পান খেওনা।

সতীন সম্পর্কে মানসিকতা এমনই যে তার দেওয়া ধুলোর দাগ পর্যন্ত উঠতে চায়না বলে বিশ্বাস—

আমার টুস্‌ু মাটির প্‌ুতুল
ধ্‌ুলোবালিতে খেলেনা,
কোন সতীনে ধ্‌ুলো দিল গো
ধ্‌ুলোর চিহ্ন গেল না।

একটি গানে সতীনকে প্রজ্বলিত আগ্‌ুনে নিক্ষেপ করার অভিপ্রায় অভি-ব্যক্ত হয়েছে ঃ

একই গাড়ী কাঠ দ্‌ু-গাড়ী কাঠ,
কাঠে আগ্‌ুন লাগাবো,
আগ্‌ুন যখন হ্‌ুদ্‌হ্‌ুবাবে
সতীনকে টেনে দিব।

বোনাইয়ের প্রতি একটি গানে অন্‌ুরোধ করা হয়েছে যে কোনমতেই বক্তা বোনের সতীন হবেনা। এক্ষেত্রে বোনাইয়ের প্রতি আকর্ষণটা তীব্র বলে বোঝা গেলেও শ্‌ুধ্‌ু দিদিকে সতীন হিস্‌েবে পেতে হবে এই ওজ্‌ুহাতেই মেয়েটি বা শ্যালিকাটি তার বোনাইয়ের সঙ্গে পরিণয় স্‌ুত্রে আবদ্ধ হতে অসম্মত ঃ

ও বোনাই তোর পায়ে পড়ি লো
দিদির সতীন হব না।

বিদ্বেষের পরিপ্রেক্ষিতে সতীনের পরই স্থান শাশ্‌ুড়ী, ননদ এবং শ্বশ্‌ুরালয়। এ এক চিরন্তন সমস্যা। শ্বশ্‌ুরালয়ে বধ্‌ু কোনমতেই আন্তরিকভাবে গ্‌ৃহীত হয় না। শ্বাশ্‌ুড়ী-বধ্‌ু সম্পর্ক চিরকালের এক বিদ্বেষভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সঙ্গে ননদ-ভাজের সম্পর্কেরও উল্লেখ করতে হয়। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ভাঙ্গার ম্‌ুলে এই সম্পর্কের ভুমিকা খ্‌ুব অগ্রাহ্য করার নয়। সুস্পষ্ট ভাবে একটি গানে শ্বশ্‌ুরালয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবার কারণটি ব্যক্ত হয়েছে ঃ

কার ঘরে মা-বউ নাইক
কেবা খায় নাই পান,
শাশ্‌ুড়ী-ননদীর ঘরে,
নিত্য অপমান।

শাশ্‌ুড়ী কি রকম বধ্‌ুর প্রতি নির্যাতন করেন, তার উল্লেখ দেখি একটি গানে এইভাবে—

ই চালে প্‌ুঁই উ চালে প্‌ুঁই প্‌ুঁইয়ের খাব মিচুড়ি
আর যাব না শ্বশ্‌ুরবাড়ী, ধরে ঠ্‌ুকবেক শাশ্‌ুড়ী।

তাই অবাঞ্ছিত অত্যাচারী শাশুড়ীর মৃত্যু কামনা প্রকাশিত হয়েছে টুসু গানে ঃ

এ চালে পুঁই ঐ চালে পুঁই খাবো পুঁয়ের মেচুড়ী,
খেতে খেতে খবর এলো মইচে তুষুর শাশুড়ী ।।
মরুগ মরুগ আরো মরুগ চন্দন কাঠে পুড়াবো
চন্দন কাঠে পুড়ি পরে অম্বিকানন ঘর যাবো ।।

একই মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে অত্যাচারী ননদের প্রসঙ্গেও ঃ

জৈড় পাতা চাকা চাকা
বাঁশ পাতা সরু
বিঘা জুড়ে বাদাড় দিব
ননদিনী মরুক ।

পুরুষশাসিত সমাজে বর পণ নেওয়ার প্রথা প্রচলিত রয়েছে, এখনও কিন্তু তথাকথিত অন্ত্যজ সমাজে অনেক ক্ষেত্রে বরপক্ষকেই পণ দিতে হয় কন্যা পক্ষকে। মাত্র একশত টাকার বিনিময়ে বিবাহ দেওয়ার জন্য কন্যা অনুযোগ করেছে একটি গানে, অবশ্য অনুযোগের কারণ বরপণের পরিমাণের জন্য নয়, অনুযোগ পণের বিনিময়ে জনৈক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহদানের জন্য—

একশ টাকা নিলি কাকা দিলিরে বুড়া বরে ।
বুড়ার সংগে চলতে গেলে রাণীগঞ্জের শহরে ।।

সমাজে দীর্ঘকাল ধরে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা অন্যদের সম্ভ্রম এবং মান্য লাভ করে এসেছে, পেয়ে এসেছে নানা সুযোগ-সুবিধা। পরিবর্তে অব্রাহ্মণদের প্রতি তাদের রূঢ় ও নির্মম আচরণ প্রকাশ পেয়েছে নানা উপলক্ষ্যে। এই কারণেই একটি গানে পরবর্তী জীবনে ব্রাহ্মণ বংশে উদ্ভূত হবার বাসনা প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজে সুযোগ-সুবিধা লাভের সংগে ব্রাহ্মণদের নির্মম ও স্বার্থপর আচরণের প্রতিরোধ স্পৃহাও যেন প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে।

আমাদের গ্রাম বাংলার সমাজ মূলতঃ কৃষিকেন্দ্রিক। কৃষক ঘরের মেয়েদেরও নানাভাবে কৃষিকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হয়। জন্মাবধি তারা কৃষির সংগে যুক্ত ও পরিচিত। তাই নানা গানেই কৃষির প্রসংগ এসেছে। যেমন—

আমার তুসু চাষ করেছে ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু
আমার তুসু কামিন রাখবে দাঁত মোটা কোমর সরু।

এক্ষেত্রে শুধু চাষের প্রসঙ্গই উল্লিখিত হয়নি, সেইসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার 'কামিন' রাখার উল্লেখটি। গ্রামের মেয়েদেরও রুজি-রোজগারে সক্রিয় থাকতে হয়। কামিন রাখাতে সেই সত্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। অভাব তাড়িত এবং দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামবাংলার মানুষ শোচনীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসাবে পুকুর কাটা, রাস্তার সংস্কার এবং এই ধরনের কাজে সাময়িকভাবে নিযুক্ত হবার জন্য কতই না ব্যগ্র তারও পরিচয় নিহিত রয়েছে টুসু গানে—

ওরে সাহেব দেরে টাকা দামী রাস্তা বাঁধাব
তুলে দুব হাঁসা কাঁকর উপরে বালি ছড়াব।

ঘর গৃহস্থালীর কাজের সঙ্গে ধানসেদ্ধ কিংবা চিঁড়ে কোটার মতন কাজ গ্রাম-বাংলার মেয়েদের পক্ষে অবশ্য করণীয়। তারই পরিচয় জ্ঞাপক একটি গানের অংশ বিশেষ—

কাঠের ঢেঁকি ঠাটের খেলা পুকুর গেবে বোসাব।
উয়ার তুসু ডেকে এনে চিঁড়া কুটা করাব ।।

কৃষির সঙ্গে বর্ষণের গভীর সম্পর্ক। এখনও অনাবৃষ্টি শস্যহানির প্রধান কারণ। গ্রামবাংলার মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ভাল বর্ষণ সত্ত্বেও চাল মহার্ঘ থাকায় একটি গানে ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে।

জল হচ্ছে মেঘ হইতে লো
তবু হয়না সস্তা চাল।

একটি গানে গ্রামের মেয়েদের রাজনৈতিক সচেতনতার অপূর্ব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, যেখানে গ্রামের কৃষকদের স্বার্থে শহরের তথাকথিত স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতার অবাঞ্ছিত ভূমিকাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

নির্গুণবাবু কৃষক নেতা
চাষীর ল্যাগে চলিছে প্রাণ।

মদ্যপায়ী তথাকথিত বাবুর বাবুয়ানি একটি গানের বিষয় হয়ে উঠেছে অনায়াসেই—

আসছে বাবু ছড়ি হাতে মাঝখানে বাঁকা সিতা,
চাদর ঢাকা মদের বোতুল, ডান হাতে বাদাম ভাজা।

রুক্ষ চুল এবং অত্যধিক সিনেমা দেখার নেশাও পরিহসিত হয়েছে…

তেল বিনে চুল রুখু করে গো
বলে কিনা স্টাইল করা।
বাতাসেতে হাঁড়ি নড়ে গো তবু দেখা চাই সিনেমা।

সিনেমা দেখার বিরুদ্ধে এমন কথা বলা হলেও সিনেমার মালিক হবার বাসনার কথা কিন্তু একটি গানে প্রকাশিত। সিনেমা দেখার সুযোগ লাভের জন্য নয়, সিনেমার মালিক হলে পুঁজিপতি হওয়া সম্ভব হবে এই বাসনায়। দরিদ্র মানুষ যেখানে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সব অর্থাভাবে সংগ্রহ করতে পারে না, সেখানে সিনেমা হলের মালিক হতে পারলে পর্যাপ্ত অর্থের অধিকারী হওয়া সম্ভব চোখের সামনে অর্থোপার্জনের এই মাধ্যমটি তাই প্রলুব্ধ করেছে—

বীণাপানি মবে গেলে বাইশকোপটি চালাবো
বাইশকোপটি চালায় চালায় কত পয়সা কুড়াব ॥

এইভাবে টুসু গানগুলি কেবলমাত্র গ্রামবাংলার মহিলাদের আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজ সচেতনতা তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় নিপীড়িত নারী সমাজের বলিষ্ঠ প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে যা নাকি পুরুষশাসিত সমাজকে যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। প্রয়োজনে গ্রাম বাংলার নারী সমাজও যে কতখানি সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে, টুসু গান তারই এক জ্বলন্ত নিদর্শন।



প্রসঙ্গ ঃ লালনগীতি

লালনগীতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে খ্যাতির বিড়ম্বনা নিয়ে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। সকলেই খ্যাতিবান হন না, কিন্তু খ্যাতিবান ব্যক্তিকে যে নিদারুণ বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, স্রষ্টার জীবনেও এর বিড়ম্বনা কিছুমাত্র কম নয়, বরঞ্চ তুলনামূলক ভাবে বেশিই। মানুষ মাত্রেরই দুর্বলতা থাকে খ্যাতির প্রতি, তার ওপর যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে সৃষ্টি বিষয়ে বা প্রকাশের বিশেষ ক্ষেত্রে, তাঁর তো উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভের বাসনা থাকেই। সহজে সেই বাঞ্ছিত খ্যাতি যদি করায়ত্ত না হয়, তখন বিকল্প হিসেবে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি অন্যের খ্যাতির অংশীদার হবার জন্য অনেক সময়ে সচেষ্ট হন, নিজ পরিচয়কে অন্যের মধ্যে বিসর্জন দিয়ে বসেন অবলীলাক্রমে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, নতুবা বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট হবে না।

রামপ্রসাদ সেনের নামে যত শাক্তপদ চলে এসেছে, সঙ্গত কারণেই রামপ্রসাদই এ সবগুলির রচয়িতা নন বলে অনুমিত হয়। অনেক ব্যর্থ কবি যশঃপ্রার্থী হয়ে নিজেদের রচনাকে দিব্যি রামপ্রসাদের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। তাই রামপ্রসাদের রচনার সংখ্যা আজও নির্দিষ্টভাবে নিরূপিত হয় নি, কোনদিন যে হবে তেমন সম্ভাবনাও কম। বঙ্গদেশের জনপ্রিয়তম কবি হলেন রামপাঁচালী রচয়িতা কৃত্তিবাস। জনপ্রিয়তার অভিশাপ তাঁর ক্ষেত্রেও সক্রিয়। বর্তমানে আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলে যা পাঠ করি, তার কতটা সত্য-সত্যই কবি কৃত্তিবাসের আর কতটাই বা অন্যান্যদের, সে সম্পর্কে হলফ করে কিছু বলা যাবে না। ঠিক একই ঘটনা লালনের

প্রসঙ্গেও ঘটেছে। লালন সম্পর্কে পণ্ডিত ও গবেষকদের মধ্যে বিতণ্ডার আর শেষ নেই। তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন না মুসলিম, জন্মসন ঠিক কি, কিংবা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটেছিল কিনা, এ'সবের সঙ্গে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে তা হল, লালন মোট কত সংগীত রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে পণ্ডিত মণ্ডলী ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেন নি, হওয়া সম্ভব নয়। আমরা এ'ক্ষেত্রেও বেশ বুঝতে পারি, লালনের নামে যত রচনা চলে এসেছে কিংবা বর্তমানে চলছে, তার সবগুলির রচয়িতাই সম্ভবত লালন নন। তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধিতে অন্য পদকর্তারা কেউ কেউ তাঁদের রচনা দিব্যি লালনের ভণিতায় চালিয়ে দিয়ে থাকবেন। এ'দের পরিচয় হয়ত কোনদিনই জানা যাবে না আর, তথাপি সান্ত্বনা এ'টুকুই, চিরকালের মত বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অপেক্ষা লালনের ভণিতার কারণে এইসব বিস্মৃত রচয়িতাদের রচনা টিঁকে যাবে। তাই লালনগীতি সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, যে এই আলোচনা অবিমিশ্র লালন রচিত সঙ্গীত সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য, অনেকটাই তা নয়।

লালন ছিলেন বাউল। তিনি হটযোগ সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। মনের মানুষের সন্ধান করে ফিরেছিলেন তিনি। এই মনের মানুষ 'নৈরাকারময়', 'নির্গুণ'। এর অবস্থান 'অটলের ঘরে।' বাউলেরা মনের মানুষকে আখ্যা দিয়ে থাকেন, অলক্ষ্য বা অচিন বলে। লালন তাঁর অবলম্বিত ধর্মমত ও পথ অনুযায়ী ষট্‌চক্র ভেদের কথা বলেছেন, বলেছেন কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে সেই ষট্‌চক্র ভেদ করে সহস্র দলে আরোহণের কথা। বলেছেন দেহের চন্দ্র ও সূর্য অর্থাৎ ঈড়া ও পিংগলার অবস্থানের কথা। ষট্‌চক্র কখনও কখনও পীঠস্থানের সংগে উপমিত হয়েছে, দেহের মধ্যেই যেসব পীঠস্থানের সন্ধানলাভ সম্ভব—তাও বর্ণিত হয়েছে। গুরুর সহায়তা ব্যতিরেকে যেহেতু কেউ সাধনায় সার্থক হতে পারে না, তাই লালনের গানে যেমন দেহ সাধনা সংক্রান্ত নানা তথ্যাদি উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি গুরুর প্রসংগও প্রায়ই এসেছে। কবিত্ব প্রকাশের সংগে এ'সব সম্পর্ক রহিত। সত্য কথা বলতে কি, যেসব গানে এবং সেগুলির সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, এইসব দেহসাধনার কথা ব্যক্ত হয়েছে, সে'গুলি তত্ত্বজ্ঞানরহিত, নিছক সাহিত্যরস পিপাসু ব্যক্তির আস্বাদনযোগ্য নয়। আমরা তাই এ'সব তত্ত্বনির্ভর, দেহসাধনানির্ভর পদগুলিকে আলোচনার বাইরে রাখতে চাই। আমরা সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, লালন ফকির যে কারণে খ্যাতির উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করেছেন এবং উত্তরোত্তর তাঁর

খ্যাতি বর্ধমান, সেজন্য দায়ী তাঁর কবিত্বমণ্ডিত পদগুলি, যেখানে আমরা লালনকে সহজ সরল ভাবে পাই। মূলতঃ নীতি-উপদেশ দান এবং সরল কবিত্বের প্রকাশ ও অকপটভাবে সত্য প্রকাশের গুণেই তিনি বহুজনের দ্বারা আদৃত।

কথায় বলে সঙ্গগুণ—সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। লালন তাঁর একাধিক সঙ্গীতে সাধুসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। সাধু ব্যক্তির অলৌকিক চরিত্র মাহাত্ম্যের প্রভাবে বিষয়ী কিংবা আধ্যাত্মিকতা শূন্য মানুষও উপযুক্ত পথের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হবেন। সাধু ব্যক্তির প্রশংসা প্রসঙ্গে লালন বলেছেন ঃ

সাধুর গুণ যায় না বলা
শুদ্ধ চিত্ত অন্তর খোলা,
সাধুর দরশনে যায় মনের মলা,
পরশে প্রেম তরঙ্গ ॥

অতএব কবির উপদেশবাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ

যদি তরিতে বাসনা থাকে ধর রে মন সাধুর সঙ্গ ॥

লালন এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন নি—

সাধুর সঙ্গে সাধুর সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
সাধুর সঙ্গ নেওয়া মাত্র কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয় ॥

কবি নিজে আক্ষেপ করেছেন যেহেতু তাঁর নিজের তেমন করে সাধুসঙ্গ হল না—

আমার সাধুর সঙ্গ হল কৈ ?
যদি সাধুর সঙ্গ হত,
অঙ্গে অঙ্গে মিশে যেত,
সে ভাব আমার হল কৈ ?

কবির কাছে সাধু ও সৎ অভিন্ন। অর্থাৎ যিনি সাধু তিনিই সৎ, কিংবা যিনি সৎ তিনিই সাধু। তাই সাধুসঙ্গ লাভে লালায়িত ব্যক্তি সত্যের সঙ্গকেও স্বীকার করে নিতে পারেন। সাধক কবির ভাষায় ঃ

করবে সতের সঙ্গ
সাধুর সঙ্গ গুণে রং ধরিবে
পাইবে প্রাণের গোবিন্দ ॥

বাউলেরা জাত-পাতের ধার ধারেন না, লালনও ধারেন নি। আনুষ্ঠানিক বাউল হিসেবে তাঁর জাত-পাত মানার কথাও নয়। কিন্তু

জাতিভেদ প্রথা, কুল নিয়ে অহঙ্কারের তীব্র সমালোচনায় যে তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে, তার মূলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিও সম্ভবত কাজ করে থাকবে। কথিত আছে তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে লালন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। আত্মীয় পরিজন কর্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হন। এক দরিদ্র মুসলমান রমণী মৃত্যুকাতর লালনকে জল দেন, তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন, তাঁকে গৃহে এনে সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচান। হিন্দু হয়েও মুসলমান পরিবারের সেবায় তাঁর পুনর্জন্ম লাভ ঘটে। অপরদিকে তাঁর বেদনাদায়ক স্মৃতিও ছিল। লালন সুফী তত্ত্বরাজি ও শিক্ষা সমাপনাস্তে স্ব-গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর বিবাহিত স্ত্রীকে ধর্মান্তরিত হবার আহ্বান জানালে তিনি তাতে অসম্মত হন। স্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত লালন পরবর্তীকালে মুসলমান তন্তুবায় শ্রেণীর এক মহিলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই ধর্মকেন্দ্রিক যে জাতিব্যবস্থা, তা যে কত অর্থহীন, অসার— তা লালন সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। সবার উপরে যে মনুষ্যত্ববোধ, মানুষ সত্য এই বিরল উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। ঘটনাচক্রে তিনি হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠে ধ্বনিত করা সম্ভব হয়েছিল ঃ

জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে
কেউ মালা কেউ তজবি গলায়
তাইতে তো জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে।

কবি তথাকথিত জাত-পাতে বিশ্বাসী মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই॥

রামদাস মুচি, কবীর নিছক শুদ্ধ ভক্তির গুণে ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভে ধন্য হয়েছিলেন। এঁদের ছোট জাত বলে ঈশ্বর কিন্তু পরিত্যাগ করেন নি—

জাতিতে যে কবীর জোলা
ধরেছে সে ব্রজের কালা
সর্বস্ব ধন ভাই।

কবি গৌরাঙ্গের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ, আর সেই প্রশস্তির অন্যতম কারণ—

ধর্মাধর্ম বলিতে
কিছুমাত্র নাই তাতে
প্রেমের গুণো গায়
জেতের বোল রেকলে না সে তো
কল্যে একাকারিময়।

কুল নিয়ে মাতামাতি কিংবা এই সুবাদে যে কারো অহংবোধ স্ফীত হয়, অথবা কেউ হীনমন্যতার শিকার হয়, সে সম্পর্কে লালনের স্পষ্টোক্তি অনস্বীকার্য—

আজ মলি কাল দু'দিন হবে,
কুল কি কাহার সঙ্গে যাবে ?
মিছে দিন দুই ভবে এসে এ-কুলের বড়াই
কি ছার কুলের গৌর করি,
অকুলে কুল গৌরহরি,
সামনে তরঙ্গ ভারী, কিসে গো তরাই ॥

জাতি এবং ধর্ম নিয়ে সমাজে যে পারস্পরিক বিরোধ, অর্থহীন সংস্কারের বশবর্তী হয়ে মনুষ্যত্বের যে নির্মম লাঞ্ছনা, তা লালনকে তীব্র-ভাবে আঘাত করেছিল। অধ্যাত্মপথের পথিক হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপারে তিনি যে সমাজ মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সাধকের তুলনায় মানুষ লালন আরো বড় হয়ে উঠেছেন, আর এখানেই আমরা তাঁর প্রাসঙ্গিকতার পরিচয় পাই। শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন এই সাধক কবি দেখেছিলেন, জাতিহীন আদর্শ সমাজ গঠনে ছিল তাঁর অন্তরের সায়। এমন এক আদর্শ সমাজের জন্য তাঁর ছিল আর্তি—

এমন সমাজ কবে গো
সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে⋯⋯
ধর্ম-কুল-গোত্র জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগীর
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে বা দেখায়ে দেবে ॥

এইজন্যই গৌর ও নিতাইয়ের প্রতি কবির অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। কবি এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন

নানা গানে যেহেতু এঁরা কবি কল্পিত আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য সারা-জীবন প্রয়াস করে গিয়েছেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে মূর্তি বা রূপকল্পনা নিয়েই যত বিসম্বাদ, অবতারত্ব নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধ, আর নিজের ধর্মবিশ্বাসকে বড় করতে গিয়ে অন্যের ধর্মবিশ্বাসকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস—এসবও যথার্থ ভক্তের লক্ষণ নয়, এবং এই ধরণের সঙ্কীর্ণতা ঈশ্বর থেকে মানুষকে দূরেই সরিয়ে দেয়। আসল হল ভক্তি। ভক্তের ভক্তির কাছেই ধরা দেন তার আরাধ্য দেবতা। নামে কিছু আসে যায় না। এক ঈশ্বর মানুষের কল্পনা ও বিশ্বাসে বহুরূপ পরিগ্রহ করেন, নানা নামে অভিহিত হন—

একরূপ অনন্ত রূপ হয়
তুমি আমি নাম দেওয়া ঘরে ঘরে।

সুন্দর উপমা দিলেন কবি আমাদের ভেদাভেদ জ্ঞানের অসারতা বোঝাতে—

গংগায় গেলে গঙ্গা জল হয়
গর্তে গেলে কুপ জল হয়
ভেদ বিচারে।

শ্রীচৈতন্য যে ধর্মান্দোলনে সার্থক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এদেশে, তাঁর সেই সার্থকতার মূলে যেমন ছিল তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, তেমনি অনবদ্য রূপ, আর ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত হওয়া, সর্বোপরি তাঁর প্রচারিত নামতত্ত্ব। কলিতে নামেই মুক্তি। রূপের উপাসনা নয়, কেননা সেখানেই যত মতান্তর, এতে বিভেদজ্ঞান সক্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

লালন তাই বললেন—

আকার কি সাকার ভাবিব
নিরাকার কি জ্যোতি রূপ
একথা কারে শুধাইব।

অন্যত্র কবি বলেছেন—

রূপের কোথায় বাড়ী কোথায় ঠিকানা
আমি খুঁজে পাইনে কোন দেশে।

কবিও চৈতন্যের মত নামতত্ত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বলেছেন—

গুরু গো সাঁই হক নাম বল রসনা
যে নাম স্মরণে যাবে জঠর যন্ত্রণা ॥

মনুষ্যজন্মকে সার্থক করে তুলতে নামকেই আশ্রয় করতে হবে—

কবার যেন ঘুরে ফিরে।
মানুষ জনম পেয়েছি রে
এবার যেন অলস করে
সে নাম ভুল না ॥

নাম মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই নিতাইয়ের প্রসঙ্গ এসেছে, কেননা, গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত নামতত্ত্ব প্রচারে নিতাইয়ের ছিল গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। যারা নাম মাহাত্ম্যকে স্বীকার করেন না, তাদের উদ্দেশে লালনের খেদোক্তি :

হরির নাম তরণী নিয়ে,
ফিরছে নিতাই নেয়ে হয়ে,
এমন দয়াল চাঁদকে পেয়ে,
তাঁর স্মরণ কেউ নিলে না।

কপট ভক্তির বিরুদ্ধে লালনের ছিল তীব্র জেহাদ। এইসব কপট ভক্তের দল শুধু নিজেদেরই সর্বনাশ সাধন করে না, অন্যদেরও বিপথে চালিত করে। মাকাল ফল-রূপী তথাকথিত ভক্তদের প্রসঙ্গে লালনের অভিব্যক্তি—

মাকাল ফলটি দেখতে শোভা
তার ভিতরে আছে মাটি ভরা
উপরে চটক সারা
তাই লালন বলে
উপরে তিলক কাটা
কাঠের মালা নাড়াচাড়া।

অন্তঃসারশূন্য ভক্তি সম্পর্কে কবির মন্তব্য অন্যত্রও লভ্য—

তোর মনের মালা না জপিলে
তোর হাতের মালা কি করে।

আর কপট ফকিরদের সম্পর্কে কবির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এইভাবে—

মালা ফোটা তিলেক দিলে
ফকির হয় না কোন কালে।

কবি দেবতাকে উদ্দেশ করে বলেছেন তাঁর নিজের স্বার্থেই কবিকে ভবসাগর অতিক্রমণে সহায়তা দান কর্তব্য, নতুবা 'পতিত পাবন' নাম তাঁর অর্থহীন হয়ে যাবে। উদ্ধারলাভ এ'ক্ষেত্রে বড় কথা নয়, বড় কথা হল

উদ্ধার করা। কবির উদ্ধারলাভে গরজ নেই, দেবতারই নিজের স্বার্থে কবিকে উদ্ধার করার গরজ থাকা উচিত।

পাপী যদি না তরাবে
পতিত পাবন নাম কে শুনাবে ?
আমার জিবের ভাগ্যে যা হয় হবে
নামের ভেরম যাবে তোমারই
কোথায় রইলেন দয়ার কাণ্ডারী।

দেবতার করুণা লাভের আকিঞ্চন প্রকাশিত হয়েছে একটু ভিন্ন ভাবে। তুলনীয় কেদারনাথ চক্রবর্তীর একটি শাক্ত পদের অংশবিশেষ—

যদি ভক্তজনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী,
(তবে) দুঃখহরা তারা নাম কেউ লবে না তারিণী ॥

লালন কুষ্ঠিয়ার মানুষ ছিলেন, তাই কৃষি ও নদীর চিত্রকল্প তাঁর পদে সুলভ। একটি পদে তিনি ষড়রিপুর অত্যাচারের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে, নৌকার অনুষঙ্গে, কবি নিজের দেহকে নৌকার রূপকে উপস্থাপিত করেছেন—

ছয়জন বোম্বাট্যা আস্যা
মাল আসল সব নিল লুট্যা
দড়া, কাছি দিল কাট্যা
নৌকা ভাসে কেনারায়
জীর্ণ তরির ভাবনা গেল না
আমার হাইলে জল তো মানে না।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি রিপুর শিকার হয়ে মানুষ একদিকে তার মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জন দেয়, অন্যদিকে ঈশ্বর আরাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হয়। তাই সাধকেরা নানাভাবেই ষড়রিপুর অত্যাচার এবং তাদের হাত থেকে মুক্ত হবার কথা বলেছেন,মুক্ত হবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্যদের তুলনায় লালন ষড়রিপুর প্রসঙ্গটি কত সার্থকভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তা অন্যান্যদের এই সম্পর্কিত অভিব্যক্তির উল্লেখে বোঝা যায়—

(ক) তুমি কি দোষে করিলে আমার ছটা রিপুর অনুগত—রামপ্রসাদ

(খ) আকিঞ্চনের সম্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি,
ছয়জনার ছুঁয় রীতি, সম্প্রতি তোমায় মজালে—রঘুনাথ রায়

(গ) কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।

তুমি বিবেক হলুদি গায়ে মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥ —রামপ্রসাদ।

(ঘ) এক মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥ —রঘুনাথ রায়।

(ঙ) ষড়রিপু দেহ বলি, ঘুচে যাবে মনের কালি
তখন নিজগুণে মুণ্ডমালী, উদয় হবেন কৃপা করে। —পুলিনবিহারী পাল।

জগাই, মাধাই, অহল্যা প্রভৃতির উল্লেখে লালন যখন আর্জি জানান, এ'রা যদি মুক্তি পান তবে তিনি কি এমন অপরাধ করেছেন যে তাঁর মুক্তিলাভ ঘটবে না—

আমার দিন কি যাবে এই হালে
কত দুঃখী তাপী তরাইলে
আমায় কেন অবহেলে।

তখন কবির আর্তি সহজেই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। লালন তখন আর সাধক থাকেন না, আমাদেরই একান্ত আপনজনে পরিণত হন, আমাদের বক্তব্য তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে দেখে তাঁকে আপন না করে আর পারি না।



বাংলা লোক-সাহিত্যে হাস্যরস

তুলনামূলক বিচারে বাঙ্গালী হাস্যরস অপেক্ষা করুণ রসের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট—এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে অতি সচেতনতা, সাফল্য এবং কৃতিত্বের তুলনায় অসাফল্য ব্যর্থতা—নৈরাশ্যের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্বদান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের চরম অসাম্য, সর্বোপরি এতদঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ—বাঙ্গালীর করুণ রস-রসিকতার মূল বলে অভিহিত করা যায়। তাই বলে বাঙ্গালী যে সম্পূর্ণভাবে রসিকতা বিমুখ, আনন্দ-কৌতুক রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থ, এমন কথাও বলা চলে না। এ পর্যন্ত অন্ততঃ পক্ষে দুটি বৃহৎ গ্রন্থে আমাদের লিখিত সাহিত্য অবলম্বনে হাস্য-রসের ধারা ও স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। অপরাপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থেও বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের মৌখিক সাহিত্যে প্রকাশিত হাস্যরস ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ ব্যতীত অন্যত্র তেমন কোন আলোচনা হয় নি। লিখিত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও রুচির প্রভাবে প্রভাবিত। সেখানে ব্যক্তি বিশেষের মানসিকতার পরিচয় লাভটি যেমন সুলভ, সামগ্রিক-ভাবে বাঙ্গালী মানসিকতার পরিচয় লাভ তেমন সুলভ নয়। কিন্তু সেই পরিচয়টি পেতে হলে আমাদের অবশ্যই মৌখিক সাহিত্যের শরণাপন্ন হতে হয়। আমাদের প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়ায় কৌতুক রসের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার আজও অনালোচিত রয়ে গেছে বর্তমান প্রবন্ধের নাতিদীর্ঘ পরিসরে তারই কিছু পরিচয় লাভের চেষ্টা করা হবে। আর সেই আলোচনায় একটা সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে বাঙ্গালী কেবল করুণরস রসিক বিশেষণে বিশেষিত হবার যোগ্য তাই নয়, সেই সঙ্গে সে কৌতুকরস প্রিয়ও বটে।

আমরা জানি হাস্যরস সৃষ্টি করতে গেলে একদিকে যেমন প্রয়োজন হয় বিরল ক্ষমতার, অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন হয় সুগঠিত মানসিক স্বাস্থ্যের। মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল যে, তার পক্ষে রসোত্তীর্ণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস সৃষ্টি কোন মতেই সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে হাসি হ'ল সজীব মানসিকতার পরিচায়ক। বাঙ্গালীর মানসিক স্বাস্থ্য আজ না হলেও একদিন যে অটুট ছিল, তারই সাক্ষ্য বহন করে বাংলা লোক-সাহিত্যের হাস্য-রসাত্মক প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়াগুলি। আজকের দিনের তথাকথিত ভদ্ররুচির তুলনায় আমাদের লোক-সাহিত্যের হাস্যরস হয়ত কিছুটা অমার্জিত রুচির পরিচয়বাহী বলে প্রতিভাত হবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে যুগে এইসব উপাদানের সৃষ্টি, সে যুগ ছিল শুচি-বায়ুগ্রস্ততা থেকে মুক্ত। তাছাড়া হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা (প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদিতে) যে ভাষার অসংযম রূপ লক্ষ্য করি, বিস্মৃত হলে চলবেনা তা প্রকারান্তরে ভাবের প্রাবল্যকেই সূচিত করেছে। ডঃ সুশীল কুমরে দে'র ভাষায়, 'জোরালো ও রসালো ভাষার জন্ম হইতেছে জাতির অতি-জাগ্রত বাস্তব অনুভূতির স্বাভাবিক রস প্রেরণায়।...আধুনিক মাপকাঠিতে অশিষ্ট ও অমার্জিত হইলেও ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফল এবং ভাষার প্রকৃতিগত সহজ সামর্থ্যে স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ।' এইবার তাহলে বাঙ্গালীর চোখের জলের সঙ্গে মুখের হাসিটির প্রতিও কিরূপ আন্তরিক আকর্ষণ—তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। আর সে পরিচয় গ্রহণে প্রথমে প্রবাদকেই অবলম্বন করা গেল।

ক. বাংলা প্রবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এগুলি অতি মাত্রায় cynical। কিন্তু না, তাই বলে এই নির্মম এবং কঠোর ভাষণের মূলে মনুষ্য-বিদ্বেষ কাজ করে নি, বরং বলা চলে একদিকে বাস্তব পরায়ণতা অপরদিকে মনুষ্য বিদ্রূপই হ'ল এর মুখ্য অবলম্বন। তবে হ্যাঁ অতিমাত্রায় বাস্তবপরায়ণতার ফলে প্রবাদের পরিহাস ও ব্যঙ্গ ক্ষেত্রবিশেষে রূঢ় বলে প্রতিভাত হতে পারে। আসলে, 'অতিজাগ্রত বাস্তব চেতনা হইতে. প্রতি-দিনের সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার সংস্পর্শ হইতে যে তীক্ষ্ন সাংসারিক জ্ঞান, তাহাই ইহার তীব্র রসিকতায় উৎসারিত।'

শ্বশুরবাড়ী এবং জামাইকে নিয়ে অনেকগুলি প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছে। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে ঃ

শ্বশুর বাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিনদিন পরে ঝাঁটার বাড়ি ॥

অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্যে আদর-আপ্যায়ণ লাভের আদর্শ ক্ষেত্র হলেও জামাইয়ের পক্ষে শ্বশুর বাড়ীতে দীর্ঘ সময়ের জন্যে অবস্থান মোটেই উচিত

নয়, কারণ পরিণামে তাতে জামাইয়ের যে অভিজ্ঞতা হবে, তাকে কোনমতেই সুখকর বা বাঞ্ছিত বলা যাবে না। জামাই মূলতঃ ভাল-মন্দ খাবার আর আদর-আপ্যায়ণের আশাতেই শ্বশুরালয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু জামাইয়ের একদিকে খাবার লোভ, অপরদিকে থাকে প্রখর আত্ম-মর্যাদাবোধ। লোকদেখানো ভাল মানুষ সাজতে গিয়ে শ্বশুর বাড়ীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করার পরে তার অবস্থা কি হয়, তারই সুন্দর পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে একটি প্রবাদে—

যাচলে জামাই খান না পিঠে, শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে ।।

ঘরজামাই নিয়ে অসংখ্য প্রবাদ রচিত হয়েছে এবং সব ক'টি প্রবাদেই এই বিচিত্র চরিত্রের মানুষগুলিকে বেশ একহাত নিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটি প্রবাদে ঘরজামাই এবং ঘরজামাই নয় এমন যারা তাদের পার্থক্য দেখিয়ে বলা হয়েছে—

বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মেধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন, ঘরের জামাই মেধো ।।

এই প্রবাদটিতে ঘরজামাই সম্পর্কে যেটুকু শালীনতা রক্ষিত হয়েছে (যদি অবশ্য হয়ে থাকে) ঘরজামাই সম্পর্কিত অন্য দুটি প্রবাদে সেটুকুও আর রক্ষিত হয় নি। বলা হয়েছে

দূর জামাইয়ের কাঁধে ছাতি, ঘরজামাইয়ের মুখে লাথি ।।

ঘরজামাইয়ের ক্ষেত্রে লভ্য শ্বশুরবাড়ীর তথাকথিত সুখ, ব্যাজস্তুতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি প্রবাদে—

শ্বশুরবাড়ী সুখ বড়, ঘরজামাই কিলে দড় ।।

কথায় বলে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।' কিন্তু তরুণী ভার্যা লাভের ফলে বৃদ্ধের অবস্থা যে খুব ভাল হয় তা নয়, বরং বলা চলে তার অবস্থা হয় শোচনীয়। কিন্তু না, প্রবাদে এই ধরনের তরুণী ভার্যার বৃদ্ধ স্বামীদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখান হয় নি। বলা হয়েছে—

বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আধমরা হয় নয়ন বাণে, দেখতে পায় না চোখে কানে ।।

কথায় বলে 'ভাগ্যবানের বউ মরে'। বিপত্নীকরা ভাগ্যবান কিনা বলা শক্ত, তবে বিপত্নীক যদি পুনরায় দার পরিগ্রহে উৎসাহিত হন তবে ভাগ্য কদাচিৎই প্রসন্ন হয়। কেন না দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করে

তাকে থাকতে হয়। আর এর অভিজ্ঞতা যে মোটেই সুখকর হয় না তার পরিচয় আমরা পাই এই প্রবাদটিতে, যেখানে বলা হয়েছে—

দোজবরের মাগ গজরা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাথি।

একটি প্রবাদে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দোর্দণ্ড প্রতাপকে সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

দোজবরের মাগ সোঁদর বনের বাঘ।

এ গেল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সম্পর্কে, অনেকক্ষেত্রে দুঃসাহসী মানুষ আবার এর পরেও এগিয়ে যায়, অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ পক্ষ পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে তৃতীয়-চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীদের আচরণ কিরকম হয় তার পরিচয় জ্ঞাপক প্রবাদে বলা হয়েছে—

একবরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোঁসা॥
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায়॥

আমাদের পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনে নানা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়, অন্ততঃ এককালে হ'ত। আইন ও রীতি আছে যেমন, তেমনি আছে তার ফাঁক। কিন্তু সেই ফাঁক যে কতখানি হাস্যকর হতে পারে তার পরিচয় পাই ভাসুর-ভাদ্দর বউয়ের কথোপকথনমূলক একটি প্রবাদে। আগেকার দিনে ভাদ্দর বউ ভাসুরের সামনে উপস্থিত হ'ত না, উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে ভাদ্দর বউ কেমন করে পরোক্ষভাবে ভাসুরের সঙ্গে বাক্যালাপ চালাত তারই একটি নমুনা—

কাঁথখান, কাঁথখান, বটঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান।

—অর্থাৎ ভাসুর ঠাকুর পাঁকাল মাছ খান কিনা, ভাদ্দর বউ মাঝখানে একটি কাঁথাকে আড়ালে রেখে তাই জানতে চেয়েছে ভাসুর ঠাকুরের কাছ থেকে। ভাসুর ঠাকুরও প্রত্যক্ষ উক্তি এড়িয়ে বাচ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার জবাব দিয়েছেন —

খান, খান, খান, খান পাঁচ ছয় খান।
এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান॥

আমাদের পারিবারিক জীবনে শাশুড়ী-বউয়ের বিরোধ প্রায় এক নিত্য-কার ব্যাপার বলে অভিহিত করা চলে। এই বিরোধের মূলে যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে তার বিস্তারিত উল্লেখ না করে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে শাশুড়ী ও বউ পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কল্পনা করে আর

পরিণামে উভয়েই উভয়ের বিরাগভাজন হয়ে থাকে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। একটি প্রবাদে পুত্রবধূ সম্পর্কে চরম শ্লেষ অভিব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে—

বউ নয়—বোবা, বউ নয় বাবা ॥

একেই ত স্বামীরা সচরাচর বউয়ের কথাতেই চলে, তার ওপর বউ যদি সুন্দরী হয়, তাহলে ত কথাই নেই। মা-বাবা হয়ে যায় পর, ছেলে বউয়ের একান্ত অনুগত হয়ে তার কথামত চলে। সেই কারণে একটি প্রবাদে সুন্দরী বউ ঘরে না আনতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে—

ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোটো।
বিয়ে কর কালো, তাই গেরস্থের ভালো ॥

কথায় বলে 'যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা'। শাশুড়ীর কাছে যেহেতু পুত্রবধূ অপ্রিয়, তাই একাধিক প্রবাদে তার আচরণের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন একটি প্রবাদে বউয়ের খাওয়ার সমালোচনা করে বলা হয়েছে—

লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে ॥

অন্য একটি প্রবাদে বউয়ের রান্নার সমালোচনা প্রকাশিত—

শাকেই এত নাড়া, ডাল হলে ভাঙত হাঁড়ি, ভাসত পাড়া—পাড়া ॥

মা-বাবার প্রতি সন্তানের আনুগত্যহীনতার জন্যেও পুত্রবধূকেই দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

কি করবে পুতে, নিত্যি সেত কান ভাঙানীর কাছে যায় শুতে ॥

না, প্রবাদে যে শুধুমাত্র পুত্রবধূই সমালোচিত হয়েছে তা নয়, বেশ কয়েকটি প্রবাদে পুত্রকেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত করা হয়েছে। যেমন শ্বশুরবাড়ী নিয়ে ছেলের অধিক মাতামাতিতে অসন্তুষ্ট পিতামাতার বিরূপ-মানসিকতার অভিব্যক্তি ঘটেছে একটি প্রবাদে—

মা বাপ ডেও ঢাকনা, শালা শালাজ-নে' ঘরকন্না।

তবে পুত্র অথবা পুত্রবধূর বিরুদ্ধে বক্তব্য যত না বাবার, তার থেকে অনেকগুণ বেশি অনুযোগ মায়ের। মা'র বক্তব্য হ'ল তাকে সম্মান সুখ থেকে বঞ্চিত করে পুত্র নিজের স্ত্রীকে নিয়েই বেশি মত্ত। তা না হলে—

মায়ের পেটে ভাত নেই—বউয়ের গলায় চন্দ্রহার ॥

কিংবা—

বাছার কি দিব তুলনা,
মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি ।।

এই একইরূপ বক্তব্য আরও একটি প্রবাদে প্রকাশিত—

মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি ।।

কর্তব্য বিমুখ, নির্লজ্জ এবং স্ত্রৈণ পুত্রকে এইভাবে প্রবাদে আক্রমণ, করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য শেষোক্ত প্রবাদটিতে পুত্র নিজেই নিজের কুকীর্তির কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছে।

প্রবাদে যে শুধু পুত্রবধূই অভিযুক্ত হয়েছে তা নয়, শাশুড়ীর সম্পর্কে তার বিরূপ মানসিকতা বেশ কিছু প্রবাদেই প্রতিফলিত হয়েছে। আসলে পুত্রবধূ চায় স্বাধীনভাবে সংসার করতে। সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী হতে, সে কারও অধীনে থাকতে রাজি নয়। শেষপর্যন্ত তার দীর্ঘদিনের আশা বুঝিবা পূর্ণ হয়। শাশুড়ী শেষ পর্যন্ত দেহ রাখেন। বধূর মাতাও বুঝি বা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন, ভাবেন তার মেয়ে শাশুড়ী গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পেল। তাই পরম উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করেন—

একলা ঘরের গিন্নী হলি নাকি মা।

কিন্তু বধূর এতেও বিশ্বাস নেই, কি জানি তার দীর্ঘদিনের বাসনা ফলবতী যদি না হয়। তাই মায়ের প্রশ্নের উত্তরে তার সন্দিগ্ধ উত্তর—

নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নেই নড়ছে দুটো পা ।।

অপর একটি প্রবাদেও শাশুড়ীর প্রতি বউয়ের দরদের নমুনা মিলবে।—

শাশুড়ী মলো সকালে।
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে ।।

কথায় বলে 'সা নারী যা লজ্জাশীলা'। অর্থাৎ লজ্জাই নারীর ভূষণ। একটি প্রবাদে নারীর সেই লজ্জার নামে চরম নির্লজ্জতার পরিচয় মিলবে—

শুন গো শ্বশুর, শুন গো ভাসুর, বলি তোমাদের পায়।
আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায় ।।

বিবদমানা এই নারীর মূর্তিটি মানসচক্ষে কল্পনা করতেও শিউরে উঠতে হয় বোধকরি।

শুধু শাশুড়ীই নয়, শাশুড়ীর পুত্রটি মানে স্বামীদেবতাটিকেও ছেড়ে

কথা বলা হয় নি। শাশুড়ীকে উদ্দেশ করে সৃষ্ট একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার। বিইয়েছেন বাঁদর অবতার॥

যে স্বামী স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, স্বভাবতঃই তার সম্পর্কে বিরূপ মানসিকতার প্রতিফলন যে প্রবাদে ঘটবে, তা সহজেই অনুমেয়। একটি প্রবাদে যেমন প্রহারকারী স্বামীর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

দরবারে সুখ না পায়, ঘরে এসে মাগ ঠেঙ্গায়॥

বাড়ীতে যদি পান্তা ভাত থাকে সচরাচর বাড়ীর মেয়ে বিশেষত বউয়েরাই তা খায়। কিন্তু প্রবাদে এর বিপরীত চিত্র উপস্থাপিত। স্বামীকে পৌরুষের দোহাই দিয়ে পান্তা ভাত ভক্ষণে প্রলুব্ধ করে স্ত্রী নিজের শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে গরম ভাত খাওয়ার কথা বেশ উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছে—

পান্তা ভাত ভক্ষণ, এই ত পুরুষের লক্ষণ।
আমি অভাগী ভাত খাই, কোন্ দিন বা মরে যাই॥

একটি প্রবাদে নিছক বাড়ী বসে কীর্তন শোনার প্রলোভনে স্বামীর মৃত্যু কামনাও ব্যক্ত হয়েছে নিদারুণভাবে—

ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন,
তবে ঘরে বসেই কেত্তন শুনব॥

শাশুড়ী, বিশেষত স্বামী-সম্পর্কেই যদি এ ধরনের মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই, সেক্ষেত্রে ননদ সম্পর্কে বক্তব্য যে কিরূপ হবে বা হওয়া স্বাভাবিক তা সহজেই অনুমেয়। ননদকে কুমীরে ধরে নিয়ে যাওয়ার মত দুঃসংবাদও শাশুড়ীকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে বিস্মৃত হয়ে গেছে গৃহবধূ। শুধু তাই নয় ননদের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিয়ে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হওয়া দূরের কথা, উপরন্তু নির্মম রসিকতা করতেও তার বাধেনি—

ভাল কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে—নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে॥

এইবার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে সৃষ্ট প্রবাদে যে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় তার সন্ধান নেওয়া যেতে পারে।

ব্রাহ্মণ দক্ষিণা লোভী। তাই উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে মানুষ তো কোন

ছার, ঢেঁকির নামে সংকল্প করে চণ্ডী পাঠ করতেও তার নাকি কোন আপত্তি থাকে না—

বামুনে দক্ষিণা ধরে ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে ॥

ব্রাহ্মণের নামের সঙ্গে যে বিশেষণটি প্রায়শই যুক্ত হয়ে থাকে, সেটি হল তার উদর সর্বস্বতা তথা ভোজন বিলাসিতা। ব্রাহ্মণ খেতেও পারে পরিমাণে অনেক। তাই তার উদর ছিটে বেড়ার ঘরের সঙ্গে উপমিত হয়েছে—

ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর।

একটি প্রবাদে ত ফলাহারের লোভে মৃত ব্রাহ্মণেরও পুনরুজ্জীবন লাভের কথা বর্ণিত হয়েছে—

মরা বামুন গাঙ্গে ভাসে, চিঁড়ে দইয়ের নামে উঠে আসে ॥

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভট্চায্যি বামুনের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার কোন সম্পর্ক থাকে না। একটি প্রবাদে এই বিষয়টি নিয়ে বলা হয়েছে—

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের পুজোর বড় ঘটা।

শুধু ব্রাহ্মণ নয়, অন্যান্য বৃত্তিভোগীদের নিয়েও প্রবাদে ব্যঙ্গ-পরিহাস করা হয়েছে। যেমন কবিরাজের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

লাথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ ॥

কবিরাজের ঔষধের এবং তার হাতযশের পরিচয় দেওয়া হয়েছে একটি প্রবাদে এইভাবে—

আমার এমনি হাতযশ,
এ পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই, ও পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ ॥

অপর একটি প্রবাদেও কবিরাজদের বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে—

চূর্ণ, চিন্তা, চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজী ॥

শুধু কবিরাজ নয়, ডাক্তারও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায়নি—

জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই তিন নিয়ে ডাক্তারি ॥

প্রবাদে যেমন ব্রাহ্মণকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, তেমনি ব্যঙ্গ করা হয়েছে কায়স্থদেরও। কায়স্থকে কাকের মতো প্রাণীরাও ভয় পায়। এমনকি কায়স্থ মারা গেলেও তাদের ভয় ঘোচেনা, কারণ কায়স্থদের অসাধ্য কিছুই নেই—

কায়েতের মড়া কাকেও ঠোক্রায় না ॥

এই প্রবাদটিও আমাদের হাসির উদ্রেক না করে পারে না—

কায়েত মরে জলে ভাসে, কাক বলে—ফিকিরে আসে ॥

অর্থাৎ কায়স্থদের পক্ষে মৃতের ভান করে কাকদের ধরাও কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

ভক্ত যারা তারাও প্রবাদে কটাক্ষের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আপাত বৈরাগ্যের অন্তরালে চরম বিলাসিতায় নিমজ্জিত তথাকথিত কৃচ্ছ্রসাধনকারী ভক্তদের উদ্দেশে বলা হয়েছে—

যুবতীর কোল, সিঙি মাছের ঝোল, মুখে হরিবোল।

বৈষ্ণব এবং বৈরাগীদেরও ছেড়ে কথা বলা হয়নি প্রবাদে—

দুদিন হয়েছেন বৈরাগী, ভাতেরে বলেন পরসাদ ॥

কিংবা,

কাঁদে পরাণ—কাছিমের লাগে, নাম রটেছে বৈরাগী ॥

অথবা, সাধে কি বৈরাগী নাচে, ভাতের থালা হাতের কাছে ॥

অর্থাৎ বৈরাগীর নৃত্যের মূলে যত না তার ভক্তি, তদপেক্ষা প্রস্তুত আহার্যের প্রেরণাই সমধিক।

শেষ বেলা ভগবানকেও কটাক্ষ করে বলা হয়েছে—

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয় ॥

ঝগড়াটে মহিলার কথাও প্রবাদে স্থান পেয়েছে। ঝগড়া করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত বলে তাদের কিরকম কাহিল অবস্থা হয়, তার বিবরণে হাস্যরসের উদ্রেক না হয়ে পারে না—

কুঁদুলে নারী কোঁ কোঁ করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে ॥

ঝগড়া করতে উদ্যত নারীর চিত্র পাই একটি প্রবাদে—

মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে 'লড়াই' বলতে ঝগড়াকেই বোঝান হয়েছে। কুৎসিত দর্শনা মেয়েকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে একটি প্রবাদে—

কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশ বনের প্যারী।

অনুরূপভাবে একটি প্রবাদে ছেলের রূপ নিয়েও বিদ্রূপ করা হয়েছে—

বাছার আমার কিবা রূপ, ঘুঁটে ছায়ের নৈবিদ্য খেংরা কাঠির ধূপ ॥

অর্থহীন জৌলুস এবং আত্মম্ভরিতা প্রবাদের রাজ্যে বেশ ভালমত বিদ্রূপ বাণের সম্মুখীন হয়েছে দেখা যায়। যেমন—

ক. ঘরে নেই ঘটি বাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি ॥

খ. পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আলতা ॥

গ. খেতে পায়না শাক সজনা, ডাক দিয়ে বলে-ঘি আন না ॥

সমাজে এমন অনেকে আছে যাদের স্বভাব হল কেবল অপরের ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ান। অথচ এইসব ছিদ্রান্বেষণকারীরা নিজেরা কিন্তু

ত্রুটিমুক্ত নয়। এদের তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক প্রবাদে এই ভাবে—

ক. গুয়ে বলে গোবরদাদা, তোর গায়ে বড় গন্ধ।
খ: রসুন বলে পেঁয়াজ ভাই, তোর গন্ধে মরে যাই॥
গ. পেঁচা পিঁপড়েকে বলে—সর লো সর, থেবড়ামুখী॥

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং পরিহাসের হাত থেকে প্রেম-প্রীতির বাড়াবাড়ি এবং প্রেমিকের অসম্ভব কল্পনাও বাদ পড়েনি—

ক. পিরীতের নৌকা পাহাড়েও চলে।
খ. পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার॥

যোগ্যতার তুলনায় মানুষ যখন আশা করে বেশি, কিংবা উপযুক্ত সুযোগ লাভের অভাবে প্রাপ্ত সীমিত সুযোগে মনের ইচ্ছা পূরণের অসঙ্গত যে প্রয়াস, তখন তা স্বভাবতঃই নিতান্ত হাস্যকর হয়ে ওঠে। প্রবাদে এই ধরনের হাস্যাস্পদ ব্যক্তিদেরও এক হাত নেওয়া হয়েছে—

কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আঁকশি দিতে॥
কিংবা, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের মাথায় চুটকি দিতে॥
অথবা, কত সাধ যায় রে চিতে, ফোগলা দাঁতে মিশি দিতে॥

ওপরে ওপরে লজ্জা, কিন্তু আসলে চরম নির্লজ্জতার অধিকারী যারা, তাদের আচরণও কম হাস্যকর নয়। আর তাইতো এরাও প্রবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই—

খাব না খাব না আনিচ্ছে, তিন রেক চাল এক উচ্ছে॥

এইভাবে অসংখ্য প্রবাদে আমরা ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এবং নির্মল অথবা নির্মম রসিকতার পরিচয় পাই, যা বাঙ্গালীর অন্যবিধ এক মানসিকতার পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করে থাকে।

খ. ধাঁধার মধ্য দিয়ে যতই কেন পরিণত শিল্পমন অথবা রসবোধের পরিচয় পরিস্ফুট হোক, আপাতভাবে ধাঁধা যতই কেন বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম বলে প্রতিভাত হোক, তবু একথা অস্বীকার করার কোনই কারণ নেই যে মূলতঃ হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ধাঁধার সৃষ্টি। কোন কোন ক্ষেত্রে ধাঁধার আচারগত মূল্যও হয়ত আছে, তবু তা হল ধাঁধার গৌণ পরিচয়। নিছক এজন্যে ধাঁধার সৃষ্টি—একথা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। সমগ্র লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত নানাবিধ উপাদানের মধ্যে ধাঁধায় বাঙালীর রসবোধের যে গভীরতর পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনটি অন্যত্র দুর্লভ।

যে উদ্দেশ্যে ধাঁধাগুলির সৃষ্টি, তাতেই রয়েছে একপ্রকার অবিমিশ্র কৌতুকরস সৃষ্টি তথা উপভোগের মানসিকতা। যে বস্তু বা প্রাণী আমাদের অতি পরিচিত, প্রতিদিনের জীবনে যার ব্যবহার, আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় যা নাকি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, তাকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে জটিল বর্ণনার দ্বারা যখন আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন সেই অতিপরিচিত বস্তু বা প্রাণীটির সন্ধানলাভ আর সহজসাধ্য থাকেনা। শেষপর্যন্ত যখন ইচ্ছাকৃত ভাবে রচিত জটিল বর্ণনার আবরণটি ভেদ করে প্রকৃত মীমাংসাটি বেরিয়ে আসে, তখন আমরা যার পর নাই শুধু পুলকিত হইনা, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি। অবশ্যই এক্ষেত্রে স্রষ্টাকে যথার্থ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিতে হয়, আর দিতে হয় প্রকৃত মীমাংসাটিকে গোপন রেখে অন্যাবিধ বিষয়ের প্রতি শ্রোতার মনকে নিযুক্ত রাখার ব্যাপারে মুন্সীয়ানার পরিচয়। কারণ বর্ণনা যদি হয় এমন যে শ্রোতা তা শোনামাত্রই প্রকৃত মীমাংসাটির সন্ধানলাভে সমর্থ হয়, তাহলে মজা উপভোগের পরিমাণটা সেক্ষেত্রে অনেকটা হ্রাস পায়। অবশ্য এক্ষেত্রে আর একটা বক্তব্য বলে রাখা প্রয়োজন যে বর্ণনার রঙ্গীন জালটিকে অনুসরণ করে কোন সার্থক বিকল্প মীমাংসার সন্ধান শ্রোতা দিলেও তা গ্রাহ্য হয় না। পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট মীমাংসাটিরই উল্লেখ প্রয়োজন। তবে এ নিয়ে শ্রোতার সঙ্গে প্রশ্নকর্তার কখনও কোন বিরোধ বাধে না। শ্রোতা প্রশ্নকর্তার নির্দিষ্ট মীমাংসাটিকেই হাসিমুখে স্বীকার করে নেয়। যদি একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের জন্যই ধাঁধার সৃষ্টি হত তাহলে সেক্ষেত্রে কখনই শ্রোতা প্রশ্নকর্তার নির্দিষ্ট মীমাংসাটিকে সকলক্ষেত্রে মেনে নিত না। এ'ত গেল ধাঁধার মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টির একটি কারণ। অন্যাবিধ কারণও আছে। এই প্রসঙ্গে ধাঁধার মাধ্যমে যে সব বিষয় উপস্থাপিত করা হয় সেগুলির হাস্য রসাত্মক প্রকৃতির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি বেশকিছু ধাঁধায় বিশেষ বিশেষ শব্দ নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ পার্থক্য ঘটিয়েও কৌতুক রস সৃষ্টি করতে দেখা যায়। এইবার কয়েকটি ধাঁধার উল্লেখে উপরোক্ত বক্তব্যের বিশদ পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই ধাঁধার বিশেষ আঙ্গিকের পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে, যে উপস্থাপনা রীতি ধাঁধাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য করে তোলে।

একটুখানি জলে
মাছ চুড়বুড় করে
জেলের মেয়ের সাধ্য নাই
সেই মাছ ধরে।

ধাঁধাটি শুনলে শ্রোতার মনে মাছের কথাই প্রথমে জাগবে। কিন্তু এই ধাঁধাটিতে মোটেই মাছের কোন ভূমিকা নেই। আসল মীমাংসাটি হ'ল 'উনানে ভাত রান্না'। শ্রোতা যখন মাছের চিন্তায় ব্যাপৃত, ভুলেও তার মনে ভাতের কথা আসবেনা, সেই সময় যখন তাকে বলা হবে উনানে ভাত রান্নার কথা, তখন সে মীমাংসাটি উপভোগ না করে পারবেনা। মুখে তখন তার মৃদু হাসি ফুটবেই—সে হাসি কিছুটা বেকুব হবার কারণেই সম্ভবত।

আর একটি ধাঁধা, এটি জুতোকে নিয়ে—

চামড়ার দেহ তার, হাড় মাস নাই।
এদেশ ওদেশ ঘোরে তারা দুটি ভাই॥
পদানত পায়ে পায়ে লোকে যায় তেড়ে।
রাগিলে উড়ে গিয়ে পিঠে গিয়ে পড়ে॥

'ঢোল' নিয়ে রচিত একটি ধাঁধা—

কাঁধে আসে কাঁধে যায়
বিনা দোষে মার খায়।

হঠাৎ শুনলে কোন জড় পদার্থের কথা প্রথমে মনে আসবেনা, মনে আসবে কোন প্রাণীর কথা; কিন্তু যখন মীমাংসাটি 'ঢোল' বলে বলা হবে, তখন বর্ণনার সঙ্গে ঢোলের ব্যবহারগত সাদৃশ্যের সন্ধান লাভ কৌতুকরস সৃষ্টির কারণ হয়ে ওঠে।

এইবার অন্য একটি ধাঁধার উল্লেখ করা হল—

একমুখা দুইজন থাকে একদেশে।
দেখাশুনা নাই তার কোনই দিবসে॥
শয়ন করিলে তারা উঠিতে না পারে।
বাপে বেটায় তারে সমাদর করে॥

এটির মীমাংসাও সহজে শ্রোতার মনে আসবেনা যদি না পূর্ব থেকেই অবশ্য সেটি জানা থাকে। মীমাংসাটি হল 'স্তন'। মীমাংসাটি বলার পর ধাঁধার বক্তব্যকে আর শ্রোতার পক্ষে অস্বীকারের উপায় থাকে না।

'ভরা কলসী' নিয়ে রচিত একটি ধাঁধার বিবরণ হল এই রকম—

যুবতী ধরিয়া কক্ষে করে আলিঙ্গন
নিতম্বে রাখিয়া দেয় করিয়া যতন,
গুরুজন থাকিলেও চক্ষের উপরে
লাজলজ্জা পরিহরি কত শব্দ করে।

আপাতভাবে এই বিবরণে যুবতীর সম্ভোগ চিত্র শ্রোতার মনে জেগে উঠবে। আর সেই সঙ্গে সম্ভোগরতা যুবতীর নির্লজ্জ আচরণে মন কিছুটা তার ওপর বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যখন জানা যায় যে 'ভরাকলসী' প্রসঙ্গে এই বক্তব্য, তখন নিজের কল্পনা দৈন্যের জন্যে সলজ্জ হাসি পাবেই।

অনুরূপ ভাবে আর একটি ধাঁধা হল রামচন্দ্র পুত্র 'কুশ' কে নিয়ে—

হায় বাবা কি হইল
বিনা বাপে ছা হইল
ছা হইল যখন
মা ছিল না তখন।

ধাঁধাটি থেকে প্রথমে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিনা পিতায় যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তখন হয়ত বা সন্তানটির জননীর চরিত্র ভাল নয়, কিন্তু তার পরই যখন বর্ণিত হল যে সন্তান প্রসব কালে স্বয়ং জননীই ছিল অনুপস্থিত, তখন শ্রোতার এই হেঁয়ালীতে বিস্মিত হওয়া ছাড়া গতি থাকে না। তারপর সমাধানটি জানতে পেরে একদিকে যেমন তার দুশ্চিন্তার অবসান হয় আর সেইসঙ্গে মুখে ফুটে ওঠে প্রসন্ন এক হাসি। সীতা বাল্মীকির কাছে পুত্র লবকে রেখে নদীতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই লব মুনির কাছ থেকে চলে যায় জননীর কাছে। বাল্মীকি তা বুঝতে পারেন নি। তিনি ভীত হয়ে কুশ থেকে লবের অনুরূপ সন্তানের সৃষ্টি করেন। পরে সীতা লব সহ ফিরে এলে বাল্মীকির ভ্রম ধরা পড়ে। যাই-হোক সীতা কুশকে নিজের সন্তান জ্ঞানে গ্রহণ করেন। এই হল কুশের সৃষ্টি রহস্য। অতএব শুধু পিতা ব্যতীতই যে তার জন্ম হয়েছে তাই নয়, জন্মের সময় জননীও যে অনুপস্থিত ছিল এটাও একপ্রকার সত্য।

তেঁতুল সম্পর্কে একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে—

ছোট বেলায় খেলেছি দুলেছি কাপড় পরেছি
বড় হয়ে নেংটা হয়ে বাজারে গেছি।

আপাতভাবে বর্ণনা শুনে কোন বয়স্ক অথবা বয়স্কা মানুষের কথা মনে হবে যে নাকি ছেলেবেলায় কাপড় পরে লজ্জা নিবারণ করেছিল কিন্তু বয়সকালে সে কাপড় পরিত্যাগ করেই শুধু ক্ষান্ত থাকেনি, সেই অবস্থায় বাজারে পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। স্বভাবতঃই এই ধরনের নির্লজ্জ আচরণের জন্য আচরণকারী সম্পর্কে মন যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সেইসময় তেঁতুলের কথা শুনে মনটা একদিকে যেমন হতচকিত হয়ে যায়, সেইসঙ্গে শেষ পর্যন্ত বক্তব্যের বিষয় অবহিত হলে হাসির উদ্রেক হয়। কাঁচা অবস্থায় তেঁতুল

খোলার মধ্যে থাকে। একেই কাপড় পরিহিত অবস্থা বলে বলা হয়েছে। তারপর পাকলে পরে তেঁতুলের খোলা ছাড়িয়ে তা বাজারে বিক্রয় করতে নিয়ে যাওয়া হয়। একেই বলা হয়েছে উলঙ্গ অবস্থা বলে।

উপস্থাপনার গুণে ধাঁধা কিরকম চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে, তার আর একটি উদাহরণ—

হাসতে হাসতে বস্‌লো নারী পরপুরুষের কাছে।
হস্তাহস্তি কস্তাকস্তি ভিতর যাবার আগে।
ভিতর গিযে শীতল হল।
যে ভাবটি মনে করেন, সে ভাবটি নন॥

এটি শুনেই সর্বাগ্রে মনে জাগবে স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমের কথা। কিন্তু ধাঁধাটির শেষ পংক্তিতে যা বলে দেওয়া হয়েছে, তাই সত্য। অর্থাৎ মোটেই এখানে সঙ্গমের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে নারীর শাঁখা পরার কথা। সঙ্গমের চিত্র যে ভোজবাজির মতন নারীর শাঁখা পরার চিত্রে রূপান্তরিত হতে পারে, তা ধাঁধা ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ।

এইবার ধাঁধার কৌতুককর বিষয়ের কয়েকটি নিদর্শন উল্লিখিত হ'ল। একটি ধাঁধা হ'ল এইরকম—

নাকুবাবুর কন্যাটি হাতুবাবু নিলে।
এমন সুন্দর কন্যাটি পথে ফেলে দিলে॥

আপাতভাবে মনে হবে যে নাকুবাবু নামীয় কোন ব্যক্তির কন্যাটিকে হাতুবাবু নামীয় এক নির্দয় প্রকৃতির ব্যক্তি গ্রহণ করে শেষপর্যন্ত কন্যাটিকে পথে ফেলে দিয়ে নিজের হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে। যখন হাতুবাবুর এই অমানবিক আচরণের জন্যে তার ওপর শ্রোতার ক্রোধ জন্মাবে, তখন আসল মীমাংসাটি যদি বলা হয় 'সিকনি', স্বভাবতঃই এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্কহীনতায় শ্রোতা না হেসে পারবে না।

কিংবা অপর একটি ধাঁধা হল—

বিনা ঝড়ে খেঁজুর পড়ে।

এই ধাঁধাটি শুনলে মনে হবে যে সত্য-সত্যই ঝড় ব্যতিরেকে বুঝিবা খেঁজুর গাছ থেকে পাকা খেঁজুর পড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তারপরই যখন সমাধানটি বলা হবে 'ছাগলের নাদি', তখন শ্রোতার পক্ষে আর কি গাম্ভীর্য রক্ষা সম্ভবপর? এইবার একই শব্দকে ধাঁধায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে

প্রয়োগ করে কেমন কৌতুকরস সৃষ্টি করা হয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল। যেমন—

'উড়ে যা মাটিতে পা',
কিংবা, এক বেটা উড়ে যায়
তার মধ্যখানে নাই।

এখানে 'উড়ে' শব্দটিতে আপাতঅর্থে উড়ে যাওয়াকে বোঝান হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আর এটি ক্রিয়াপদ থাকেনি, হয়ে গেছে বিশেষ্য। তখন অর্থ দাঁড়িয়েছে 'উড়িয়া' নামক বিশেষ এক জাতিকে। 'নাই' শব্দটি আপাতভাবে অনুপস্থিত অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু প্রকৃত অর্থে হল 'নাভি'।

শুনো শুনো ঠাকুরপো হে শুনো মোর কথা
এর উত্তর থেনো ভাঙ্গিলে
খাও মোর মাথা।
জলেতে দিতেছি জাল সারা দিন ধরে,
এখনো উঠলো না জল কপালের ফেরে।

এখানে চতুর্থ পংক্তিটিতে ব্যবহৃত 'জ্বালা' শব্দটি আপাতভাবে 'ফোটানো' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হবে। কিন্তু আসলে শব্দটি মাছ ধরার জাল অর্থে প্রযুক্ত। আর এই অর্থেই সমগ্র ধাঁধাটি রচিত।

সবশেষে আর এক শ্রেণীর ধাঁধার উল্লেখ করতে হয়, এগুলিকে বলা হয়েছে আক্রমণাত্মক ধাঁধা। এই শ্রেণীর ধাঁধাতে প্রশ্নকর্তা শ্রোতাকে কিছুটা আক্রমণ করে থাকেন, অবশ্যই সে আক্রমণ কথার মাধ্যমে। এই শ্রেণীর ধাঁধায় শ্রোতাকে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ জানান হয়, কখন কখন প্রলোভনও দেখান হয়ে থাকে। তবে সে সবই কথার কথা মাত্র। চ্যালেঞ্জ রাখা হলেও যা না হলেও তা। আসলে এই চ্যালেঞ্জে কোন বিদ্বেষের ভাব থাকে না। তাই কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয় না। নিছক নির্মল পরিহাসপ্রিয়তাই এইসব চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট। এই রকম একটি ধাঁধা হল—

রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা,
এক কথায় যে বলতে পারে
সে মজুমদারের বেটা।

এখানে ঠিকমতো জবাব দিতে পারলে উত্তরদাতা 'মজুমদারের বেটা' হবার মতন 'দুর্লভ' সম্মানের অধিকারী হবে বলে প্রলোভন দেখান হয়েছে। বলাবাহুল্য জবাব না দিতে পারলে যদি উত্তরদাতা 'মজুমদারের

বেটা' হবার সম্মান লাভ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলেও যে খুব ক্ষতি হয় তা নয়। যাইহোক এক্ষেত্রে সমাধানটি হ'ল 'কুঁচ'।

অনুরূপ আর একটি ধাঁধা—

কাঁচায় তুলতুল পাকায় সিন্দুর
যে না বলতে পারে সে বুড়া ইন্দুর।

এখানে সমাধানটি হ'ল 'হাঁড়ি'। ধাঁধাটির ঠিকমত যদি উত্তর দিতে না পারে, তবে শ্রোতাকে বুড়ো ইঁদুর বলে পরিগণিত হতে হবে বলে ভয় দেখান হয়েছে।

লালবরণ—ছয় চরণ—পেট কাটিলে হাঁটে।
মূর্খে কি ভাঙ্গাইবা পণ্ডিতেরই ফাটে। (আসপিঁপড়া)

বক্তব্য হল—এই ধাঁধাটি সমাধান করতে যখন পণ্ডিত ব্যক্তিদেরই হিমসিম খেতে হয়, তখন সামান্য মূর্খ ব্যক্তির পক্ষে তার সমাধান করা এককথায় অসম্ভব। আসলে উত্তরদাতাকে উত্তেজিত করতেই এই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে, তবে এ উত্তেজনায় কোন জ্বালা নেই, নেই কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ। আর তাই শ্রোতাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জকে বেশ হাসিমুখেই স্বীকার করে নিতে পারে।

বেশ কয়েকটি ধাঁধায় শ্রোতা যদি ঠিকমত সেগুলির মীমাংসার সন্ধান না দিতে পারে তাহলে তার পিতৃদেবকে নিয়েও টানাটানি করা হয়েছে। যেমন

ক. আগা ঝন ঝন গোড়া মুঠে
যে না বলতে পারে তার বাবার নাম মুটে। (ঝাঁটা)

খ আগে ঝুন ঝুন গোড়া মোটা,
যে না বলতে পারে তার বাবা মোটা। (ঐ)

গ. উঠে পড়ে ঢোঁড়া সাপ
যে না কহে তার নেড়া বাপ। (ঢেঁকি)

একটি ধাঁধায় আবার প্রলোভনও দেখান হয়েছে এইভাবে—

মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা, পক্ষীর নাই ডিম!
এই যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাকা দিমু॥
(কাঁকড়া, সিজ, বাদুড়)

গ. পণ্ডিতেরা হাস্যরসকে pun, satire, wit, humour ইত্যাদি নানা পর্যায়ে ভাগ করে থাকেন। আমরা মোটামুটি ভাবে হাসিকে দু'টি ভাগে

ভাগ করতে পারি—মুখের হাসি এবং মনের হাসি। মুখের বলতে বোঝায় উচ্ছ্বসিত হাসি, যে হাসিতে মুখাবয়বে বিকৃতি ঘটে। যে হাসি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই হাসি হয় সশব্দ। কিন্তু মনের হাসি হল তাই, যা নাকি মুখাবয়বে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। এই হাসিকে আমরা নীরব হাসিও বলতে পারি। মোটামুটিভাবে বাংলা লোক-সাহিত্যের হাস্যরস এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। আবার লোক-সাহিত্যের অপরাপর উপাদানের তুলনায় ছড়ায় যে হাস্যরসের সন্ধান আমরা পাই, তা এই মনের হাসির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মনের হাসিতে যে এক প্রকার স্নিগ্ধতা আছে, সেই স্নিগ্ধতা বোধ করি মুখের হাসিতে অনুপস্থিত।

প্রবাদ কিংবা ধাঁধায় বাস্তবেরই একাধিপত্য। সেখানে কল্পনা কখনই লাগাম ছাড়া হতে পারে না। কিংবা বলা চলে কল্পনা বাস্তবের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। তাই প্রবাদ কিংবা ধাঁধার বক্তব্য হল যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু ছড়ায় অবাধ কল্পনার রাজত্ব। ছিটেফোঁটা যেটুকু বাস্তবতার সন্ধান এখানে মেলে, তাও কল্পনারই অনুষঙ্গ। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

একটি দোলনার ছড়া হল—

দোল দোল দোলে
খোকন মণি কোলে।
ফুল গাছটির তলে॥
মামী কাটে সরু সুতো,
মামা কাটে পাত।
সত্যি করে বলনা মামী,
মামা কি তোর বাপ॥

এখানে ফুলগাছের তলায় খোকনমণির দোলনায় দোলার যে বিবরণ পাই, তাকে কোনমতেই অবাস্তব বলা চলে না। এমনকি মামীর সরু সুতো কাটা কিংবা মামার পাতা কাটার মধ্যেও কোনপ্রকার অস্বাভাবিকতার সন্ধান মেলে না। তবে হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সত্য সত্যই খোকনমণিকে গাছ তলায় দোলনা দিতে গিয়েই যে এইসব ছড়া রচিত কিংবা অনুরূপ পরিবেশ ছাড়া এই ছড়া অব্যবহৃত থেকে যায়, এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ঘরের দালানে কিংবা অন্যত্রও দোলনা খাটিয়ে এই একই ছড়া আবৃত্তি করা যেতে পারে বা করা হয়েও থাকে। আসলে পরিবেশটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল ছড়ার ছন্দটি, যা নাকি শিশুকে শীঘ্র

নিদ্রার জগতে নিয়ে যায়। সেদিক দিয়ে ছড়ার বিবরণ বাস্তব হয়েও অবাস্তব। সে যাই হোক, এইবার ছড়াটির শেষ দুটি চরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। এখানে খোকনের কণ্ঠে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে মামা মামীর বাবা কিনা। খোকনের প্রশ্নে আন্তরিকতা আছে, আর আছে সত্য সন্ধানের অনুসন্ধিৎসা। কিন্তু খোকনের বকলমে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তা কি আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে না? আমাদের সামাজিক জীবনে এ রকম অসতর্ক প্রশ্নের সঙ্গে পরিচয় লাভ কদাচিৎই ঘটে বলা চলে। ছড়ার জগতে কিন্তু এই ধরনের অসতর্ক কিংবা অ-সামাজিক প্রশ্ন ক্ষোভের পরিবর্তে অনাবিল হাসিরই উদ্রেক করে। আর এই কারণেই ছড়া হয়ে ওঠে উপভোগ্য। আসলে শিশুদের সর্বাপেক্ষা আপন জন হ'ল মা এবং বাবা। তাই স্বভাবতঃই সব সামাজিক সম্পর্কেই তারা মা-বাবার সম্পর্কের নিরিখে দেখতেই অভ্যস্ত। সামাজিক সম্পর্কের পার্থক্য তাদের বোধের অগম্য। ছড়ায় অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসে না।

অনুরূপ বক্তব্য সমন্বিত আরো একাধিক ছড়ার পরিচয় আমরা পাই। যেমন—

খোকাবাবু চৌধুরী
গাঁ পেয়েছে আগুড়ি।
মাছ পেয়েছে পবা,
আমার খোকামণির বউ ডাকছে,
ভাত খাওসে বাবা।

এই ছড়াটির শেষ দুটি চরণে দেখা যাচ্ছে খোকামণিকে তার বউ 'বাবা' বলে সম্বোধন করেছে। বাস্তব জগতে স্বামীকে তার স্ত্রী পিতৃসম্বোধন করেছে এ কল্পনার অতীত ব্যাপার। কিন্তু ছড়ায় খোকামণির বউ অবলীলাক্রমে তার শিশু স্বামীকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করেছে। আর বড় কথা হ'ল এই অস্বাভাবিক সম্বোধনে আমরা মোটেই অপ্রস্তুত হই না, ছড়ার রাজ্যে এইটাই যেন স্বাভাবিক। তবে একথাও স্বীকার্য যে এই সম্বোধনের গুণেই যেন ছড়াটি অধিকতর উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহেও প্রায় এই রকমই একটি ছড়ার সন্ধান আমরা পাই। তবে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়ার বৈশিষ্ট্যটি হল এখানে শ্রোতাকে আগেভাগেই খোকনের বউটির প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত করে দেওয়া হয়েছে।

ছড়াটি হ'ল—

খোকন মোহন চৌধুরী
বউটি হবে সুন্দরী।
একটু ন্যাকা হাবা,
রেঁধে বেড়ে ডাকবে খোকায়
ভাত খাওসে বাবা।

এ পর্যন্ত গেল দোলনা এবং ভোজন সংক্রান্ত ছড়ার সামান্য পরিচয়। এইবার ঘুম পাড়ানি কয়েকটি ছড়ায় হাস্য রসের সন্ধান করা যেতে পারে। এই ছড়াগুলিতেও বক্তব্যের চরম অসংগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু ছড়ার ধর্ম অনুযায়ী এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে ছড়ার মাধ্যমে সুরজাল সৃষ্টিই স্রষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য, বক্তব্য হল গৌণ ব্যাপার। একটি ঘুম পাড়ানি ছড়ায় বলা হয়েছে—

আয় ঘুম আয় ঘুম কলা বাগান দিয়ে,
হেঁড়ে পানা মেঘ করেছে।
লখার মা নথ পরেছে কপাল ফুটো করে ॥
আমানি খেতে দাঁত ভেঙ্গেছে সিঁদুর পরবে কিসে ॥

এখামে ঘুমকে সজীব বলে কল্পনা করায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে। অবশ্য এই কারণে ছড়াটিকে বর্তমান আলোচনায় উল্লেখ করা হয় নি, উল্লেখ করা হয়েছে শেষের চরণ দু'টির জন্যে। বলা হয়েছে লখার মা নথ পরেছে —অবশ্য তাতেও কারো কিছু যায় আসে না। কিন্তু তখনই শ্রোতার মনে চাঞ্চল্যের শিহরণ জাগে, যখন সে শোনে এই নথ পরতে লখার মাকে কপাল ফুটো করতে হয়েছে। বাস্তবে কারো মাকে মহামূল্যবান নথ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কি তিনি তাঁর কপাল ফুটো করতে সম্মত হবেন? তার থেকেও বড় কথা হল কপাল ফুটো করার সংগে নথ পরার কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু ছড়ার রাজ্যের মজাই এমনি যে নথ পরতে নাক বা কান নয় একেবারে কপাল ফুটো করতে হয়। তর্কের খাতিরে তাও নয় ধরে নেওয়া গেল নথ পরার সঙ্গে কপাল ফুটোর সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমানি খেতে লখার মার দাঁত ভাঙ্গে কি করে? আর যদিই বা দাঁত ভাঙ্গল ত তার ফলে সিঁদুর পরা আটকাবে কেন? অবশ্য দাঁত ভাঙ্গার সঙ্গে সিঁদুর পরার কোন সম্পর্ক না থাকলেও নথ পরার কারণে যেহেতু তাকে কপাল ফুটো করতে হয়েছিল, সেই কারণেই সিঁদুর পরার সুযোগ লাভ সম্ভবত অন্তর্হিত।

অন্য একটি ঘুমপাড়ানি ছড়ায় আবার ভালুকের তেঁতুল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। শুধু তেতুঁল বড় টক, তাই এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় নুনের। বেচারী ভালুককে তাই নুনেরও সংস্থান করে নিতে হয়েছে এইভাবে—

আয় ঘুমানি আয়,
ভালুকে তেঁতুল খায়।
নদীর বালি ঝুর ঝুরানি,
নুন ব'লে ব'লে খায়।

অপর একটি ছড়াতে ভালুকের স্থান দখল করে নিয়েছে সুপরিচিত বাঁদর—

আয়রে আয়রে আয়,
বাঁদরেরা দোল খায়।
তারা নুন কোথা পায়?
অনুনে রাঁধে;
ফিক্‌রে কাঁদে।
সাত রাজার নুন মেখে খায়,
সাত রাজার নুন পেয়েও
গঙ্গাচরের বালিগুলো
নুন বলে বলে খায়।
আয়রে খোকন ঘুমায়॥

ভালুকের তেঁতুল খেতে না হয় নুনের দরকার হয়েছিল, কিন্তু বাঁদরের দোল খেতে নুনের দরকার পড়ে কোন যুক্তিতে? তাড়াতাড়ি ছড়ার স্রষ্টা বুঝিবা সেটা বুঝতে পেরে আমাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিলেন। বলা হ'ল নুন বিহীন অবস্থায় বাঁদরেরা রাঁধে আর তার জন্যে কাঁদে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা এক আধটি নয়, একেবারে সাত-সাতটি রাজার নুন সংগ্রহ করে নেয়। মজার ব্যাপার হ'ল এর পরেও কিন্তু তাদের নুনের প্রয়োজন মেটে না, শেষে গঙ্গাচরের বালি, যেগুলির সংগে নুনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য, তাই খেতে শুরু করে দেয়। নুনের যে এত প্রয়োজন, বিশেষত তা যে এতখানি উপাদেয় হতে পারে, ছড়ার জগতেই তার প্রথম সন্ধান পাওয়া গেল।

পানের প্রতি শিশুর ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক, কারণ পানে ঠোঁট রাংগা হয়। লাল রঙের প্রতি শিশুর আকর্ষণ সর্বাধিক। একটি ছড়ায় এ হেন

পান শিশু খাবে বলে বলা হয়েছে কিন্তু সেইসঙ্গে শিশুটির পান খাবার কারণের সঙ্গে যুক্ত যে আচরণটির কথা বর্ণিত হয়েছে, তা বড়ই মর্মান্তিক—

টিয়ারে টিয়া
বাবু যে মোর পান খাবে
তার শাশুড়ীকে বাঁধা দিয়া ॥

অভাবের তাড়নায় কিংবা স্বভাবের দোষে নিজের বউকে বাঁধা দেওয়ার পেছনেও হয়ত যুক্তি থাকে (!), কিন্তু শাশুড়ীকে বাঁধা দেওয়ার ব্যাপারটি এক কথায় অকল্পনীয়। প্রথমত স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার থাকলেও শাশুড়ীর প্রতি সেই অধিকার কোন মতেই স্বীকৃত নয়, তদুপরি আবার সামান্য একটি পান খাওয়ার জন্যে শাশুড়ীকে বাঁধা দেওয়া। কিন্তু ছড়ায় তাও সম্ভব।

শিশু বড়দের দেখে স্কুলে যেতে চাইলেও পরে স্কুল ব্যাপারটির সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হবার পর অধিকাংশ শিশুরই স্কুল সম্পর্কে একটা এলার্জি গড়ে উঠতে দেখা যায়। স্কুলের পরাধীনতায় শিশুর স্বাধীন চিত্ত হাঁফিয়ে ওঠে। তাই স্কুল বন্ধের সংবাদ স্বাভাবিক কারণেই শিশুর কাছে পরম বাঞ্ছিত এক ঘটনা। একটি ছড়ায় সেই বাঞ্ছিত ঘটনাটিকে কিভাবে ঘটান হয়েছে তার পরিচয় বিবৃত হয়েছে—

মাস্টার মহাশয় নমস্কার
আপনি বড় পরিষ্কার।
গোলাপ ফুলের গন্ধ
হাইস্কুল বন্ধ।

স্কুল বন্ধ করতে গেলে মাস্টার মশাইকে হাত করা চাই। তাই প্রথমেই তাঁকে খোশামোদ করার জন্যে 'বড় পরিষ্কার' বলে তাঁর মন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত মাস্টারমশাইয়ের মন যে গলেছে তার প্রমাণও মিলেছে হাইস্কুল বন্ধ হওয়ার ঘটনায়। কেননা নিছক গোলাপ ফুলের গন্ধের সঙ্গে হাইস্কুল বন্ধের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক মেলে না। নতুবা রোজই স্কুল বন্ধ রাখতে হয়। একটি নৃত্য সম্পর্কিত ছড়ায় এক জোলার সমগ্র পরিবারটির নৃত্যরত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যদিও নৃত্যরত হওয়ার কারণটি অকথিত রয়ে গেছে। অবশ্য বাস্তব জগতে যেমন সব কিছু কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত, ছড়ার জগতে সেই সূত্র অনুসৃত হয় না। এখানে কারণ ব্যতিরেকেই কার্য হয়ে যায়—

জোলা নাচে জুলনী নাচে নাচে জোলার নাল,
সব চরকি উইঠ্যা বলে আমরা নাচব কাল।

জোলা এবং জুলনী কোন কারণে কিংবা অকারণে নৃত্যরত হতে পারে, সেজন্যে আমাদের চিন্তার কিছু থাকে না, কিন্তু তারপরই যখন বলা হয় সেই সঙ্গে জোলার নালটিও তাদের সঙ্গে নৃত্যরত, তখন সেই চিত্রটি কল্পনা করলে আর কি গাম্ভীর্য রক্ষা করা সম্ভব হয়? আবার এখানেই শেষ নয়, চরকিগুলি দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করে তারা পরদিন নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে, হয়ত বা আনন্দের রেশটা যাতে একদিনেই শেষ না হয়ে যায় সেই কারণে।

আর একটি মজার ছড়ার উল্লেখ করা গেল -

বুড়া আমায় মারিছে,
ভাঙ্গা আঙ্গুলে আমার ভাঙ্গিছে।
ভাঙ্গুলে আমার আংটি পরাইছে॥
তোমরা হাস্য না গ বাপুরা,
বুড়া আমায় মারিছে।

বৃদ্ধ কর্তৃক বৃদ্ধার প্রহৃত হওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে এক মর্মান্তিক ঘটনা। বিশেষত বৃদ্ধের প্রহারে বৃদ্ধার আঙ্গুল ভাঙ্গার ঘটনাটি। কিন্তু পরক্ষণেই যখন বলা হয় বৃদ্ধ অনুতপ্ত হয়ে বৃদ্ধার ভাঙ্গা আঙ্গুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তখন এই ঘটনায় হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বুড়ী নিজেও এই হাস্যকর আচরণটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তাই তার বিনীত অনুরোধ ঘোষিত হয়েছে চতুর্থ চরণটিতে।

বুড়ী-বুড়োর আচরণ সম্বলিত আর একটি উপভোগ্য ছড়া—

শাকে ভাতে রান্ধে,
কলাগাছে টাঙ্গে।
কলা হইল বাড়ি,
বুড়ীর মাথাত ছাতি।
কলা হইল লাল,
বুড়ী ফুলায় গাল।

ছাতি নিল উড়াইয়া,
বুড়ী কান্দে দৌড়াইয়া।
কলা খায় বান্দরে,
বুড়ী মারে বুড়ারে।
ও বুড়ী কান্দ্য না,
বুড়ীরে আর মাইর না।
ঘরে আছে জামাই,
তারে দিয়া আনাই।
ঘরের পিছে হাইট্যা ধান,
কেচর কেচর কাট্যা আন।

আগের ছড়াটিতে যেমন বৃদ্ধ কর্তৃক বৃদ্ধার প্রহৃত হওয়ার ঘটনা স্থান পেয়েছে, এই ছড়াটিতে আবার দেখা যায় বৃদ্ধা কর্তৃক বৃদ্ধ প্রহৃত হয়েছে। আর এই প্রহৃত হওয়ায় কারণ হল বাঁদরের কলা খাওয়া। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল বৃদ্ধা কর্তৃক বৃদ্ধ প্রহৃত হওয়ার পর বৃদ্ধা নিজেই ক্রন্দনরত। হয়েছে। পূর্বের ছড়াটিতে বৃদ্ধ মারধোর করে বৃদ্ধার আঙ্গুল ভেঙ্গে শেষে যেমন সেই ভাংগা আংগুলে আংটি পরিয়ে তার আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, এখানে দেখি বৃদ্ধা চোখের জলের মধ্য দিয়ে তার অনুশোচনা প্রকাশ করেছে। এ পর্যন্তও না হয় মানা গেল, কিন্তু অস্বাভাবিকতা অপেক্ষা করে আছে এর পরেই যখন বৃদ্ধাকে আর না মারার জন্যে অনুরোধ উচ্চারিত হয়েছে। অথচ প্রহারকারিণী নিজে কখন যে প্রহৃত হল তার উল্লেখ অনুপস্থিত অর্থাৎ ছড়ায় যে মারে, সেই কাঁদে, আবার তাকেই শেষে সান্ত্বনা দিতে হয় আর প্রহার করা হবে না বলে।

বিবাহের দিনে বরই হ'ল প্রধান আকর্ষণীয় পুরুষ। বরের সাজ-সজ্জার আকর্ষণও নেহাৎ কম নয়। তাই কথায় বলে 'বরের সাজ'। কিন্তু একটি ছড়ায় বরের সাজের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তেমনটি কোন কালে কোন বরের পক্ষে সাজা অসম্ভব। ছড়ার বর কিন্তু এই অদ্বিতীয় সাজে সজ্জিত হয়েছে অনায়াসেই—

আশালতা পালংপাতা
আজকে আশার বিয়ে,
হাওড়া থেকে বর এসেছে
গামলা মাথায় দিয়ে।

এর পর বরের রূপ বর্ণিত হয়েছে যে ভাবে, তাও এককথায় অননুকরণীয় বলা চলে—

বর দেখনা, বর দেখনা
রান্নি শালের ঝুল
কন্যা দেখনা, কন্যা দেখনা
কনক চাঁপার ফুল।

বর কুৎসিত দর্শন বলে না হয় তাকে দেখতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু কনক চাঁপার মতন দেখতে যে কনেকে, তাকেও দেখতে যে কেন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলে না। অবশ্য মেলে না বলেই এটি ছড়া হয়েছে, মিললে আর তা ছড়া থাকত না।

প্রথম মুদ্রিত বাংলা ছড়াটি হাস্য রসের খনি বিশেষ। উইলিয়াম কেরী সংকলিত এই ছড়াটি হল—'মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা'। এক কৃষক চব্বিশটি মৎস্য ধরে এনে গৃহিণীকে দিল রান্নার জন্য। খাবার সময় কৃষক পেল মাত্র একটি মাছ। স্বভাবতঃই কৃষক জানতে চাইল বাকি মাছগুলি সম্পর্কে। তখন চতুরা গৃহিণী যে হিসাব দাখিল করেছিল তা নিয়েই ছড়াটি রচিত—

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিলে দুগণ্ডা
বাকী রহিল ষোল
তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল
তবে থাকিল আট
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট
তবে থাকিল ছয়
প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়
তবে থাকিল দুই
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই
তবে থাকিল এক
ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ
এখন হইস যদি মানুষের পো
তবে কাটাখান খাইয়া মাছখান থো
আমি যেই মেয়ে তেই হিসাব দিলাম কয়ে

আসলে কৃষক পত্নী তেইশটি মাছই নিজে ভক্ষণ করেছিল, তবু তার আশ মেটেনি, তাই শেষ মাছটি ভক্ষণেরও অনবদ্য কৌশল রচনা করেছিল। কৃষক যে 'মানুষের পো' হবার বাসনায় কাঁটা খান খেয়ে গিন্নীর জন্য মাছ খানা রেখে দেবে, তা সহজেই অনুনেয়।

আমাদের গীতিকাগুলিতেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে না হলেও মোটামুটি ভাবে হাস্যরসের সন্ধান মেলে। 'মহুয়া'-তে এক সন্ন্যাসী উল্লিখিত হয়েছে, তার মাথায় জটা, মুখে লম্বা দাড়ি। মহুয়ার করুণ আবেদনে সাড়া দিয়ে সন্নাসী মৃত প্রায় নদ্যার চাঁদকে বনজ ভেষজের সাহায্যে সে বাঁচিয়েছে কিন্তু এ হেন সন্ন্যাসীকে দেখা গেছে মহুয়ার যৌবনে আকৃষ্ট হতে। এক পূর্ণিমার রাত্রে শনিবার দিন মহুয়াকে সংগে নিয়ে ঔষধ সংগ্রহের অছিলায় বের হয়ে নদীর কিনারে নির্জন পথে উপনীত হয়ে কন্যা সমা মহুয়াকে বলেছে—

কন্যা তুমি আমার কথা শুন দিয়া মন।
পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যইবন ॥
তোমার রূপেতে আরে কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যুগ।
এমন ফুলের মধু করাও মোরে ভোগ ॥

বুভুক্ষ হৃদয় সন্ন্যাসীর এ হেন আচরণ হাস্যরসের উদ্রেক করে।

'কমলা' পালা'য় উপস্থাপিত চিকন গয়লানীর রূপ বর্ণনা, কমলার হাতে তার উপযুক্ত শাস্তি লাভের বিবরণ ইত্যাদিও হাস্যের উদ্রেক করে। কবি চিকন গয়লানীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই পাঠক না হেসে পারে না—

কোন দন্ত পড়িয়াছে কোন দন্তে পোকা।
সোয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে শাখা ॥
চলিতে ঢলিয়া পড়ে রসে থলথল।
শুখাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল ॥
তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিনী।
বৃদ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী ॥

এ হেন চিকন গোয়ালিনীর দই-দুধের ব্যবসা। ব্যবসা সে ভালই বোঝে, আর তাই—

এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পানি ॥

কবি বলেছেন গোয়ালিনী তুলনামূলকভাবে দধি-দুগ্ধ অপেক্ষা কথা বিক্রয় করত অধিক—

দধি-দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ॥

কমলার প্রতি আকৃষ্ট কারকুন কমলাকে লাভের ব্যাপারে এ হেন গোয়ালিনীর সাহায্য নিয়েছে। গোয়ালিনীও নেমে পড়েছে পুরো দমে। কারকুনের প্রতি কমলাকে আসক্ত করার চেষ্টা করায় কমলা নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হয়েছে, কিন্তু মুখে অসন্তোষের ভাব না দেখিয়ে চিকন গোয়ালিনীর প্রতি যেন সে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিজের গলার হার পুরস্কার স্বরূপ দেবার অছিলা করে—

চুলেতে ধরিয়া কন্যা নিকটে আনিল।
গোয়ালিনীর গালে তিন ঠোকর মারিল ॥
ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সান্নিকের জোরে।
ভূমিতলে পড়ে দাঁত কন্যার ঠোকরে ॥
চুলেতে ধরিয়া তার শিরে দিল ঢিল।
পৃষ্ঠেতে মারিল তার পাঁচ সাত কিল ॥

বেচারী গোয়ালিনীর দাঁত থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। কিন্তু কথায় বলে ভাঙে তবু মচকায় না, গোয়ালিনীরও হয়েছে তাই—

পন্থের লোক জিজ্ঞাসা করে রক্ত কেন দাঁতে।
গোয়ালিনী কহে মোরে মারিল সান্নিকে ॥

'মাণিকতারা ডাকাইত' শীর্ষক গীতিকায় তিনকড়ি কবিরাজ নামে এক কবিরাজ চিত্রিত হয়েছে। তিনকড়ি কবিরাজের যে বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে, তা নির্মল হাস্যোদ্রেককারী। বাসুর মাকে চিকিৎসা করার জন্য কবিরাজ মশাইয়ের প্রস্তুতির বিবরণে বলা হয়েছে—

তিনকড়ি কবিরাজ শুইনা ধুতি—চান্দর পইর‍্যা।
চান্দরের খুইটার মধ্যে দাওয়াই বাইন্ধ্যা লয়্যা ॥
হাতে লইল বাগা-লাঠি কান্ধে লইল ছাতি।
তুলসী তলায় যায়্যা কবিরাজ ঠেকাইল মাথি ॥
কিষ্ট বরণ শরীল খানি ত্যালতালা তার গাও।
খাটা খুটা নাফাগোফা ফাটা ফাটা পাও।
কুতকুতাইয়্যা চায় কবিরাজ গুরগুরায়্যা যায়।

বেলের ছাল, নিমের পাতার ঝোল, আরও কতকিই না সে খেতে বলেছে বাসুর মাকে। পথ্য ও ঔষধের পরামর্শ দিয়ে যথারীতি সে

একবুলা চাল, একডাঙ্গা ডাল, হলুদ, লবণ, তেল, বেগুন, মরিচ কলা, ইত্যাদি নিয়ে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু কবিরাজ প্রদত্ত আশ্বাস—

তোমার মাও যে ভালো হইব খাইলে চাইবড়া বড়ি

—কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বাসুর মা সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। কবিরাজের স্বরূপ, প্রতারণা প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু তার অভিনয় নৈপুণ্যে আমরা যেমন চমৎকৃত হই, তেমনি তার চমৎকার প্রতারণায় না হেসেও পারি না। এই একই গীতিকাতে বাসু মাণিকতারার কথামত তাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হলে বাসুসহ নিজের তিনটি সন্তানকে নিয়ে সাধু মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছে বলে বলা হয়েছে। বাসুর পাতে ভাজা পোড়া দেওয়া হয়েছে দেখে মাণিকতারার পিতাও ক্ষেপে আগুন। ভাবী জামাতার পাতে কখনও ভাজা পোড়া দিতে নেই এই হল সংস্কার। অতএব বাসুকে প্রদত্ত ভাজা পোড়া সব প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে ভোজনরসিক বাসুর মধ্যে—

বাসু ভাবে, হায় কি হইল এই না'কম্মে ছিল।
মস্ত বড়ো কইমাছ ভাজা আর বাগুন পোড়া গেল॥
আলুভাজা বাগুন ভাজা ভাজা তিলের বড়া।
বেসন দেওয়া উচ্ছি ভাজা চাপুটি কড়া কড়া॥

দুঃখিত বাসু সান্ত্বনা পেয়েছে এই ভেবে—

মনের মতন জিনিস পায়্যা খাবার না পারিল।
বিয়া হইব ভাব বুইঝ্যা মনে খুশী হইল॥

'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' গীতিকাটিতেও কিছু কৌতুক রস পরিবেশিত হয়েছে। এছাক মিঞা আমিনাকে লাভ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কিছুতেই আমিনার মন পায়না সে। অগত্যা এছাক বুধা গুণিনের শরণাপন্ন হয়। বুধা তাকে দেয় তেল পড়া আর আশ্বাস। সেইমত তেলপড়া মুখে মেখে এছাক প্রতীক্ষারত হয়, কিন্তু হায় এত করেও এছাকের আশা পূরণ হল না—

ন আইল ন আইল কন্যা ন আইল ঘরে।
ত্যাল পড়া মুখত্ মাখি এছাক ভাবি মরে॥

* * *

সারারাইত মোশার কামড় সইয়া সইয়া।
ফজরে আপনার বাড়ীত্ গেল এছাক মিঞা ।।

বেচারী এছাকের ব্যর্থতা পাঠক চিত্তে কিন্তু কৌতুক রস সৃষ্টি করে। চিত্তরঞ্জন দেব সংকলিত 'চম্পকলতা' গীতিকায় ঠগনগরী ও উঠান দম—দমি নামে দুটি চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তাদের নামেই তাদের চারিত্রিক পরিচয় কিছুটা প্রকাশিত। দুই বোন এরা এবং এরা দুজনেই ডাইনি। ঠগনগরীর বয়স হবে আশি-নব্বই। লোককে প্রতারণা করাই এদের জীবিকা। এদের প্রতারণার ঘটনা পালাটিতে বর্ণিত হয়েছে।

ঠগনগরী একটি মৃত ছেলের সাহায্যে প্রভুত বিত্ত লাভ করেছে দেশের রাজার কাছ থেকে। কি ভাবে তার বিবরণ হল এইরূপ—

অগো সেই না দ্যাশের রাজার কুমার
বিয়া করতে যায়,
ঠগনগরী হেই রাস্তায় এক মরা পোলা
কোলে নিয়া করে হায় হায়।
ঠগী কয়, রাজার পুত্তুর বড় মাইনষের বেটা,
দুঃখিনীর লাতী মাইর‍্যা বাধাইলা এক ল্যাঠা।
মরা পোলা লইয়্যা ঠগী যায় রাজার নিকটে,
সভার মইধ্যে গিয়া কয় কান্দিতে কান্দিতে।
উম্মত্ত হইয়্যা সুখে নাহি দেখে দীন-দুঃখে
অকস্মাৎ ফেলিলো ভুতলে।

রাজা শেষপর্যন্ত এক সহস্র মুদ্রা দিয়ে ঠগীর অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছেন।

উঠানদমদমির পরামর্শে ঠগনগরী—পাঁচটি খুতির একটিতে কিছু সুবর্ণ রেখে সেগুলি নিয়ে হাজির হয়েছে মাধব বেনের কাছে। মাধব সোনা দেখে বিগলিত। ঠগনগরী জানিয়েছে সে তীর্থভ্রমণে যাচ্ছে, তাই খুতিগুলি মাধবের কাছে রেখে যেতে চায়। মাধব ত এককথায় 'রাজি, আর এইখানেই হল কাল। দিন তিনেক বাদেই সে মাধবের কাছে এসে তার দেওয়া খুতিগুলি ফেরৎ চায়। মাধব দরজা বন্ধ করে দেয়। ঠগী রাজসভাতে

গিয়ে কেঁদে পড়ে। রাজা লোক দিয়ে মাধবকে ধরে আনান। একটি খুতিতে সোনা দানা পেলেও অন্যগুলিতে কিছুই পাওয়া গেল না। আসলে এসবে মাধবের কোন দোষ ছিল না। রাজাদেশে তাকে চার খুতি সোনা দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়—

পাঁচ খুতি সোনা লইয়া ঠগী তহন বাড়ীতে ফিরিল,
উঠানী দেইখ্যা উয়া আনন্দে ভাসিল।

এইভাবে বাংলা লোক-সাহিত্যে হাস্যরসের অফুরন্ত খনি বিশেষে পরিণত হয়ে আছে। প্রয়োজন হ'ল উপযুক্ত রসিক ব্যক্তির, যিনি এই খনি থেকে সংগ্রহ করে আনবেন মূল্যবান মণি-মাণিক্যগুলি নিজের এবং অপরের আস্বাদনের জন্যে।



বাংলা লোক-সাহিত্যে 'কলকাতা'

ক. লোক-সঙ্গীতে ঃ

কলকাতা ভারতবর্ষের ভুতপূর্ব রাজধানী এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। কলকাতা বাংলাদেশেব সংস্কৃতি চর্চাব পীঠস্থান। তাছাড়া কলকারখানা কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যেরও কেন্দ্র ভুমি এই কলকাতা। কলকাতা কখনও মিছিল নগরী, কখনও আবাব তা দুঃস্বপ্নেব নগরী। কিন্তু এসবই তথাকথিত শিক্ষিত এবং শহরের মানুষের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত কলকাতার রূপ। শত ত্রুটি এবং কলঙ্ক রটনা সত্ত্বেও গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে এখনও কলকাতার এক অমোঘ আকর্ষণ। অনেকটা সেই রূপকথার রাজ্যের প্রতি শিশুমনের দুর্বার আকর্ষণের মত। কলকাতা গ্রামবাংলার মানুষের কাছে এক স্বপ্নের জগৎ, অনন্ত বিস্ময়ের লীলা নিকেতন। এখানকার অজস্র যানবাহন, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, চিড়িয়াখানা-যাদুঘরের মত আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যস্থান সমূহের সমাবেশ—সব মিলিয়ে কলকাতা গ্রামের মানুষের কাছে এক বহু অভিলষিত দর্শন স্থান। গ্রামে বসে সেখানকার মানুষ কলকাতা সম্পর্কে কত কিই না শোনে। কেউ হয়ত কোন সূত্রে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয় তারপর গ্রামে ফিরে গিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে। গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলি কল্পনায় কলকাতার রূপ প্রত্যক্ষ করে। বাস্তব জীবনে এ হেন কলকাতা দর্শনের সুযোগ অধিকাংশেরই ঘটেনা, তাই সেই অবরুদ্ধ বাসনা অভিব্যক্ত হয় এদের রচিত সংগীতে।

সাম্প্রতিককালে ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরী কিংবা রাজনৈতিকসূত্রে গ্রাম-বাংলার সঙ্গে কলকাতার যোগ অনেক নিবিড় হয়েছে, কিন্তু সেই নিবিড় পরিচয়ের প্রতিফলন তেমন করে ঘটেনি বাংলার লোক-সংগীতে। তাই

অনুমান করা অযৌক্তিক হবেনা যে বর্তমান নিবন্ধে উদ্ধৃত গানগুলি অনেক পূর্ববর্তীকালের রচনা।

আমরা জানি কলকাতার খ্যাতির অন্যতম কারণ পুণ্যতীর্থ কালীঘাট, বাহান্নপীঠের অন্যতম একটি পীঠস্থান। সমগ্র বাংলাদেশত বটেই, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষেও এই তীর্থস্থানটি সুপরিচিত। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী কিন্তু তবু বাংলার লোক-সংগীতে কলকাতা নানা-কারণে বারংবার উল্লিখিত হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানটির কারণে একবারও উল্লিখিত হয়নি এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। বিশেষত অধিকাংশ লোক-সংগীতই যেখানে ধর্মভিত্তিক। কলকাতা সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান, সেইসঙ্গে এখানে অর্থোপার্জনেরও নানা সুযোগ—সুবিধা। গ্রামবাংলার মানুষের কাছে কলকাতার আকর্ষণ তাই নিছক দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; শিল্পকলা চর্চার উপযুক্ত স্বীকৃতিলাভের সুযোগ এবং তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় অর্থ-উপার্জনের অনুকূল সম্ভাবনাও এখানকার মানুষকে কলকাতার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে। পুরুলিয়ার একটি 'শোলোক গানে' সেই ব্যঞ্জনাটি উপস্থিত—

চাবি গো চাবি, কলকাতায় নাচতে যাবি,
একশ টাকা বেতন পাবি।

বাংলার লোক-সংগীতগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই যেমন অনবদ্য কবিত্ব শক্তির সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আবার লক্ষ্য করা যায় কল্পনা শক্তির দৈন্যদশা, বাণীরূপের অসংলগ্নতা অথবা অর্থহীন ভাবের সংযোজন। বস্তুতপক্ষে সংহত সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ইত্যাদি অনুভূতিগুলির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিরই ফলশ্রুতি হল আমাদের লোক-সংগীতগুলি। শিশু যেমন যৎসামান্য উপকরণ নিয়েই আনন্দময় ক্রীড়ায় মত্ত থাকে, আমাদের দেশের সংহত সমাজের মানুষেরাও তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসবে নিমগ্ন হবার অন্যতম প্রধান উপকরণ স্বরূপ সংগীতের ওপর নির্ভর করে। তাই স্বভাবতঃই এক্ষেত্রে বাণী-রূপের মূল্য অপেক্ষা সুরের মায়াজাল রচনা এবং সেই সুরমূর্চ্ছনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 'বেলপাহাড়ী' গ্রামের একটি 'লাগাড়ে' গানে উল্লিখিত হয়েছে কলকাতার বাজারে এক সুসজ্জিতা রমণীর মৃত্যু কবলিত হওয়া। কিন্তু উদ্ধৃত সংগীতে সেই রমণীর মৃতদেহ স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে—

কলকাতার বাজারে বিটি মরিল,
কেউ না ফেলিতে মানা,
হাতে আছে চুড়বালা, কানে আছে কানপাশা,
ওনাকে হাতাও গে—
এন রাহ দুগিডি কায়পে

'লাগাড়ে গান' সাঁওতাল উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত। নৃত্য সহযোগে এই গান গীত হয়। বাংলা এবং সাঁওতাল* উভয় ভাষাতেই এই গান রচিত হতে দেখা যায়।

কলকাতা মহানগরীর সর্বাধিক উল্লেখ ঘটেছে যেমন 'তুষু' গানে, তেমনটি কিন্তু লোক-সংগীতের অন্যান্য বিভাগে ঘটেনি। এমনকি 'তুষু' গানেরই অনুরূপ যে 'ভাদুগান', তাতে কিন্তু কলকাতার তেমন উল্লেখ ঘটেনি। একটি ভাদুগানে এরোপ্লেনে চেপে ভাদুর সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে মদনমোহন দেখে আসার বাসনাকে প্রকাশ করা হয়েছে—

ভাদুর সঙ্গে যাব মোরা, এরোপ্লেনে রথ দেখিতে,
ঐ পথেতে কোলকাতাতে দেখে আসব মদনমোহন।

বাঁকুড়ার একটি 'ভাদুগানে' যুদ্ধের বিভীষিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে বাঁকুড়া এবং আসানসোলের মত শহরের সঙ্গে কলকাতার নামও উচ্চারিত হয়েছে—

ভাদু, হল্যো কি দেশে, সোলজাররা দেশ চাপ্যেছে
ঘরের মানুষ উঠাই দিয়ে সোলজাররা ঘরে বসে।
এরুপালেন, বোমা, কামান, ছাড়িয়ে খনে খনে,
সাঁতারবাবু ভেয়েরা উঠে গো জনে জনে।
বাঁকুড়া, কোলকাতা আবার গো আসানসোল বন্ধ হচ্ছে,
বাঁকুড়ার খেতু গরাইগো মটর বন্ধ করেছে।

ছড়ায় যেমন বহু শব্দ নিছক ছন্দের প্রয়োজনে কিংবা শ্রুতিমাধুর্যের জন্যে অথবা নিছক চমৎকারিত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, লোক-সংগীতের ক্ষেত্রেও সর্বত্র না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কিছু বিষয় স্থান পেয়েছে যেগুলির আক্ষরিক মূল্যের সন্ধান করলে সচেতন শ্রোতা কিংবা পাঠককে ব্যর্থ হতে হয়, বিশেষত এইসব বক্তব্যের পারম্পর্যের সন্ধান লাভ দুরূহ

হয়ে ওঠে! একটি 'পাতা নাচের গানে' মুখ্যতঃ এক সৌভাগ্যবতী রমণীর বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে 'কলকাতা'র নামটি উল্লিখিত হয়েছে—

দালান গোড়ায় দূর্বাঘাস,
কোলকাতাতে বারোমাস,
হায়রে সাধের, ময়না,
এমন চাকরা – ভাতার হয় না ;
সকল কাজে ফাঁকি দিয়ে দিবেক শুধু গয়না ॥

এখানে কলকাতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে এখানকার দালান গোড়ায় বারোমাস দূর্বাঘাস দৃশ্যমান। কিন্তু বস্তুত এই বক্তব্যের যাথার্থ যে স্বীকার করে নেওয়া যায় না, কলকাতাবাসীর অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। তবে হ্যাঁ, এই গানই যখন তার নির্দিষ্ট সুর সহযোগে গীত হয়ে থাকে, তখন সেই অনবদ্য সুর মূর্চ্ছনায় বক্তব্যের অসংগতি আর ধরা পড়ে না। একটি 'আলকাপ গানে'ও কলকাতা নগরীর কথা উল্লিখিত হয়েছে।

মা, মা, তোর জামায়ের বাড়ী আমি তো যাব না ;
তোর জামায়ের বাড়ীর ঠেলা দূরের ঘাটে জল আনা।
শাশুড়ী ননদ বসে থাকে এক কুলো ধান কেউ ঝাড়েনা,
তোমার জামাই কোলকাতাতে চাকুরী করে
বছর অন্তর একদিন ফিরে,
সারা রাত্রি কাগজ মারে, ডাকলে কথা কয়না ॥

বিবাহিতা এক রমণী তার মায়ের কাছে বলছে যে সে আর শ্বশুরবাড়ী যাবে না। তার শ্বশুরালয় ত্যাগের কারণ দ্বিবিধ—প্রথমত বাড়ীর সব কাজই তাকে করতে হয়। গৃহস্থালীর কাজে শ্বশুর বাড়ীর কারোর সাহায্য সে পায় না। বহুদূর থেকে জল আনা, ধানঝাড়া সব একাকী তাকেই করতে হয়। শাশুড়ী কিংবা ননদ বসে থাকে তবু এক কুলো ধান ঝেড়ে উপকার করেনা। তবে বিবাহিতা কন্যাটি তার বহু অভিলষিত স্বামীগৃহ ত্যাগের শেষ যে কারণটির কথা বলেছে সেইটিই আসল। তা হল স্বামীর সঙ্গলাভ থেকে বেচারী নিদারুণভাবে বঞ্চিত। বছর অন্তর একদিন করে স্বামী নিজের গৃহে উপস্থিত হয়। যদি বা দীর্ঘ ব্যবধানের পর গৃহে উপস্থিত হয়, তাও আবার সে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, স্ত্রীর সঙ্গে তেমন বাক্যালাপ করেনা, এমন কি স্ত্রীর ডাকে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। স্বামী সঙ্গ

সুখ ভোগের সৌভাগ্য হলে কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপারে কন্যার তেমন ওজুহাত থাকত না বোধকরি। কিন্তু যে স্বামীর মুখ চেয়ে তার অক্লান্ত পরিশ্রম, সেই স্বামীই যদি তাকে অবজ্ঞা করে, ঠিকমত সঙ্গদান না করে, তাহলে আর কি আকর্ষণে কন্যা স্বামীগৃহে পড়ে থাকে। গানটিতে বলা হয়েছে চাকরী উপলক্ষ্যে স্বামী কলকাতায় থাকে। গ্রাম বাংলায় বহু-মানুষকেই যে স্ত্রী পুত্র পরিজন ছেড়ে চাকরী সূত্রে কলকাতায় থাকতে হয়, সেই সত্যের ইঙ্গিতটি গানটিতে রয়ে গেছে। তবে একটা কথা। যতই কেন কার্যোপলক্ষে স্বামীকে কলকাতায় অবস্থান করতে হোক, তবু বছর অন্তর তার একদিন মাত্র নিজগৃহে উপস্থিত হবার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না। অবশ্য গানটিতে বর্ণিত 'বছর অন্তর একদিন' এই বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা অপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান অর্থে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বিরহ ব্যাকুলা পত্নীর কাছে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে স্বামীর উপস্থিতি 'বছর অন্তর একদিন' বলে সম্ভবত প্রতিভাত হয়েছে।

বাংলা লোক-সংগীতের মধ্যে বেশ কিছু ঘটনামূলক সঙ্গীতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঘটনামূলক সঙ্গীতগুলি সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক অথবা পারিবারিক ঘটনা কিংবা চরিত্র অবলম্বনে রচিত। মুর্শিদাবাদের আম্রকানন পলাশীতে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মীরজাফর এবং অন্যান্যরা এই যুদ্ধে যেমন নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবের ভরাডুবি ঘটিয়েছিল, তেমনি কিছু কিছু দেশপ্রেমিক বীর মাতৃভুমির স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যদের মোকাবিলা করেছিলেন। এরকমই এক স্মরণীয় চরিত্র মীরমদন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধে মীরমদনকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত একটি ঘটনামূলক সংগীতে মীরমদনের মৃত্যুর বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে কলকাতায় মোহনলালের কন্যার ক্রন্দনের কথাও উল্লিখিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়—

কি হলোরে জান।
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে স'য়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি, লাল কুর্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের পায় ॥

কি হলোরে জান।
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ ॥
নবাব কাঁদে, সিপাই কাঁদে, আর কাঁদে হাতী,
কলকাতায় বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী ॥
কি হলোরে জান।
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান ॥

ঢাকার অন্তর্গত ধল্লাগ্রাম নিবাসী লেহাজদ্দিন নামে জনৈক লোককবির একটি 'গোবীনামা জারী'তেও ক'লকাতা শহরটি উল্লিখিত হয়েছে। এই জারীতে বর্ণিত হয়েছে একটি গাভীর করুণ পরিণতির কাহিনী। উল্লেখযোগ্য যে মুসলমান কবি গাভীর মৃত্যুতে মাটির ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করে প্রকারান্তরে মৃত গাভীটির প্রতি তাঁর নিজেরই অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। সে যাইহোক, গাভী হত্যার পর তার মাংস ভক্ষিত হয়েছে এবং তার চামড়া রৌদ্রে শুষ্ক করার পর সেই শুষ্ক চামড়া কলকাতায় চালান দেওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর কলকাতায় সেই চামড়া থেকে প্রস্তুত হয়েছে ভদ্রলোকের ব্যবহারের জন্যে জুতো এবং চামড়ার প্রস্তুত নানাবিধ বাদ্য সামগ্রী যেমন ঢোলক, তবলা, খোল ইত্যাদি। উদ্ধৃত জারীটিতে কলকাতাকে চর্মশিল্পের কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।—

গলে রশি দিয়া গাভীকে নিয়ে গেল হাটে,
অবশেষে বিক্রি দিল কসাই বেটার হাতে।
কসাই নিয়া গাভীকে গলে দিল ছুরি,
মাটি কেঁদে বলছে তখন, "আহা মরি মরি।"
গোস্ত খেয়ে তুষ্ট হয়ে চামড়াটা দেয় ফেলে,
অবশেষে ঋষি বেটা চামড়াটা দেয় মেলে।
রৌদ্রে শুকায়ে চামড়া করে টান,
অবশেষে পাঠায়ে দেয় কলকাতা চালান।
ঢোলক, তবল, সারিন্দা বাজায় কত খোল,
খঞ্জুরি, দামামা, বাঁশী, দোতারা, তবল।
এই রকম কত জনে বাদ্য বাজায়,
ভদ্রলোকে সুখ করেছে জুতা দিয়া পায়।

কলকাতা এক অত্যন্ত জনবহুল নগরী। শুধু জনবহুল নগরীই নয়, কলকাতা যেমন বিরাট অঞ্চল অধিকার করে আছে, তেমনি অসংখ্য এখানকার

পথ-ঘাট। কত অফিস-আদালত, কাছারী আর সেইসব সূত্রে কত মানুষেরই না যাতায়াত এখানে। দোকান-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য এসবের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। বাস্তবিক কলকাতা বড় এক বিচিত্র নগরী। যে ব্যক্তি কলকাতা নগরীতে কখনও পদার্পণ করেনি কলকাতার জীবন সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, সেইরকম অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে কলকাতা কি রকম গোলকধাঁধা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষত গ্রাম্য মানুষকে তা কতখানি দিশেহারা করে তোলে, পূর্ববাংলার তাঁতীদের একটি গানে সেই পরিচয়ই বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে—

মরি হায়রে, আল্লা হায়,
আমি কি করিব কোথা যাব না দেখি উপায়।
কলিকাতা আইসা আমি ঠেক্‌লাম বিষম দায়॥

পাঁচালী জাতীয় কয়েকটি গানেও কলকাতা নগরী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয়েছে। কখনও ব্যক্তিগত কেচ্ছা প্রচারের জন্যে, কখনও বা নিছক স্থান হিসাবে, কখনও বা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হিসাবে কলকাতার নাম উচ্চারিত হয়েছে। টাকার মহিমাজ্ঞাপক একটি পাঁচালীতে টাকা বিনা আপনজনও কিরকম বৈগুণ্য প্রদর্শন করে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন নিঃস্ব অবস্থায় তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে কলকাতা, দিল্লী, বগুড়া, মুর্শিদাবাদে পর্যটনে রত। হয়ত এইসব শহরে যদি কিছু অর্থ উপার্জন হয় তারই চেষ্টায়—

টাকা নিয়ে ঘরে গেলে, কত রমণী সব যত্ন করে,
স্ত্রী পুত্র টাকা না দেখিলে তারা মুখ করে বাঁকা।
আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কেবল টাকা।
কলিকাতা শহর দিল্লী শহর আর বগুড়া।
মুর্শিদাবাদ জেলা আমি ভ্রমণ করি একা॥

বন্যাকবলিত পশ্চিমবঙ্গের অবর্ণনীয় বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লৌকিক পাঁচালীতে এমন কি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী যে কলকাতা মহানগরী তারও শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে—

কলিকাতার সে রাজধানী সেও তো নাইকো বাকী,
মোটর বাস সব অচল হলো, বলব আমরা কাকে।

এইবার কেচ্ছা বর্ণনা প্রসঙ্গে কলকাতাকে কি ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে দেখা যাক—

এক মাগি কোলকাতাতে, বসে তার দুতলাতে পেয়েছে বেঁড়ে গত
তাইতে মাগি মরছে বকে, তা দেখে এক গোদা চিলে, রাঙাগায়ে
আঁচড় দিলে, আঘাতে পেটের ছেলে, উঠল হেলে গেল কেঁচে ॥
বিধবার গর্ভ হল, সধবা সাধ খাওয়ালো তা দেখে পাকাচুলো
মরে গেল মনের দুঃখে। কুমারীতে গর্ভবতী, তারাই হোল
মহামতী, মথুরার ঘরে তাঁতী কাল কাটিয়ে মহাদুখে ॥

একাধিক বাউল গানে কলকাতাকে মানবদেহের রূপক রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। একটি বাউল গানে কলকাতার লালদীঘি, বাগবাজার, সোনাগাছি, মানিকতলা, জোড়াসাঁকো ইত্যাদির উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

ওরে মানব-দেহ কল্‌কাতা কেতা চমৎকার,
ও ভাই, লালদীঘির পানি বড় মিঠা যে শুনি,
কেউ বা বলে লুনছা লাগে ঘর্মের হয় হানি।
ও পানি যে খেয়েছে সেই মজেছে সেই হ'য়েছে ভবপার—
কেতা চমৎকার ॥
তুমি কলকাতার বাগবাজারে রও
ও, ভাই, কতই কাম বাজাও।
হরিনামের মুণ্ডা এনে ঠাণ্ডা হয়ে খাও।
যেদিন বাগবাজারে পড়বি ফেরে সেদিন প্রাণ বাঁচান হবে ভার
কেতা চমৎকার ॥
কলকাতার বায়ান্ন বাজার ও তার তেপান্ন গলি,
হাত ধরে ঘাড় মুচড়ে ভেঙে দেয় নরবলি।
ও নামে সোনাগাছি মানিকতলা জোড়াসাঁকো আচ্ছা বাহার
কেতা চমৎকার ॥
তোমার গঙ্গার ধারে ঘর—কাঁপে থর থর—
তার ভিতর দেখতে পাবে আজব রং খেয়াল,
যাদুবিন্দু বোকা হয়ে ধুকা, উলোড় বনে দেয় সাঁতার,
কেতা চমৎকার ॥

আর একটি বাউল গানেও মূলতঃ দেহতত্ত্বের বিষয়কেই কলকাতার রূপকে উপস্থিত করা হয়েছে। এই গানটিতে উল্লিখিত হয়েছে কলকাতার বিখ্যাত ধর্মতলার মোড়, রাধাবাজার, পোস্তাবাজার, লাট সাহেবের বাড়ী,

আলিপুরের জেলখানা, হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ), মনুমেণ্ট (শহীদ মিনার), মেটকাফ কলেজ, উল্টাডাঙ্গা ইত্যাদি।

আছে বাজার বহুতর, বাজার পেস্তা ভরপুর,
ললাটেতে লাটের বাড়ী জিহ্বায় জজের ঘর,
আছে কণ্ঠাতে কালেক্টর বসে আছে কাছারী করে গুলজার ॥
আলিপুরের জেলখানা মনে বুঝে দেখ না,
দেহের মধ্যে চিন্তা গারদ নাই তার তুলনা,
পাবে মেটে কলেজ হিন্দু কলেজ
এই দেহের হলে বিচার ॥
দেহতত্ত্ব পরিচয় দেহ উল্টাডাঙ্গা হয়,
আজব কাণ্ড মনুমেণ্টে মূল পদার্থ রয়।
আছে চুলে চুলে চুল গণি,
গুণে কে করে সুমারে ॥

* * *

মানব-দেহ কলিকাতা, ভাই ক্রেতা চমৎকার।
তুলনা নাইক তার ॥
মনে বুঝে দেখ, ভাই, রতি তফাৎ নাই
আছে দুই গ্যাসের আলো দেখতে পাই।
ক'রে সোনার শহর দীপ্তকার ॥
লালবাজারে জোর দেখে চোখে লাগে ঘোর,
চিনে বাজার চিনলে পাবে ধর্মতলার মোড় ॥
আছে ভারী মজার রাধাবাজার
শেষে স্মরণ হয় সবার ॥

* * *

এই মানব দেহখান আছে কতরূপ বাগান,
কলিকাতা তার কোথায় লাগে ইংরাজের নির্মাণ,
আছে চৌদ্দ পোয়ার চৌদ্দ ভুবন,
খোদা খোদা করে তৈয়ার ॥

উদ্ধৃত গানটিতে শেষপর্যন্ত বৈচিত্র্যের বিচারে ইংরাজ নির্মিত এই কলকাতা শহরের তুলনায় মানবদেহের শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

এইবার 'তুষু' গানে কলকাতার সন্ধান নেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন প্রকার সংগীতের মধ্যে বিশেষ করে 'তুষু' গানেই কলকাতার উল্লেখ সর্বাধিক। সেদিক দিয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনায় 'তুষু' গানগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ লোকসঙ্গীত যেখানে পুরুষের রচনা, সেক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় যে ক'টি শ্রেণীর গান একান্তভাবে স্ত্রীলোকদের রচনা, 'তুষু' তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। ফলে 'তুষু' গানে আমরা যে কলকাতাকে পাব, তা একান্তভাবে গ্রাম বাংলার স্ত্রীলোকদের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত কলকাতার এক বিশেষ রূপ। আর সেই কারণে 'তুষু' গানে কলকাতা মুখ্যতঃ শাড়ী, গয়না, প্রসাধন সামগ্রী সংগ্রহের কেন্দ্রভূমি হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। অবশ্য তাছাড়াও কোন কোন 'তুষু' গানে কলকাতাকে মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রাপ্তির আদর্শ স্থান কিংবা উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থানের জন্যে বিখ্যাত বলে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রথমেই প্রসাধন দ্রব্য প্রসঙ্গে যে সব 'তুষু' গানে কলকাতা উল্লিখিত হয়েছে—

বাঁকুড়ার আয়না-চিরুণ কলকাতার ফিতা,
অতি যত্ন করে বেঁধেছি মাথা
তাও যে বাঁকা সিঁথা ॥

কিংবা, কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি গয়না উঠেছে,
ইলির মিলির ঝিলির কাটা পায়ে পার্তমল আছে ॥

অন্য একটি 'তুষু' গানে কলকাতায় স্ত্রীলোকদের মাথার চুল এবং শাড়ী সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশিত হয়েছে—

কলকাতা যে গেছলেন তুষু কার কতটা চুল আছে?
চুলের কথা বলব কি আর পিঠ ভেঙ্গে চুল পড়েছে।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি শাড়ী উঠেছে?
বেনারসী শাড়ী মাগো তার উপরে ছাপ আছে।

কলকাতা কেবল বিলাস-উপকরণের জন্যেই গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে আকর্ষণীয় তা নয়, বৈচিত্র্যময় শৌখীন খাদ্য দ্রব্যের কারণেও কলকাতার এক অমোঘ আকর্ষণ তাদের কাছে—

কলকাতা যে গেছলে, তুষু, কি কি সন্দেশ উঠেছে,
এঁকা বেঁকা জিলপি খাজা নারকেল তেলে ভাজেছে।
আয় লো আয় সজনী,
বাস্কা ফুল বাস্কা ভরা দিব এখনি।
পান বানা লো পান, ও সখী, পানের ভিতর আধুলি,
আগাম জলে ফেলে দুব কালাচাঁদের মাদুলী ॥

কিংবা, আচিরে পাচিরে পদ্ম, পদ্ম বই আর ফোটেনা।
তুষুর হাতে জোড়া পদ্ম ভ্রমর বই বসে না।
ভ্রমর এলো খাতা খাতা ও তুষু তুই ফুল পাতা ॥
এমন দেখে ফুল পাতাবি চলে যাবি কলকাতা।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি সন্দেশ উঠেছে?
আঁকাবাঁকা জিলপী খাজা ফুলন তেলে ছেঁকেছে।
সরু ঝাঝরা মিহিদানা এসেনসেতে ছেঁকেছে।

কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম হল চিড়িয়াখানা। এখানে রক্ষিত বিচিত্র সব জীবজন্তু ও পাখী গ্রামবাংলার মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আবার বিচিত্র সব জীবজন্তুর মধ্যে বাঘের প্রতি আকর্ষণটাই একটু অধিক। একটি 'তুষু' গানে কলকাতার চিড়িয়াখানায় পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘ দর্শনের কথা বলা হয়েছে—

ওপরে পাটা, নামো পাটা, তার ভিতরে দারগা
ও দারগা পথ ছেড়ে দাও, তুষু যাবে কলকাতা।
কলকাতা যে গেছলে তুষু কি কি দেখে এলে গো?
তুষু বলে দেখে এলাম সোনার খাঁচায় বাঘ বসে।

একাধিক 'তুষু'গানেই কলকাতার ছেলে-মেয়েদের প্রখর বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ করা হয়েছে। গ্রামীণ মানুষেরা কলকাতার ছেলেমেয়েদের আচরণকে যে তেমন সুনজরে দেখেনি, তারই প্রমাণ নিহিত রয়েছে একটি গানে—

কোলকাতাতে দেখে এলাম ছোট ছোট ঝর কদম,
ছোঁড়ারা কুলকুলি দেয়, ছুঁড়িরা গাছের বাঁদর।
ওরে ওরে গোহা বাবলা তোরে করব রেইলগাড়ী
ওই গাড়ীতে চেপ্যে যাবো যতীনবাবুর ঘরবাড়ী।

গ্রামের মানুষ অনেকেই রেলগাড়ী দেখেনি। আবার গ্রাম থেকে কলকাতায় আসার একমাত্র না হোক অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাধ্যম এই বহু অভিলষিত দর্শন রেলগাড়ী। অবশ্য যে সময়ে আলোচ্য 'তুষু' গানগুলি রচিত, তখন কলকাতার সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগে এখনকার মত দূরে পাল্লার বাসের ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। একটি 'তুষু' গানে কলকাতা আসার আকর্ষণ হিসাবে রেলগাড়ীর কথা বর্ণিত হয়েছে—

তুষু যাবেক রেল দেখতে কলকাতা শহরে
আমায় ছাড়ে যেতে লারে—
উয়ার মন কেমন কেমন করে।

গ্রামের মানুষের কাছে কলকাতা যেন রূপকথার নগরী, অবস্থান তার সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। গ্রাম থেকে কলকাতার দূরত্ব—সে অনেক দূর। তাই একটি গানে চুলের বহর অনেকখানি বোঝাতে কলকাতার উপমা টেনে আনা হয়েছে অবলীলাক্রমে—

চল সারদা চল বরদা কুলিতে বাঁধ বাঁধাব,
কুলির জলে সিনান করব গরজে চুল শুকাব।
বেণ্ডতলায় বেঁধেছি মাথা, চুলের মহক ছুটে কলকাতা।

শুধু কলকাতার ছেলেমেয়েদেরই নয়, টেরিকাটা বাবুদেরও একহাত নেওয়া হয়েছে একটি গানে—

এক পয়সা বিরি কলা কলকাতাতে ছড়াবো।
কলকাতার বাবুগুলার টেরি বাগা ছাড়াবো।।

গানে কলকাতার টেরিকাটা বাবুদের ওপর রাগের কথা ব্যক্ত হলেও রাগের কারণটি অবর্ণিত রয়ে গেছে। সম্ভবত কলকাতার কোন টেরিকাটা বাবু গ্রামের মানুষকে অবজ্ঞা করে কোন রূঢ় কথা বলে থাকবে বা রূঢ় আচরণ করে থাকবে। তারই প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে গানের মধ্য দিয়ে।

একটি ঝুমর গানেও কলকাতার উল্লেখ দেখি—

কলিকাতার টিকিত গাড়ী বর্ধমান দাঁড়াইল
ও কাল্যে বাছারে টিকিতে মা বড় ভয় লাগে।

একটি 'চট্‌কা গানে' মূলতঃ কলকাতার শহুরে মেয়েদের চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে লঘু পরিহাসের মধ্য দিয়ে—

আমার বাংলায় করে মোন ফাঁপর
চল যাই কলকাতা শহর।
শহরে ভাড়া করলাম ঘর,
থাকি দোতালার উপর।
দিনে দিনে গিন্নীর মন করে ফর্ ফর্।
(আবার) গিন্নী গাড়ি ঘোড়া দৌড়িবার চায়
ও গিন্নী দ্যাখতে চায় দিল্লীর শহর—
এসে এই কইলকাতা শহর।।
ও গিন্নী আলতা পরে পায়,
পায়ে ছ্যাণ্ডেল লাগায়,

চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি যে দেয়,
ও গিন্নীর ভ্যানিটি ব্যাগ, সোনার গয়না গায়,
ও গিন্নী বাইনতে বলে লেকে ঘর
এসে এই কইলকাতা শহর।
ভেবে মুকুন্দ বলে মোনের আক্ষেপে
ও গিন্নীর আছে সকলে,
স্বামীর কোলে দিয়ে ছেলে
রাস্তাতে চলে।
ও তাব ডুরে শাড়ী, রেশমী চুড়ী, তবু আমায় ভাবে পর,
চল যাই কইলকাতা শহর।।

কিছু কিছু লোকসংগীতে কলকাতা ও ঢাকাকে যেমন সমান গুরুত্ব দান করা হয়েছে, তেমনি মনে করা হয়েছে যে উভয় শহরের অবস্থান পাশাপাশি—

ঝিংগা রুইলাম সারি সারি
ধুনধুলি ঘিরিল বাড়ী।
তোমার বাবাজী গেছেরে
কইলকাত্তা ঢাকার জেলায়রে ।।

কিংবা,
আমার না বাপ ভাইয় গো
ঢাকা কইলকাত্তার বেপারী
সেই শাড়ী পরিয়া আইছি
কোকিলার ননদী গো ।।

খ. **প্রবাদে ঃ**

বাংলা লোক-সঙ্গীতে 'কলকাতা'যে বেশ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে 'কলকাতা' কি রকম গুরুত্ব পেয়েছে, এবারে আমরা সেই পরিচয় গ্রহণে প্রয়াস পাব। তবে এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করে নেওয়া প্রয়োজন যে লোক-সঙ্গীতের তুলনায় প্রবাদ, ধাঁধা বা ছড়ায় কলকাতা তেমন উল্লেখ-যোগ্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। তুলনামূলক ভাবে এসব ক্ষেত্রে কলকাতার ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর রূপেই প্রতিভাত হবে। তবু লোক-সঙ্গীতের পর প্রবাদেই কলকাতার আত্মপ্রকাশ অপেক্ষাকৃত অধিক। যে ক'টি বাংলা প্রবাদে সরাসরি কলকাতা আত্মপ্রকাশ করেছে, সেগুলিতে কলকাতার গৌরবময় ভূমিকাকে

উজ্জ্বল করে তোলা হয়নি। সাধারণভাবেই প্রবাদে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ঝোঁক বেশি, প্রকৃতিতেও তা সমালোচনামূলক, কলকাতা কেন্দ্রিক প্রবাদগুলিতেও কলকাতা নির্মম ভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন—

মিথ্যা কথার কিবা কেতা
আজব শহর কলকাতা ॥

কিংবা, মাটি, বেটি, মিছে কথা।
এই তিন নিয়ে কলকাতা ॥

অথবা, রাঁড়, ভাঁড়, মিছে কথা।
এই তিন নিয়ে কলকাতা ॥

কলকাতার গুড়ও নাকি মিষ্টত্ব হীন, এমনই এখানকার স্থানমাহাত্ম্য! তেঁতুল, তাও অম্ল গুণ বিবর্জিত!

কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।
তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ ॥

অর্থাৎ কলকাতার সবই অদ্ভুত, অনাসৃষ্টিতে এই শহর ভরা। বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়েও প্রসঙ্গত কলকাতা উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও কলকাতার মন্দ দিকটিই বড় হয়ে উঠেছে, বলা হয়েছে—

উলোর মেয়ের কলকলানি,
শান্তিপুরের খোঁপা।
নদের মেয়ের হাত নাড়া,
কলকাতার চোপা ॥

একটি প্রবাদে কলকাতার অদ্ভুতত্ব নিয়ে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

কলকাতা ধলে কথা।
আগে বেরোয় হাত পা শেষে বেরোয় মাথা ॥

কলকাতার অন্তর্গত কয়েকটি অঞ্চলকে নিয়েও প্রবাদ সৃষ্ট হতে দেখা গেছে। এইসব প্রবাদে সাধারণভাবে স্থান বিশেষের বৈশিষ্ট্য তথা গুরুত্বই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন বাগবাজার, কলকাতার এই প্রাচীন উত্তরাঞ্চল নিয়ে রচিত প্রবাদে বলা হয়েছে—

ময়রা মুদি কলাকার।
এই তিন নিয়ে বাগবাজার ॥

রসগোল্লার সংবাদে বাগবাজারের বিশেষ খ্যাতি দীর্ঘদিনের। সুতরাং বাগবাজারকে নিয়ে রচিত প্রবাদে ময়রাদের প্রথমেই উল্লেখ স্বাভাবিকই হয়েছে স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া কলাকারদের প্রসঙ্গ যে উল্লিখিত হয়েছে তাও অযৌক্তিক হয়নি। কালীমন্দির খ্যাত কালীঘাট বিষয়ক প্রবাদে কালী অনুল্লিখিত থাকলেও উল্লিখিত হয়েছে কাক, কাঙালী আর ভাটদের প্রসঙ্গ—

কাক, কাঙালী, ভাট।
তিনে কালীঘাট ॥

কুমারটুলি প্রতিমা নির্মাণের এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এই অঞ্চলকে নিয়ে রচিত প্রবাদে তাই গুরুত্ব পেয়েছে রং, মাটি, আর তুলি অর্থাৎ প্রতিমা নির্মাণের উপাদানগুলি—

রং মাটি তুলি
তিনে কুমারটুলি।

আজ দক্ষিণ কলকাতার অন্তর্গত চেতলার চাল চিঁড়ের জন্য তেমন প্রসিদ্ধি না থাকলেও একসময়ে চেতলার হাটে চাল চিঁড়ে ইত্যাদির বোধকরি প্রাচুর্য ছিল তাই বলা হয়েছে একটি প্রবাদে—

চাল চিঁড়ে ঝ্যাতলা
তিন নিয়ে চেতলা ॥

চেতলা কেন্দ্রিক অন্য একটি প্রবাদে চেতলার বিখ্যাত হাট উল্লিখিত হয়েছে—

আশীর্বাদ করি মাথার কাটে।
মেগে খাওগে চেতলার হাটে ॥

বন্দরের উপস্থিতির কারণে খিদিরপুরের বিশেষ পরিচিতি। খিদিরপুর কেন্দ্রিক প্রবাদে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করার—

জাহাজ তুলি চিটেগুড়
এই তিন নিয়ে খিদিরপুর

অপর একটি প্রবাদে খিদিরপুরের সর্ব প্রদেশীয় মানুষের বসতির প্রসঙ্গ এসেছে—

উড়ে মেড়ো নাগপুর
এই তিন নিয়ে খিদিরপুর।

বেহালা সংক্রান্ত প্রবাদে প্রাচীন এই জনপদটি নিন্দিত হয়েছে নিদারুণ ভাবে—

খানা খন্দ হোগলা।
এ তিন নিয়ে বেহালা ॥

কিংবা মশা, মাছি, ময়লা।
এ তিন নিয়ে ব্যায়লা ॥

বেহালার মশার সুবাদে খ্যাতি আজও অটুট রয়েছে!

বেলেঘাটায় পুঁজিপাটাহীন মানুষকে পুনর্বাসন লাভের জন্য উপস্থিত হবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—

যার নেই পুঁজিপাটা।
সে যাক বেলেঘাটা ॥

গ. ছড়ায় ঃ

কলকাতাকে নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছড়া রচিত হতে দেখা যায়নি। একটি ছড়ায় কলকাতায় ছেঁড়া কাঁথা অন্ততঃপক্ষে সুলভ বলে বলা হয়েছে—

যা বুড়ী তুই কোলিকাতা
সেথা পাবি ছেঁড়া কাঁথা ॥

ছড়াটি বর্ধমানের। ওপার বাংলার ছড়ায় কলকাতা উল্লিখিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে অথবা দূরত্বের প্রতীক রূপে—

হাঁড়ি ঢুনঢুন পাতিলা ঢুনঢুন ডেয়া ফেলে চোরে।
কৈলকাতাতুন কি বৌ আনলুম সদা পরাণ পুড়ে ॥

প্রকারান্তরে এক্ষেত্রেও কলকাতা নিন্দিতই হয়েছে। অপর একটি ছড়ায় বলা হয়েছে—

কৈলকাতার তুন গধা আইস্যে কলকী হাতত লই।
ধেছুয়া বোলে তরুৎ তারুৎ ডেয়াএ বোলে হাম্বা।
মুসলমানর সত্য কথা সাড়ে তিন হাত লম্বা।

ঘ. ধাঁধায় ঃ

বাংলা ধাঁধাতেও কলকাতা উল্লিখিত হয়েছে, তবে কলকাতাকে নিয়ে পৃথক কোনো ধাঁধা রচিত হতে দেখা যায়নি। অর্থাৎ এমন কোনো ধাঁধার

সন্ধান মেলে না যেখানে কলকাতা উত্তর হিসাবে দেখা যেবে। হুঁকা নিয়ে রচিত ধাঁধাগুলিতে 'কলকাতা' কখনও কলকের বিকল্প হিসাবে, কখনও বা দূরত্বের প্রতীক রূপে উপস্থাপিত।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে—

ঢাকা দি লাগ্যে আগুন
কেল্‌গাতা গেইএ পোড়া
শঙ্খনদী ভুট ভুটাইএঁ
নল্‌ উলা দি ধাইএ ধুঁয়া।

বীরভূমের হুঁকা বিষয়ক ধাঁধাটিতে বলা হয়েছে—

কলিকাতায় আগুন লাগল
গোটা তমলুক পুড়ে গেল
কাঠে কাঠে খবর গেল
নারকেল ডাঙ্গায় ধোঁয়া হইল।

ফরিদপুরের সমবিষয়ক ধাঁধাটি হল -

জলের মধ্যে লগি পোতা,
তাহার উপর কলিকাতা।

২৪ পরগণা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ধাঁধায় উল্লিখিত হয়েছে—

গাঙের মধ্যে কোঁড় পোতা,
তারি মধ্যে কলিকাতা ;
এমন শোলক জানি
তার পুনটি ধরে টানি।

সিংভূম থেকে লব্ধ ধাঁধাটি হল—

ডুগডুগি বাজারে লাগলো নিয়া
কলিকাতায় উঠলো ধুঁয়া,
মেদিনীপুরে হুলাহুলি
দাঁতন দিয়ে গেল বাহারি।

সবশেষে কলকাতা থেকে পাওয়া হুঁকা বিষয়ক ধাঁধাটির উল্লেখ করা গেল—

কোলকাতাতে লাগল আগুন
তমলুক গেল পুড়ে,
কাঠখানি থেকে বেরুল ধোঁয়া
নারকেল ডাঙ্গা ফুঁড়ে।

'ক', ব্যঞ্জন বর্ণের এই প্রথম বর্ণটি নিয়ে রচিত একটি ধাঁধাতে 'কলকাতা' উল্লিখিত হয়েছে এইভাবে—

কলিকাতায় আছি আমি সিলেটেতে নাই,
ঢাকার শেষে আবার শেষ দেখাটা পাই।
আলিম মিয়া কহে বুঝে দেখ ভাই,
এ, বড় আশ্চর্য কথা পণ্ডিতের বুঝা দায়।

এইভাবে বাংলা লোক-সাহিত্যের বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করে আছে 'কলকাতা'। গ্রাম বাংলার মানুষের বিচিত্র কল্পনা এবং অভিজ্ঞতার কথা কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনটি বাংলা দেশের অন্য কোন শহরকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়নি। সেদিক দিয়েও কলকাতা নগরীর গুরুত্ব একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্।



বিদেশী হয়েও ভারতীয়

রবীন্দ্রনাথ নির্বিশেষে ইংরেজ বিরোধিতার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং তিনি ইংরেজদের মধ্যে বড়ো ও ছোট দুটি বিভাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বড়ো ইংরেজদের অনুরাগী ছিলেন। আমরা বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে এমনই একজন বড়ো ইংরেজের পরিচয় লাভ করব—এঁর নাম J. D. Anderson। পুরো নাম জেমস্ ড্রামণ্ড এণ্ডার্সন।

জেমস্ ড্রামণ্ড এণ্ডার্সনের জন্ম বাংলা দেশে। তাই তিনি নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন। বঙ্গদেশকে 'জন্মভূমি' বলে তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতেন। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন বাংলা দেশের সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত। শৈশবে আট নয়টি বৎসর বাংলা দেশেই তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল। এণ্ডার্সন পত্রে অনেক সময় 'শ্রী ইন্দ্রসেন' বলে স্বাক্ষর করতেন। বাংলা অক্ষর, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল অন্তরের অনুরাগ। এদেশীয় পরিচিত বন্ধুদের তিনি অনেক সময়ে বাংলাতেই পত্র লিখতেন। এণ্ডার্সনের হাতের বাংলা অক্ষর ছিল খুব সুন্দর।

এণ্ডার্সন ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই বহু ভাষাবিদ্। বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় ছিল তাঁর দখল। এদেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে তিনি হিন্দী, অসমীয়া প্রভৃতিতে পারঙ্গম ছিলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর ছিল পূর্ণ অধিকার। রাজকর্ম উপলক্ষ্যে এণ্ডার্সনকে আসাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে অতিবাহিত করতে হয়েছে। সরকারের তরফে ইনি বড ভাষার ব্যাকরণ ও বড কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। জার্ণাল অব দি রয়েল এশিয়াটিক

সোসাইটি'তে বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে বাংলা উচ্চারণ রীতি, বাংলা কর্মবাচ্য, বাংলা ভাষায় ভোট বন্ধ (বড) ইত্যাদি বিষয়গুলি।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এণ্ডার্সনকে ডি. লিট্ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে। এদেশের সরকারী কাজ থেকে ইনি অবসর নিয়ে কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক পদে বৃত হন। ইংলণ্ডে ইংরেজদের মধ্যে তাঁর মত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্ দৃষ্টি গোচর হয়নি বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা সাহিত্যের প্রতি ইংরেজ লেখকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে এবং বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারে তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। লণ্ডনের সুবিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকার জন্য এণ্ডার্সন বহু বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছেন। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই বাঙ্গালা প্রেমিক মানুষটির কৃত সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'বাঙ্গালার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে পূর্ণ ইঁহার সমালোচনা-গুলি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।'

এণ্ডার্সন ইংলণ্ডে অবস্থান কালে সর্বান্তঃকরণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন। ইংরেজ শিক্ষার্থীদের জন্য ইনি রচনা করেছিলেন বাংলা ভাষায় একটি ব্যাকরণ ও পাঠমালা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় A Manual of the Bengali Language নাম দিয়ে Cambridge guides to Modern Languages গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করে পুস্তকখানিকে প্রকাশ করেছেন।

বাঙ্গালা নিছক প্রাচ্য ভাষাসমূহের অন্যতম একটি ভাষা নয়, কিংবা বাঙ্গালা সাহিত্য আধুনিকতা বর্জিত গতিহীন নয়, এটি নিছক Oriental language নয়, তার থেকেও বেশি, বাঙ্গালা যাতে Modern language হিসাবে সমাদৃত হয় সেজন্য তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। লণ্ডন টাইমসের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে এণ্ডার্সন লিখেছি.লন—

"It happens that the first volume of a new series of cambridge Guides to Modern Languages is a little manual of the Bengali Language. It is much to be hoped that this is a tacit academical recognition of the fact that our forty five millions of Bengali fellow subjects possess a great modern literature already comparable with those of the nations of Europe, and full of a promise which in some western

nations has for the time being ruined by the political and social results of war ··novels,...a' modern form of literary art in which Bengal stands apart from other Indian nations and provinces, a new modern literature which deserves the same attentive and respectful study that we give to the fiction of France and Germany"

এণ্ডারসন আরও সংযোজন করেছিলেন—'Surely we should be proud that in the British Empire we have now at least two great literature.'

বাংলা লোক-সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসেও এই বাঙ্গালী প্রেমিক মানুষটির একটি সম্মানের আসন নির্দিষ্ট রয়েছে। চট্টগ্রামের উপভাষার নিদর্শন রূপে চট্টগ্রামে প্রচলিত ৩৫২টি প্রবাদের ইংরেজি অনুবাদ টিপ্পনী সহ এণ্ডারসন প্রকাশ করেছিলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। এণ্ডারসন সংকলিত প্রবাদ গ্রন্থটির নাম "Some Chittagong Proverbs"। এছাড়াও উল্লেখ্য তাঁর 'A Collection of Kachari Folktales and Rhymes' গ্রন্থটি (শিলং, ১৮৯৫)। কাছাড়ি উপজাতীয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত কিছু লোক কাহিনী ও ছড়া এতে সংকলিত হয়েছে। এণ্ডারসনের কৃতিত্ব তিনি সংকলিত লোক-কাহিনীগুলির মূল পাঠ এবং সেগুলির অনুবাদ দুইই সংযোজিত করেছেন। লোক-সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গস্বরূপ এণ্ডারসন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি, বরং তিনি কাছাড়ি ভাষার অনুশীলনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এমন কিছু লোক-কাহিনী এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে যার ফলে লোকসংস্কৃতি বিদ্‌গণের কাছে গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবহ হয়ে উঠেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে এণ্ডারসনের সম্পর্ক ছিল এবং অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তিনি তা বলতেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত peoples of India নামক পুস্তিকাতে সাহিত্য পরিষদের কার্যাবলীর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। এণ্ডারসনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের। আচার্য সুনীতি কুমারের সঙ্গেও এণ্ডারসনের গভীর সম্পর্ক ছিল। সদানন্দময় মিষ্টালাপী, কোমল প্রকৃতির এই মানুষটির সারল্য ও বিনয় ছিল তাঁর

চরিত্রের ভূষণ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর এই মহান ইংরেজটির মৃত্যু হয়। এণ্ডার্সনের মৃত্যুতে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় লেখা হয়—'বাংলা সাহিত্যের পরম বন্ধু বহু ভাষাবিৎ সুরসিক ও সহৃদয় সাহিত্যাচার্য জেমস্ ড্রামণ্ড এণ্ডার্সনের মৃত্যু হইয়াছে।'

আচার্য সুনীতিকুমার এণ্ডার্সনের সমাধিতে প্রদানের জন্য পুষ্প প্রেরণ করে এই মহান বাংলা ভাষা প্রেমিক মানুষটির প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। সেই সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে লিখিত ভাবে জানিয়েছিলেন, 'ইহার পরলোক গমনে পরিষদের এক আন্তরিক হিতৈষীর অভাব ঘটিল সন্দেহ নাই। ইঁহার মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করিয়া ইঁহার পরিবার বর্গকে সমবেদনা জানান কর্তব্য।'



মুখোশের ব্যবহারিক দিক ও নির্মাণ শৈলী

মুখোশ ব্যবহারের মুখ্য কারণ আত্ম পরিচয়কে গোপন রাখা। "a mask is a form of disguise. It is an object that is frequently worn over or in front of the face to hide the identity of a person and by its own features to establish another being."

এখনও ডাকাতরা অনেক সময় নিজেদের পরিচিতি গোপন রাখতে মুখোশ পরিধান করে ডাকাতি করতে বেরোয়। যাদুক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেও মুখোশ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈরী অপদেবতাদের সন্তুষ্ট করার একটি পথ ছিল কাল্পনিক আকৃতি অনুযায়ী মুখোশ তৈরী করে মুখোশধারীকে সন্তুষ্ট করা। নানাপ্রকার অসুখ-বিসুখের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবেও মুখোশ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। চীন দেশের শিশুদের হামের হাত থেকে বাঁচাতে কিংবা কলেরার প্রকোপ থেকে বাঁচাতে মুখোশ পরিধান করানোর রেওয়াজ রয়ে গেছে। যুদ্ধেও মুখোশ ব্যবহারের প্রথা ছিল। খেলাধূলাতে মুখোশ ব্যবহারের প্রথা আছে। অনেক খেলায় বিপদাশঙ্কা আছে। বিপদের ঝুঁকি থাকলে আত্মরক্ষার জন্যই মুখোশ ব্যবহার করে মানুষ। যেমন স্কী খেলায় কিংবা বাস্কেট বল খেলায় মুখোশ ব্যবহারের রেওয়াজ রয়েছে। উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত আচার অনুষ্ঠানে মুখোশ ব্যবহৃত হয়। শস্য মুখোশের ব্যবহার এখনও রয়েছে। এই মুখোশ ব্যবহৃত হয় দ্বিবিধ কারণে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে এবং ভবিষ্যতে প্রভূত পরিমাণে ফসল লাভের আশায়। মুখোশ নৃত্যে মেঘ, বৃষ্টির দেবতা, নক্ষত্র, পৃথিবী, আকাশ এ সকলই উপস্থাপিত

হয় প্রতীকী রূপে। বিচারপতিরা অনেক সময় মুখোশ ব্যবহার করেন প্রত্যভিযোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার অভিপ্রায়ে।

আমরা বিশেষভাবে লোকনাট্যে, লোকনৃত্যে মুখোশের ব্যবহার নিয়েই পর্যালোচনা করব।

মুখোশের ব্যবহার হয়ে আসছে সুপ্রাচীনকাল থেকেই। বলা হয়, প্রস্তরযুগ থেকেই এর ব্যবহার প্রচলিত। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নাট্যাভিনয়ে মুখোশ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তবে পাশ্চাত্য দেশে বিশেষভাবে নাট্যাভিনয়ে মুখোশের ব্যবহারের মূলে গ্রীসে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত মুখোশের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। গ্রীসে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ক্রমে রূপান্তরিত হয় আনুষ্ঠানিক নাটকে। ঐরূপ নাটকে মুখোশের ব্যবহার ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। মুখোশগুলি নির্মিত হত চামড়া অথবা চিত্রিত ক্যাম্বিসে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রতিটি গ্রীক ট্রাজেডিতে অংশ গ্রহণকারী অভিনেতার সংখ্যা তিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অথচ নাটক মাত্র তিনটি চরিত্র নিয়ে রচিত হয় না, সেখানে অনেকগুলি চরিত্রের প্রয়োজন। ফলে এই সমস্যার সমাধানে মুখোশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। একই ব্যক্তি একাধিক চরিত্রে সহজে অভিনয় করতে পারত শুধুমাত্র মুখোশ পরিবর্তন করে এবং পোশাকের পরিবর্তন ঘটিয়ে। মধ্যযুগে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রহস্য নাটকে মুখোশ ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় নিয়ম করেই। শয়তান, অসুর, ড্রাগন, সপ্তরিপু প্রভৃতিদের মঞ্চে মুখোশের সাহায্যে মূর্ত করে তোলা হত। জাপানের না-নাটক (No drama) যা নাকি উদ্ভবে এবং বিষয়ে গ্রীক নাটকের সমগোত্রীয় বলে বিবেচিত হয়, যার সূচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দী, তাতে ঐতিহ্যানুসৃত ১২৫ ধরণের না-মুখোশ (No mask) ব্যবহৃত হয়। এই ১২৫ ধরণের মুখোশকে বয়স্ক ব্যক্তি (স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই), দেব, দেবী, শয়তান এবং উপদেবতা বা ভূত এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। তিব্বতে ধর্মীয় নাটকে অংশ গ্রহণকারী অভিনেতারা আবশ্যিক ভাবে মুখোশের ব্যবহার করে থাকেন। রক্তিম ব্যাঘ্রমুখী শয়তানের নৃত্যে (Dance of the Red Tiger Devil) লামা বা ধর্মগুরুগণ ভীতি-সঞ্চারকারী দেবতা ও দৈত্যদের মুখোশ ব্যবহার করেন। চীনেও সতর্কতা-সূচক নাটকে মুখোশ ব্যবহারের চল রয়েছে। চীনের উপদেশমূলক ধর্মীয় নাটকে কুশীলবগণ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হাস্যোদ্দীপক মুখোশ পরিধান করেন। জাভা এবং বালীতে কাঠের তৈরী মুখোশ টুপেং (Tupeng) নামে পরিচিত। এই টুপেং ওয়াংওং (wayang wong) নামক

নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত হয়। ওয়াংওং প্রকৃতিতে নৃত্যনাট্য। নিছক বিনোদনের কারণে এই নৃত্যনাট্যের আয়োজন হয় না, সেইসঙ্গে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যও এতে থাকে।

আমরা যারা মুখোশকে নিছক শিল্প নিদর্শন (Art object) বলে মনে করি, তাদের কাছে মুখোশের কিংবা যেসব উপাদানের সাহায্যে মুখোশ নির্মিত হয় সে'গুলি সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতূহল বোধ ছাড়া আর কিছু আশা করা যাবে না। কিন্তু যাঁরা মুখোশের নির্মাতা, কিংবা যেসব শিল্পী মুখোশ ব্যবহার করেন, তাঁদের কাছে মুখোশের গুরুত্ব অন্যবিধ। সর্বপ্রাণবাদতার সূত্রে আমরা জানি জৈব অথবা অজৈব সকল কিছুর মধ্যেই প্রাণের অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে। এই ভাবেই বিশ্বাস গড়ে উঠেছে যে মুখোশও এক ধরণের স্পিরিট, পাওয়ার বা শক্তির আধার। তাই মুখোশ নির্মাতা যেমন মুখোশ নির্মাণের সময়ে নানা বিধি-নিষেধ বা সংস্কার মেনে চলেন, তেমনি ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রেও নানা বিধি-নিষেধ বা সংস্কার অনুসৃত হতে দেখা যায়। কোন কোন সাংস্কৃতিক বলয়ে এমন বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে মুখোশ নির্মাতার সঙ্গে মুখোশের সত্তার নৈকট্যের কারণে শিল্পী বা নির্মাতা কিছু ঐন্দ্রজালিক বা অপার্থিব শক্তিরও অধিকারী। এই একই বিশ্বাসের অঙ্গীভূত—শিল্পী যদি ঐতিহ্যানুসরণে মুখোশ নির্মাণ না করেন তবে নির্দিষ্ট মুখোশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্পিরিটের বিরাগভাজন হতে হয় তাঁকে। গম্ভীরায় ব্যবহৃত মুখোশ পুরুষানুক্রমে শুধু রক্ষিতই হয় না, সে'গুলি পূজিতও হয়। ব্যবহারের পূর্বে নবতররূপে নির্মিত মুখোশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া হয়. মুখোশ পরিধানের সময়ে ব্যবহারকারী মুখোশকে প্রণাম করে নেয়। মুখোশের ব্যবহার শেষ হয়ে গেলে তাকে অন্যসময়ে গৃহের কোন উচ্চস্থানে স্থাপন করে নিয়মিত ভাবে ধূপধূনা ও প্রদীপ জেলে অর্চনা করা হয়। উড়িষ্যায় প্রহ্লাদ নাটকে যে নরসিংহ মুখোস ব্যবহৃত হয়, তাতে পুরোহিত নট ফুল নিক্ষেপ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, মুখোশকে প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করাও হয়ে থাকে। পশ্চিম দিনাজপুরে 'রাম-বনবাস' পৌরাণিক যাত্রায় যে হনুমানের মুখোশ ব্যবহৃত হয়, ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্ত থাকায় এই মুখোশ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং রক্ষিত হয়।

নানা উপলক্ষ্যে যেমন মুখোশের ব্যবহার, মুখোশের যেমন দেশেভেদে নানা বৈচিত্র্য, তেমনি মুখোশ নির্মাণের উপকরণের ক্ষেত্রেও নানা বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সাধারণভাবে এমন সব উপাদান মুখোশ নির্মাণে ব্যবহৃত হয় যেগুলি সুলভ এবং ওজনেও হাল্কা। মুখোশ নির্মিত হয় ব্যবহারিক

কারণে। তাই মুখোশ যদি খুব ভারী হয়, তবে এর ব্যবহারকারীর পক্ষে খুব অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায় তা। মুখোশ ব্যবহারকারীর সুবিধার্থেই মুখোশকে হাল্কা করা হয়। উপকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে সুলভ উপকরণাদির ওপরেই মূলতঃ নির্মাতারা নির্ভর করেন। তাছাড়া স্থানীয় অঞ্চলের আবহাওয়া বা পরিবেশও মুখোশ তৈরীর উপাদানে প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা প্রথমে অন্যান্য দেশের মুখোশ নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণাদির কিছু পরিচয় গ্রহণে করতে পারি। '

আফ্রিকার টোটেম মুখোশ নির্মাণ করা হয় আবলুস কাঠ থেকে। আবার কঠিন বা শক্ত কাঠও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পশ্চিম মেলানিশিয়ায় পূর্ব পুরুষ সম্বন্ধীয় আনুষ্ঠানিক মুখোশ নির্মিত হয় কাষ্ঠের সাহায্যে, সেই সঙ্গে ব্যবহৃত হয় ঝিনুক, তন্তু বা সূক্ষ্ম সূত্র জীবজন্তুর চামড়া, বীজ, ফুল এবং পালখ। নিউ গিনির পাপুয়ায়া Hevehe বলে বিশালাকৃতির এক ধরণের মুখোশ নির্মাণ করে। ঐগুলির উচ্চতা হয় কুড়ি ফুটের মতন। এ'গুলি নির্মিত হয় তালজাতীয় বৃক্ষের কাঠ থেকে। কালো কাপড়ে এগুলিকে আবৃত করা হয়ে থাকে। নিউ গিনিতে মুখোশ তৈরীতে ব্যবহৃত হয় নারকেল, ঝিনুক, সূক্ষ্ম তন্তু যা তালজাতীয় বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত হয়।

জাপানের না-নাটকে (No-drama) ব্যবহৃত হয় যে না-মুখোশ (No mask) তা নির্মিত হয় কাঠের সাহায্যে। তবে কাঠের ওপর প্ল্যাসটারের একটা প্রলেপ দেওয়া হয় একে ঔজ্জ্বল্য দান করতে। প্রচলিত ঐতিহ্যানুসারী রঙই এই সব মুখোশে ব্যবহৃত হয়। তিব্বতে যে ধর্মীয় নাট্যানুষ্ঠানের (Sacred dramas) আয়োজন করা হয়, তাতেও অংশ-গ্রহণকারী শিল্পীরা মুখোশ ব্যবহার করেন। এইসব মুখোশ প্রস্তুত হয় কাপড়, গিল্টি করা তামা, ইত্যাদি দিয়ে। সিকিম এবং ভুটানে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পাওয়া যায়। তাছাড়া এই অঞ্চলের আবহাওয়া খুব স্যাঁতসেঁতে, ফলে সহজেই কাগজ নষ্ট হয়ে যায়। তাই এতদঞ্চলে মুখোশ নির্মিত হয় কাঠ দিয়ে, অবশ্যই এ'কাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

মালদহের মুখোশ যা 'মুখা' নামে পরিচিত, পূর্বে তা মূলতঃ প্রস্তুত হত নিম বা ডুমুর কাঠের সাহায্যে। বর্তমানে 'মুখা' নির্মিত হয় মাটি দিয়ে, কোথাও কোথাও শোলা বা কাগজের মণ্ড দিয়ে। পলিয়া-দেশী সমাজে প্রচলিত গম্ভীরা খেলায় 'মোখা' নামে যে মুখোশের ব্যবহার প্রচলিত তা আবার মাটি দিয়ে নির্মিত হয় না, প্রস্তুত হয় ছাতিম গাছের

কাঠের সাহায্যে। জলপাইগুড়ি জেলায় 'মুখা' বা মুখোশ প্রস্তুত হয় কাঠ, লাউ, পোড়া মাটি, পুরু কাগজ, পাতলা শোলা ইত্যাদির সাহায্যে। উত্তরবঙ্গে বহুল প্রচলিত লোকনাট্য চোর-চুরণীতে শোলার মুখোশ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি থানার অন্তর্গত চোড়দা বা চড়িদা গ্রাম ছৌনাচে ব্যবহৃত মুখোশ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। বিখ্যাত ছৌনৃত্যে ব্যবহৃত আকর্ষণীয় ও আভিজাত্যপূর্ণ মুখোশগুলি নির্মাণে ব্যবহৃত হয় যেসব উপাদান সেগুলি হল মাটি, পুরণো খবরের কাগজ, পুরনো কাপড়, ময়দার আটা, স্থানীয় ভাবে প্রস্তুত কিছু রঙ, গর্জন তেল, ধুনো, পাঁট, ময়ূর পাখা, পাখির পালখ রাংতা, পুঁতি, জামিরা পাতা, সলমা চুমকি, শুষ্ক ঘাস, 'কিরণ পোখরি', নানাবর্ণের চীনা কাগজ ইত্যাদি। মুখোশ হাল্কা করার অভিপ্রায়ে ইদানীং প্রচুর পরিমাণে কাগজের মণ্ড ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ কেউনঝড় ও বালেশ্বর জেলায় যে ছৌনাচ প্রচলিত আছে তাতে ও মুখোশ ব্যবহৃত হয়, পূর্বে তা নির্মিত হত মাটির সাহায্যে, ইদানীং মাটির পরিবর্তে কাগজ ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মুখোশের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে জাগে ছৌ এবং গম্ভীরার প্রসঙ্গ। প্রথমটি পুরুলিয়া জেলার, দ্বিতীয়টি মালদহের। ছৌ-এর মুখোশের সুনাম এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। আমাদের মধ্যেও অনেকেরই ড্রইংরুম সজ্জার উপকরণ হয়েছে ছৌ-এর মুখোশ। বাগমুণ্ডির চোড়দা বা চড়িদায় যাঁরা ছৌ এর মুখোশ নির্মাণ করেন, তাঁরা সূত্রধর। অবসর সময়ে এঁরা কাঠের কাজ করেন। সাধারণতঃ পৌষ মাঘ মাস থেকেই মুখোশ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। চলে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। বৃষ্টিপাতের পর মুখোশের কাজ বন্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে ছৌ-এর মুখোশ নির্মাতারা মুখোশ নির্মাণের ব্যাপারে কারো কাছে শিক্ষানবিশী করেন না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এঁরা মুখোশ নির্মাণের কলাকৌশল আয়ত্ত করেন। শিল্পীরা মুখোশ নির্মাণে কোন ছাঁচের সাহায্য গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ প্রতিটি মুখোশ এঁরা পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের হাতে প্রস্তুত করেন। ছৌ-এর মুখোশ তৈরীর কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তর বিদ্যমান। স্তরগুলি হল যথাক্রমে মাটি গড়া, —কাগজ চিটানো,—কাবিজ লেপা,—কাপড় সেটানো—ফেপি পালিশ—খুর্শান খোঁচা এবং সর্বশেষ পর্যায়ে সাজানো। ছৌ-এর মুখোশ নির্মাণে যেসব যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল বাটালি, হাতুড়ি, কাঁচি, কয়েকটি নরুণ, দুএকটি কাটারি এবং কিছু ছুঁচসুতো। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ছৌ-এর মুখোশ নির্মাণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'মুখোশ

নির্মাণের যে অভিনব পদ্ধতি তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা ভারতবর্ষে আর কোথাও প্রচলিত নাই।'

গম্ভীরার মুখোশ সবসময়ে ব্যবহৃত হয় না, মুখোশহীন গম্ভীরার সন্ধানও আমাদের অজানা নয়। চরিত্রের বিচারে গম্ভীরার মুখোশগুলিকে বিশেষজ্ঞগণ সাধারণ, ঐন্দ্রজালিক এবং লোকায়ত এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। পইরী, সিংহ, ভাল্লুক, ব্যাঘ্র, হনুমান, হরিণ ইত্যাদি সাধারণ শ্রেণীর। ঐন্দ্রজালিক শ্রেণীভুক্ত হল নারসিংহী, চামুণ্ডা, গৃধিনীবিশাল, কালী ইত্যাদি আর লোকায়ত শ্রেণীভুক্ত হল বক, চাষা-চাষী, মহিষ রাখাল, গরুর দুগ্ধদোহন, কলসীসহ বধূ, টাপা ইত্যাদি। উল্লেখ করা যেতে পারে, নারসিংহীর মুখোশ, গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যের সর্ববৃহৎ মুখোশ। চামুণ্ডার মুখোশ কালীর অনুরূপ। সরাইকেলার মুখোশ ব্যবহারকারীর মুখকে সম্পূর্ণ আবৃত করে না। ব্যবহারকারীর চোখ এবং নাক উন্মুক্ত থাকে। অপর পক্ষে পুরুলিয়ার মুখোশে নাক এবং চোখের জন্য ছিদ্র থাকে।

হরিদাস পালিতের লেখায় মালদহের মুখোশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, 'মুখার উর্ধ্বদিকে এবং পশ্চাদংশে একটি এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকে, সেই রজ্জুদ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর্ণ বেষ্টন করিয়া পাগড়ী বাঁধা হয়।'



বাংলা লোক-সাহিত্যে জীব জন্তু

শুধুমাত্র ভাবের গভীরতা, স্বভাব কবিত্ব এবং অনুপম রচনাশৈলীই নয়, সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও বাংলার সুবিস্তৃত লোক-সাহিত্যকে রসিক পাঠক সমাজের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। বাংলা লোক-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে নানাবিধ বন্যপ্রাণী, জন্তু ও জানোয়ার। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভের চেষ্টা করব।

লোক-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য বিভাগ ধাঁধা। নরনারী, প্রকৃতি, প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত নানাবিধ তৈজস পত্রাদি প্রভৃতি অবলম্বনে যেমন বিপুল সংখ্যক ধাঁধা বাংলায় রচিত হয়েছে, তেমনি নানাবিধ পশু-পক্ষী অবলম্বনে রচিত বেশ কিছু ধাঁধারও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলায় পাখী অপেক্ষা পশু সংক্রান্ত ধাঁধার সংখ্যাই অধিক। অথচ উল্লেখযোগ্য, তুলনামূলক বিচারে বাংলা দেশে পশু অপেক্ষা পাখীর সংখ্যা কিংবা তাদের মনোরম বৈচিত্র্য নেহাৎ কম নয়। পশুদের মধ্যে আবার গরু সংক্রান্ত ধাঁধার সংখ্যাই সর্বাধিক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গরু একান্ত পরিচিত ও অপরিহার্য প্রাণী। তাই স্বভাবতঃই গাভী সংক্রান্ত ধাঁধার আধিক্য লক্ষিত হয়। গরু সংক্রান্ত ধাঁধাগুলিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে গরুর বাঁট, গরুর খুঁটি, গরুর লেজ, শিং প্রভৃতি। যেমন—

(ক) চারটে ঘড়া উপুড় করা
তার মধ্যে মধু পুরা। (গরুর বাঁট)

(খ) ছাই ছাই লটকা,
তিন দুয়ার ঝলকা। (গরুর লেজ)

(গ) আগাত ডেম্ ডেম্ না মেলে পাতা,
যে ভাঙ্গি দিত্না পারে তে জম্মের গাধা। (গরুর শিং)

কুকুর ও বেড়াল —এই দুটি প্রাণীর সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা সত্ত্বেও এই দুটি প্রাণী অবলম্বনে কিন্তু তেমন উল্লেখ-যোগ্য সংখ্যক ধাঁধা রচিত হতে দেখা যায় নি। অথচ সামান্য ইঁদুর কাঠবেড়ালী কিংবা ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, বেঁজি, হরিণ, শুকর, শিয়াল, এমন কি হাতী, বাঘ প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার অবলম্বনে রচিত বহু ধাঁধা দেখতে পাওয়া যায়।

(ক) ওপরে মাটি, নীচে মাটি
চলেছে যেন বাবুর বেটাটি। (ইঁদুর)

(খ) বন থেকে বেরুল বাঘ
বাঘের গায়ে ছড়ির দাগ। (কাঠবেড়ালী)

(গ) আল গুড়গুড়ি যায় বুড়ী
ফিরে ফিরে চায়। (বেঁজি)

(ঘ) একটার উপর আর একটা যায়
কট্কটি নয় লোহা খায়। (ঘোড়া)

(ঙ) আজার বেটি ধুন্দল পেটি,
বিনা কোদালে খুঁড়ে মাটি। (শুকর)

(চ) উঁচু পোঁতা গজমাথা
হয় ডাল তার না হয় পাতা। (হরিণ)

(ছ) পথ বেয়ে বেয়ে যায়,
ফিরে ফিরে চায়। (শিয়াল)

সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। বাঘ বাঙ্গালীর পরিচিত জীব, অথচ বাঘ বিষয়ক ধাঁধার সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বাঘ সংক্রান্ত একটি ধাঁধার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে—

বনুলে বাইরাল মুড়া,
গায়ে বেল মহাজন বুড়া। (বাঘ)

পশু সংক্রান্ত ধাঁধাগুলিতে লক্ষণীয়, স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে জন্তু বিশেষের প্রকৃতি অথবা আকৃতির বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—কাঠবিড়ালীর

গায়ের দাগ, শূকরের মাটি খোঁড়া, হরিণের শিঙ, হাতীর স্থূলাকৃতির পা ইত্যাদি বিষয়গুলিই ধাঁধাগুলিতে স্থান পেয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে উট, ক্যাঙ্গারু, জিরাফ প্রভৃতির ন্যায় আরও বহুসংখ্যক বিচিত্র জন্তু-জানোয়ার আছে, যাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। অথচ সেগুলি অবলম্বনে ধাঁধা রচিত হয়নি। ধাঁধা সাধারণতঃ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সেইসঙ্গে একান্ত পরিচিত বিষয় অবলম্বনেই রচিত হয়ে থাকে। জিরাফ, উট, ক্যাঙ্গারুর ন্যায় জন্তু অবলম্বনে যে কোন ধাঁধা রচিত হয়নি তার কারণ এই শ্রেণীর পশুগুলি বাংলা দেশের নয়, এগুলি সম্বন্ধে তাই এদেশের মানুষের ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। অথচ বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কিত প্রবাদের সংখ্যাধিক্যই কেবল নয়, সেই সঙ্গে বহু সংখ্যক বিচিত্র পশুকে স্থান দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পশু সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, পরবর্তীকালে প্রবাদগুলি রচনাকালে তা দূরীভূত হয়েছিল। সিংহ, হাতী, ভাল্লুক থেকে শুরু করে গাধা, ঘোড়া, গরু, খরগোশ, খেঁকশেয়াল, শেয়াল, ছাগল, ছুঁচো, ইঁদুর, উট প্রভৃতি হরেক রকম পশু অবলম্বনে অসংখ্য প্রবাদ রচিত হয়েছে।

ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে আমাদের বহুল পরিচিত কুকুর-বেড়ালকে তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হয় নি। কিন্তু সেই অভাব পূর্ণ হয়েছে প্রবাদের ক্ষেত্রে। আবার বেড়াল অপেক্ষা কুকুর সংক্রান্ত প্রবাদের সংখ্যাই অধিক। এর কারণ প্রবাদ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা প্রসূত রচনা। এদিক দিয়ে বিচার করলে বেড়াল অপেক্ষা কুকুর সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। আর সেই জন্যই কুকুর সংক্রান্ত প্রবাদের আধিক্য। কুকুর সংক্রান্ত প্রবাদ গুলিতে কুকুরের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষভাবে যেগুলি নিন্দনীয় সেগুলিই রূপায়িত হয়েছে। অথচ কুকুরের বিশ্বস্ততা, তীক্ষ্ন ঘ্রাণশক্তি কিংবা প্রভুভক্তির পরিচয় প্রবাদগুলিতে অনুপস্থিত। কুকুর সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধার করা গেল—

(ক) কুকুরের পেটে ঘি জরে না।

(খ) কুকুরে ঘি-ভাত দিলে বমি করে মরে।
গাবুরে পিঁড়া দিলে চিৎ হয়ে পড়ে॥

(গ) কুকুর রাজা হলেও জুতা খায়।

(ঘ) কুকুরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে।

(ঙ) কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে ডললেও সোজা হয় না।

(চ) কসাইয়ের কুকুর নাড়ীভুঁড়িতেই তুষ্ট।

বেড়াল সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে বেড়ালের আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতির ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে—

(ক) আগে ছিলাম ছোঁচা বেরাল, ধর্মে দিয়েছি মন।
তুলসী মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন।

(খ) এত রঙ্গ দেখলাম আমি বলাইয়ের ঘরে এসে।
মেনী বেরাল তুলো পেঁজে কলাবনে বসে ॥

বেড়াল ষষ্ঠীর বাহন বলে পরিচিত। একটি প্রবাদে সেই পরিচয়টিও প্রকাশিত হয়েছে—

(গ) ষষ্ঠীর বেড়াল।

বাঁদর অবলম্বনে তেমন উল্লেখযোগ্য ধাঁধা রচিত হতে দেখা যায় নি। কিন্তু এই প্রাণীটি প্রবাদের ক্ষেত্রে বেশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে—

(ক) আদরে বাঁদর।
(খ) কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে।
(গ) বানরের হাতে ফুলের মালা।

বাংলা লোক-কথায় শৃগালের প্রায় রাজকীয় আধিপত্য। লোক-কথায় শৃগালকে পশুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান প্রাণী বলে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু শেয়াল সম্পর্কিত প্রবাদগুলিতে তার ধূর্ততার দিকটি লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত—

(ক) বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা।
(খ) দিনে শেয়াল, রাতে গাই, ডাকলে গাঁয়ের রক্ষা নাই।
(গ) মারতে পারে না বন্দুক ঘাড়ে, শেয়াল দেখলে চিৎ হয়ে পড়ে।
(ঘ) কাগার শত্রু বগা, বগার শত্রু বাঘা। বাঘার শত্রু সিঙ্গি, সিঙ্গির শত্রু শেয়াল। শেয়ালের শত্রু মহাকাল।

কাঠবিড়ালী বিষয়ক প্রবাদে কাঠবিড়ালীর আকৃতি অথবা প্রকৃতি বিষয়ে কোন বক্তব্য প্রকাশের পরিবর্তে সীমিত শক্তিতে অসাধ্য সাধনের প্রয়াস সম্পর্কে সাধারণ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে—

(ক) কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধা।
(খ) কাঠবিড়ালীর বাগান ভাঙ্গা।

উট মরুভূমির জীব। পশু হিসেবে উট এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ।া হল তার পিঠের কুঁজ। একটি প্রবাদে এই বিষয়টি প্রকাশ করা

(ক) উটের পিঠে কুঁজ, উট জানে না।

উট প্রচুর পরিমাণে যে জল সঞ্চয় করার ক্ষমতা রাখে, আর একটি প্রবাদে তারও উল্লেখ দেখা যায়—

(খ) উটের পেটে জলের জালা, তবু তেষ্টায় ঝালাপালা।

হাতী সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে হাতীর স্থূলাকৃতি বিষয়েই বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে—

(ক) খেয়ে দেয়ে হাতী হওয়া।
(খ) খিড়কি দিয়ে হাতী গলে সদরে বাঁধে ছুঁচ।
(গ) কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকান।

ভাল্লুক আমাদের আর এক পরিচিত জীব। এই প্রাণীটি নাকি প্রায়ই জ্বরে ভোগে, আবার স্বাভাবিক নিয়মেই নিরাময় লাভ করে। একটি প্রবাদে তাই বলা হয়েছে—

(ক) ভালুকের জ্বর।

বেশ কিছু মানুষ ভাল্লুক নাচিয়ে পয়সা উপার্জন করে। বলাবাহুল্য ভাল্লুক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাচে না, তাকে নাচতে বাধ্য করা হয়। একটি প্রবাদে তাই এই বিষয়ে বলা হয়েছে—

(ঘ) ভাল্লুক কি নাচতে চায়, নাকে দড়ি দিয়ে নাচায়।

অনিচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য সম্পাদনে বাধ্য করানো উপলক্ষে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

পশুরাজ সিংহ বিষয়ক প্রবাদে সিংহের পরস্পর বিপরীতমুখী পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে—একদিকে তার শ্রেষ্ঠত্ব, অপর দিকে তার মূঢ়তা প্রবাদগুলিতে পরিস্ফুট

(ক) সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।
(খ) সিংহের সন্তান শৃগাল হয় না।

বাঘ সংক্রান্ত ধাঁধা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রচিত না হলেও প্রবাদের ক্ষেত্রে এই পশুটির অপ্রতিহত প্রতাপ লক্ষ্য করার মত—

(ক) আউলে বাঘ জালে পড়ে।
(খ) এক বনে দুই বাঘ।
(গ) কচুবনে খটাশ বাঘ।
(ঘ) বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।
(ঙ) বাঘে মোষে যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।

(চ) বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

(ছ) বাঘ বুড়ো হলেও রূপ ছাড়ে না।

গাধা বিষয়ক প্রবাদে বিশেষভাবে গাধার নির্বুদ্ধিতাকেই প্রকটিত করা হয়েছে। এছাড়া গাধা যে ভারবাহী পশু, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

(ক) আধা কইলে গাধাও বোঝে, সব কইলে কেনা বোঝে।

(খ) গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

(গ) গাধা সকল বইতে পারে, ভাতের কাঠি বইতে নারে।

(ঘ) ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ।

ছাগল সংক্রান্ত প্রবাদগুলিতে বিশেষ করে ছাগলের সীমিত শক্তি, তার নির্বুদ্ধিতা এবং সে যে সর্বভুক—এই সকল বিষয়ই স্থান পেয়েছে :

(ক) ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো।

(খ) ছাগল দিয়ে যদি হাল বইত, গরু লাগত না।

(গ) ছাগুলে বুদ্ধি।

(ঘ) ছাগলে কিনা খায়, পাগলে কিনা গায়।

বাংলা লোক-কথার তিনটি প্রধান বিভাগের অন্যতম উপকথা। উপকথায় যে দুটি পশু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে, সে দুটি পশু হল যথাক্রমে বাঘ এবং শৃগাল। বাঙালী যদিও সুন্দরবনের নরখাদক হিংস্র ও তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির অধিকারী বাঘের সঙ্গে পরিচিত, তথাপি বাংলা উপকথায় বাঘকে চরম নির্বোধ, ভীরু ও কাপুরুষ রূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। বলা যেতে পারে বাংলা উপকথায় বাঘ তার নিজস্ব ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট এক ভিন্নতর প্রাণীরূপেই চিত্রিত। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। 'নিরেট বোকা' গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে এক শিয়াল ছাগল ছানা খেতে গিয়ে রাখালদের হাতে ধরা পড়ে যায়। রাখালেরা শেয়ালটিকে বেঁধে রেখে যায় পরে তাকে মারবে বলে। ইতিমধ্যে সেখানে একটি বাঘ এসে হাজির। সে শেয়ালকে বাঁধা অবস্থায় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলে শেয়াল জানায় যে সে বিয়ে করার অপেক্ষায় সেখানে রয়েছে ; কিন্তু তার বিয়ে করার মোটেই ইচ্ছা নেই। বাঘ শেয়ালের কথা শুনে নিজে বিয়ে করতে চাইল। তাই শেয়ালের বাঁধন খুলে দিয়ে নিজে বাঁধা অবস্থায় রইল, পরে রাখালদের কাছে বেদম প্রহার খেয়ে বোকা বাঘ বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচাল।

আর একবার বাঘ বনের এক জায়গায় হাজির হয়ে দেখলে শেয়াল করাতীদের গোঁজ মেরে রাখা আধচেরা একটা কাঠের ওপর বসে রয়েছে। বাঘও কাঠটির ওপর গিয়ে বসলে। শেয়াল সুযোগমত গোঁজটিকে খুলে নিলে বাঘের লেজ কাঠের চেরা অংশে গেল আটকে। বাঘ লাফ দিতে তার লেজটাই গেল ছিঁড়ে। এরপর শেয়াল ও বাঘ দুজনে একটা কচুবনে গিয়ে হাজির হল। শেয়াল চালাকি করে বাঘকে কচু খাওয়ালে। বাঘের মুখ কুট কুট করতে লাগল। এরপর শেয়ালের কথা বিশ্বাস করে বাঘ নিজের হাত-পা চিবিয়ে মুখ সারাতে চেষ্টা করল। কিন্তু শীঘ্রই বাঘের মৃত্যু হল। অর্থাৎ বার বার প্রতারিত হয়েও বাঘের চৈতন্যোদয় হ'ল না। মৃত্যু-বরণের মধ্য দিয়ে তার নির্বোধ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। 'মামা-ভাগ্নে' গল্পটিতেও বেকুব বাঘকে শেয়ালের ছলনার জালে আবদ্ধ হয়ে অকালমৃত্যু বরণ করতে দেখা গেছে। একবার এক শেয়াল বাঘকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে কিছুই খেতে দিলে না। বাঘও শেয়ালকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে মোটা হাড় খেতে দিয়ে প্রতিশোধ নিলে। শেয়াল মনে মনে ঠিক করলে প্রতিশোধ নেবে। শেয়াল এক আখের খেতে খুব আখ খেত বলে চাষীরা তাকে ধরার জন্য একটা খোঁয়াড় তৈরী করলে। শেয়াল বাঘকে এসে বললে রাজার ছেলের বিয়েতে সে গাইতে যাবে। বাঘকে বাজাবার জন্যে শেয়াল আহ্বান জানালে। সে আরও বললে যে তাদের যাবার জন্যে রাজা স্বয়ং পাল্কী পাঠিয়েছেন। শেয়ালের কথা বিশ্বাস করে বাঘ আখের ক্ষেতে চাষীদের রাখা খোঁয়াড়কে পাল্কী মনে করে তার মধ্যে ঢুকতেই বন্দী হয়ে গেল। এরপর চাষীদের আঘাতে বাঘের মৃত্যু হল।

বাংলা উপকথায় বাঘকে এরূপ নির্বোধ রূপে চিত্রিত করার পেছনে পূর্ব-দক্ষিণ অর্থাৎ মালয়-ব্রহ্ম দেশের প্রভাবের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। সে যাই হোক, মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, যে বাঘের কারণে বাঙালী জীবন নানাভাবে পর্যুদস্ত (সুন্দরবন অঞ্চলের), বহু জীবন অকালে বিনষ্ট হয়, বাংলা উপকথায় তার জীবনের অভিশাপ রূপ সেই বাঘকে নির্বোধ ও প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে পরাজিত করে যেন অনেকাংশে তার প্রতিশোধ স্পৃহাকেই পূর্ণ করেছে।

পাশ্চাত্য সমালোচক Sten Konow অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে শিয়ালকে পণ্ডিত হিসাবে দেখাবার পশ্চাতে রয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির দান, অপর পক্ষে তার বিশ্বাসঘাতকতা Proto–Australoid জাতির প্রভাবের ফল।



বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের দান

কথায় বলে "মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশী।" অর্থাৎ যেখানে সন্তানের প্রতি বাঞ্ছিত অপত্যস্নেহের প্রকাশ মাতৃ হৃদয় থেকে উৎসারিত হওয়া কর্তব্য, সেখানে তৎপরিবর্তে মাসীর হৃদয় থেকে যদি সেই স্নেহ ও দুর্বলতার অভিব্যক্তি ঘটে, তখন সেটা কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয় সঙ্গত কারণে। কিন্তু এ' রকম অস্বাভাবিকতা বিরল হলেও অসম্ভব বোধ করি বলা যায় না। অসম্ভব যে বলা যায় না, তার প্রমাণ স্বরূপ বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের দানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা লোক-সাহিত্য বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদ সংরক্ষণ ও সংগ্রহে তাই বাঙ্গালীরই প্রয়াস যুক্ত হওয়া কর্তব্য এবং তা বাঙ্গালীর নিজেরই স্বার্থে। কিন্তু বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাঙ্গালীর তুলনায় এ' ব্যাপারে বিদেশীয়দের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য ভাবে যুক্ত হয়েছে—অবশ্য সেটা লোক-সাহিত্য চর্চার একেবারে প্রথম দিকে। সাধারণতঃ আমরা বলে থাকি যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ছড়া সম্পর্কিত আলোচনাকে কেন্দ্র করেই বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার শুভ সূত্রপাত ঘটেছিল ১৩০১ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অদ্বিতীয় আলোচনার মাধ্যমে বাঙ্গালীকে বাংলা লোক-সাহিত্য বিষয়ে অবহিত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারও বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ ও ক্ষেত্র বিশেষে তুলনামূলক আলোচনা। বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই চর্চায় বিদেশীয়দের দান বিষয়েই বিশেষভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে প্রবাদ এবং লোক-কথার সংগ্রহ এবং আলোচনাতেই বিশেষভাবে বিদেশীয়দের প্রয়াস যুক্ত হয়েছিল। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে অবশ্য ছড়া সংগ্রহের সূত্রে বিদেশীয়ের প্রয়াস লক্ষিত হয়।

গীতিকা সংগ্রহেও বিদেশীয় প্রয়াস যুক্ত হতে দেখা গেছে। কিন্তু অবিমিশ্র ধাঁধা, গান ইত্যাদি সংগ্রহ ও আলোচনায় বিদেশীয়দের কোন প্রয়াস যুক্ত হয় নি।

বাংলা ছড়া চর্চার ইতিহাসে উইলিয়াম কেরী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কেরী রচিত 'ইতিহাস মালা' (১৮১২) গ্রন্থের ১৫০ পঞ্চাশদধিক শততম কথায় সংশ্লিষ্ট 'মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা' শীর্ষক ছড়াটিকে কালানুক্রমিক হিসাবে প্রথম সংকলিত ছড়ার মর্যাদা দিতে হয়।

মনে রাখতে হবে ১৮১২ সালে গ্রীম ভায়েদের সংকলিত উপকথার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়, এই একই বৎসর উইলিয়াম কেরী প্রকাশ করেন 'ইতিহাস মালা'। এতে ক্ষুদ্র বৃহৎ দেড়শত গল্প সংকলিত হয়েছে, তন্মধ্যে অবিমিশ্র রূপকথার সংখ্যা আট। 'ইতিহাস মালা'য় সংকলিত রূপকথাগুলি হল ৪০, ৯৪, ৯৭, ১০৪ এবং ১৪১ সংখ্যক গল্পগুলি। এছাড়া উপকথাও সংকলিত হয়েছে 'ইতিহাস মালা'য়। কেরীর 'ইতিহাস মালা'য় ধৃত ২৩ সংখ্যক গল্পটি আমাদের বহুল পরিচিত শিয়াল পণ্ডিতের কাছে কুমীরের ছানাদের শিক্ষা লাভ সংক্রান্ত উপকথাটি। তাই শুধুমাত্র বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসেই কেরী স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রূপে অধিষ্ঠিত আছেন তাই নয়, বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাসেও তিনি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকবেন।

পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত বাঙ্গালী যখন অন্ধ পরানুকরণের মোহে আচ্ছন্ন, জাতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ যে লোক-সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতি তা ছিল অবহেলিত, সেই সময়ে রেভারেণ্ড উইলিয়াম মর্টন নামে এক বিদেশী পাদ্রী—'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' নামে প্রবাদের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে। এই সংকলনটিতে ৮০৩টি বাংলা প্রবাদ এবং ৭০টি সংস্কৃত প্রবাদের ইংরেজি অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে মর্টনকেই বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের প্রথম পথিকৃতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হয়। আর বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রবাদ সংগ্রহের মাধ্যমেই লোক-সাহিত্য চর্চার সচেতন সূত্রপাত হয়েছিল এই প্রসঙ্গে সেটা উল্লেখযোগ্য। মর্টন পরবর্তীকালে অর্থাৎ 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' প্রকাশের কয়েক বছর পরেই 'Calcutta Christian Observer' পত্রিকায় আরও দেড় শতাধিক বাংলা প্রবাদ প্রকাশ করেন [Christian observer ; vol IV, 1835 PP 1/7—7, 303—7, 532—37, 590—94]

মর্টন যে খুব সাহিত্য-রসিক ছিলেন তা কিন্তু নয়, আবার তিনি যে আমাদের দেশের সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন তাও নয়। মর্টন ছিলেন একজন সিনিয়র মিশনারী। এ'দেশে এসেছিলেন তিনি খ্রীস্টধর্ম

প্রচার করতে। বিদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নরদামটন সায়ারের কয়েকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী ভারতে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন, যেমন এসেছিলেন কেরী, ওয়ার্ড, গ্রান্ট, মার্শম্যান প্রমুখেরা। মর্টনও এই একই প্রয়াসের শরিক হয়েই এসেছিলেন। মর্টনের বাংলা প্রবাদ সংকলন ও তার ইংরেজি ব্যাখ্যার কারণ তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক দু'বছর আগে অপর একজন খ্যাতনামা পাদ্রী মার্শম্যানের প্রকাশিত বক্তব্যের অংশ বিশেষের মাধ্যমে জানা যাবে। মার্শম্যান লিখেছেন ঃ

(1) With the hope of aiding the researches of our countrymen into the popular language of Bengal ; (2) They will furnish the English student with a key to many of the popular sayings which he finds in his inter-course with the people of this province, and also explain many of the maxims which have exercised a very considerable influence on the habits and conduct of the natives !

অবশ্য মার্শম্যান যে মর্টনের সঙ্কলন প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন নি, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। নীলরত্ন হালদারের 'কবিতা-রত্নাকর' নামে একটি প্রবাদ সঙ্কলনের ভূমিকায় তিনি উদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন। নীলরত্ন হালদারের গ্রন্থটি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি ছিল সংস্কৃত প্রবাদের সঙ্কলন। তাই বাংলা প্রবাদ চর্চায় প্রথম পথিকৃতের স্থান বিদেশীয় মর্টনেরই।

দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহের আখ্যান পত্রে মর্টনের পরিচিতি দিয়ে বলা হয়েছে 'Senior Missionary of the Incorporated Society for Propagating the Gospel in Foreign Part's মর্টন Calcutta christain observer এর সম্পাদক মণ্ডলীকে উদ্দেশ করে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তাঁর প্রবাদ সংগ্রহ ও সংকলনের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে—

'It, I conceive, may be, on the whole, the best medium through which to present them to all who are interested in the details of the native character and habit, and especially to the Missionaries of the Various denominations.' ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের Calcutta christian observer এর মার্চ সংখ্যায় (Vol III) দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তাতেও

বিদেশীয়দের দ্বারা বিশেষ করে প্রবাদ সংকলনের অন্যতম উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

'To all Missionary labourers in Bengal we hold it to be invaluable we have ourselves felt from experience the importance of the knowledge it is designed to communicate'.

মর্টন মার্শম্যানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' প্রকাশ করেছিলেন—এরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মার্শম্যান এবং মর্টন দু'জনেই ছিলেন মিশনারী এবং একই আদর্শে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এ ছাড়াও মার্শম্যান কর্তৃক নীলরত্ন হালদারের প্রবাদ সঙ্কলনটির দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৩০) ইংরেজিতে ভূমিকা এবং সঙ্কলিত প্রবাদগুলির ইংরেজি অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করার ঠিক দু'বছর পরেই—মর্টনকে দেখা গেল বাংলা প্রবাদ সঙ্কলনে ব্রতী হতে। মর্টনের সঙ্কলনে তাই মার্শম্যানের প্রভাব সুস্পষ্ট। অবশ্য সূচনার কথা বাদ দিলে নিছক প্রবাদ সঙ্কলন হিসাবে অপর একজন মিশনারী ভারত-প্রেমিক রেভারেণ্ড লঙের 'প্রবাদমালা' (১৮৬৮-১৮৬৯, ১৮৭২) যে গুরুত্বের অধিকারী, মর্টনের গ্রন্থে সেই গুরুত্ব কিন্তু অনুপস্থিত। লঙের 'প্রবাদমালা' প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে অন্যান্য কয়েকজন বিদেশীয়ের প্রসঙ্গে উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে। এঁদের একজন হলেন Captain T. H. Lewin এবং অপরজন J. D. Anderson। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে Lewin-এর "Hill Proverbs of the Inhabitants of Chittagong Hill Tracts" প্রকাশিত হয়।

J. D. Anderson ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। চট্টগ্রামের উপভাষার নিদর্শন স্বরূপ চট্টগ্রামে প্রচলিত ৩৫২টি প্রবাদের ইংরেজি অনুবাদ টিপ্পনী-সহ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। Anderson-এর গ্রন্থটির নাম "Some Chittagong Proverbs"। Anderson চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত প্রবাদগুলিকে বোধগম্য করার জন্য প্রবাদগুলির ভাষাকে অবশ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিবর্তিত করেছেন। এর ফলে সংগ্রহ কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে।

রেভারেণ্ড লঙ্‌ প্রণীত 'প্রবাদমালা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থের আখ্যান পত্রে যদিও বলা হয়েছে 'Two Thousand Bengali Proverbs Illustrating native life and feeling', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটিতে ২০৫৮টি প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রম পরম্পরায় সাজানো। আখ্যান পত্রে লেখক বা সংকলক হিসাবে লঙ্‌

সাহেবের নাম কিন্তু মুদ্রিত হয় নি। তবু এ গ্রন্থটি যে লঙ্ সাহেবের রচনা, 'প্রবাদমালা'র পরবর্তী খণ্ডেই তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল 'Calcutta Literature Society'র জন্য।

'প্রবাদমালা'র ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগটি প্রকাশিত হয় 'Calcutta School Book and Vernacular Literature Society'র দ্বারা। গ্রন্থটির আখ্যান পত্রে মুদ্রিত হয়েছে ঃ 'Proverbs of Europe and Asia Translated into the Bengali Language ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালা। দ্বিতীয় ভাগ। বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদিত।'

'প্রবাদমালা'র প্রথম খণ্ডে লঙ্ সাহেবের নাম অথবা ভূমিকাস্বরূপ কিছু মুদ্রিত না হলেও দ্বিতীয় খণ্ডে ইংরেজিতে একটি ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছে লঙের নিজের নামে। ভূমিকায় লঙ্ বলেছেন ঃ

'The following contains a free translation into Bengali by Babu Rangalal Banerjee of Proverbs selected by me from the German, Italian, Spanism, Portuguese, Dutch, French, Badagar Malaylim, Tamul, Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa, and Russian languages'—অর্থাৎ দ্বিতীয়ভাগে সন্নিবিষ্ট লঙ্ নির্বাচিত বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী প্রবাদের বঙ্গানুবাদ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এ'রূপ সংকলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লঙের মন্তব্য—

'The object is to introduce to the notice of the Bengali people the wit wisdom in other parts of the world, the Russian Proverbs 200 in number though last in the series will not be found the least in their wit and keen sarcasm.'

সর্বমোট ৯৭৯টি প্রবাদ সঙ্কলনটিতে স্থান পেয়েছে। এই সংকলনটির বৈশিষ্ট্য হল বিদেশী যে সকল প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের গভীর সাদৃশ্য আছে, সে'ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা প্রবাদটিও অনুবাদের সংগে উল্লেখ করে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লঙ্ সাহেবের সম্পাদনায় প্রবাদের আর একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। এটিরও নাম 'প্রবাদমালা'। এই সঙ্কলনটিতে সর্বমোট ৩৪২৯টি প্রবাদ স্থান পেয়েছে। লঙ্ গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন ঃ

'This little work complete the series of Proverbs and Proverbial sayings of Bengal.'।—লঙ্ সাহেবের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে 'প্রবাদমালা'র তিনটি খণ্ডই লঙ্ সাহেবের সঙ্কলিত এবং তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত সংকলনটির আখ্যান পত্রে মুদ্রিত হয়েছে: 'Three Thousand Bengali proverbs and proverbial sayings Illustrating Native Life and Feeling among Ryots and women'।

এই সংকলনটিতে বেশ কিছু সংস্কৃত প্রবাদও স্থান পেয়েছে। এ পর্যন্ত গেল বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে বিদেশীয়দের প্রয়াসের কথা। এইবার আসা যেতে পারে বাংলা লোক-কথা চর্চায় বিদেশীয়দের কি পরিমাণ প্রয়াস যুক্ত হয়েছিল সেই সম্পর্কিত আলোচনায়।

বহুকাল পূর্ব থেকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষকদের এ'রকম এক ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ভারত উপ-মহাদেশ লোক-কাহিনীতে সমৃদ্ধ। তাই ইংরেজ কর্মচারী, কর্মচারীদের আত্মীয়-স্বজন এবং ইউরোপীয় মিশনারীরা এদেশের নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহের সময় লোক-কাহিনী সংগ্রহেও ব্যাপৃত ছিলেন। আর এঁদের মধ্যে অনেকেই তৎকালীন প্রচলিত লোক-কাহিনীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন ও সংগ্রহ রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক-কথা সংগ্রহে বিদেশীয়দের যে পরিমাণ উদ্যম নিযুক্ত হয়েছিল, সে পরিমাণ উদ্যম বাংলাদেশের লোক-কাহিনী সংগ্রহে নিযুক্ত হতে দেখা যায় নি প্রথমেই এ'কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

বাংলাদেশে লোক-কাহিনী সংগ্রহের সূত্রপাত ঘটে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতা থেকে এই সময় প্রকাশিত হয় 'The Indian Antiquary' এবং 'Descriptive Ethnology of Bengal'। Antiquary-তে প্রকাশকাল থেকেই বাংলা লোক-কাহিনীর বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন জি. এইচ. ড্যামাণ্ট। ড্যামাণ্ট এই পত্রিকায় সর্বমোট ২২টি উপকথা ও পরী-কাহিনী প্রকাশ করেন। সত্যিকথা বলতে কি ড্যামাণ্ট-ই বাংলাদেশের লোককাহিনীকে পাশ্চাত্য দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেন। বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'Descriptive Ethnology of Bengal' গ্রন্থটিও বাংলা লোক-কাহিনী সংগ্রহ ও চর্চার ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই গ্রন্থটির সঙ্গে যুক্ত উল্লেখযোগ্য নামটি হ'ল Edward Tweit Delton। অবশ্য একথা ঠিক যে ডেল্টন ড্যামাণ্টের মত

যত না লোক-কাহিনী সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সে তুলনায় তাঁর বেশি লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জাতি-তাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনায়। ড্যামাণ্ট বা ডেল্টন—এঁরা কেউই বাংলা লোক-কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নি। কিন্তু তবুও ড্যামাণ্ট এবং ডেল্টনের নাম বাংলা লোক-কাহিনী সংগ্রহ ও চর্চার ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হবে।

এইবার একজন ইউরোপীয়নের উল্লেখ করা যেতে পারে যিনি নিজে বাংলা লোক-কথা সংগ্রহ না করলেও লোক-কাহিনী সংগ্রহে অপর একজনকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ইনি—আর. সি. টেম্পল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র বহুখ্যাত 'Folk tales of Bengal' গ্রন্থটি রচনার মূলে যে টেম্পলের প্রেরণা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল তা লালবিহারীর উক্তি থেকেই জানা যায় ঃ

'Captain Temple wrote me to say how interesting it would be to get a collection of the unwritten stories which old women recite to children in the evenings, and to ask whether I could not make a collection'।

উল্লেখ করা যেতে পারে লালবিহারী তাঁর গ্রন্থটি টেম্পলকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

বাঙ্গালী জাতিতত্ত্বের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ডেল্টনের পর যিনি স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তিনি হলেন এইচ. এইচ. রিসলে। রিসলে রচিত 'The Tribes and customs of Bengal' গ্রন্থটি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বহুবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সঙ্গে স্থানীয় কাহিনী ও লোক-কাহিনীও প্রকাশিত হয়েছিল।

F. B. Bradley Birt ফ্রান্সিস ব্র্যাডলী বার্ট ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন Bengal Fairy Tales। গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রূপকথা। সর্বমোট তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটি। দীনেশচন্দ্র সংকলিত পাঁচটি বাংলা গীতিকাও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মূলতঃ সাহিত্যিক উৎস থেকেই গ্রন্থটি রচিত। মুখবন্ধ, টীকা-টিপ্পনী ভূমিকা ইত্যাদি বিবর্জিত হলেও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্রাবলীর সংযোজনে গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে স্বীকার করতে হয়।

'Bengali House-hold Tales' রচয়িতা উইলিয়াম ম্যাককুলোচ ছিলেন নিম্নবঙ্গের United Free Church-এর একজন ভূতপূর্ব মিশনারী। এঁর গ্রন্থটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বিভিন্ন

শ্রেণীর মোট ২৮টি কাহিনী স্থানলাভ করেছে। কাহিনীগুলি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে সংগৃহীত। সঙ্কলিত প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে পূর্বভারত থেকে সংগৃহীত সমান্তরাল কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ ভাবে মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত। সর্বোপরি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিশিষ্টের সংযোজন সংকলনটির মর্যাদাকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।

পরিশেষে বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগকারী আরো কয়েকজন বিদেশীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা গেল। বাংলা মৌখিক সাহিত্যের প্রাচীনতম সংগ্রাহকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি নাম 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থের সম্পাদক ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন (১৮৫১-১৯৪১)। গ্রীয়ারসন ১৮৭৩-এ ভারতে আসেন। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি তৎকালীন বাংলা প্রদেশের (বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা) বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করেন। সংস্কৃত, পুরাতন হিন্দী, মৈথিলী, ভোজপুরী, ছত্তিশগড়ী এবং বাংলা ইত্যাদি কথ্য ভাষার অনুশীলনে ইনি ব্যাপৃত ছিলেন। G. A. Grierson কর্তৃক বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় 'নীলার বারমাসি গান' (১৮৭৭), সরকারী কার্যোপলক্ষে ইনি বর্তমান বাংলাদেশস্থ রংপুরে অবস্থান কালে ময়নামতীর এক পালাগান সংগ্রহ করেন এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামকরণ করে তা প্রকাশ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে গ্রীয়ারসন সংগৃহীত ময়নামতীর পালাগানটি ইংরেজি অনুবাদসহ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল (J A S B, XLVII, 1878; pp 135-238; The Song of Manick Chandra)। গ্রীয়ারসন সংগ্রহ করেছিলেন 'তোমেরশিদ লালমতি' গীতিকাটি (বাখরগঞ্জ)। সার্ভে, ৫, পৃ. ২৬৫। পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এই পালা গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন ও আলোচনা করেন।

সাম্প্রতিককালে বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগকারী একজন বিদেশী হলেন Dr Dusan Zbavitel; ইনি একজন প্রতিষ্ঠিত চেক পণ্ডিত। ময়মনসিংহ থেকে প্রাপ্ত গীতিকা গুলি নিয়ে ইনি উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন এঁর 'Bengali Folk Ballads From Mymensingh' গ্রন্থে (১৯৬৩)। ময়মনসিংহ থেকে প্রাপ্ত গীতিকাগুলির প্রামাণিকতা বিচার করেছেন লেখক। তাছাড়া গীতিকাগুলির বিষয়বস্তু, গঠন শৈলী, আঙ্গিকগত সাদৃশ্য, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির প্রতিফলন, গীতিকাগুলির গায়কগণ,

গীতিকায় প্রতিফলিত প্রকৃতি, এগুলির ছন্দ এবং অলংকার নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি।

লেখক যে বলেছেন 'Amomg Bengalis themselves—no foreigner has to my knowledge, made any contribution in this field so far.'

—তা যথার্থ, বাস্তবিক গীতিকা আলোচনায় আলোচ্য গ্রন্থটি শুধু অপরিহার্য'ই নয়, একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য সংযোজনের গৌরবে গৌরবান্বিত বলে স্বীকার করতে হয়।

প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত Dr. Heinze Mode এবং এদেশীয় অরুণ কুমার রায়ের যুগ্ম প্রয়াসে রচিত 'Bratakathas' (Bengalische Erzahlungen) এবং 'Bengalische Marchen' নামক গ্রন্থদুটি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৪ এবং ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা ব্রতকথা এবং লোক-কথা চর্চার ক্ষেত্রে জার্মান ভাষায় রচিত এই গ্রন্থদু'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

এইভাবে বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের প্রয়াস বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। তাই আজ যখন লোক-সাহিত্য চর্চায় বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তখন এইসব বিদেশীয়দের দান সম্পর্কে একটু দৃষ্টিপাত করা গেল।



প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধাঁধা

জ্ঞান ও বুদ্ধির পরীক্ষা তথা রহস্যপ্রিয়তা থেকেই ধাঁধার উদ্ভব। পরবর্তীকালে নির্মল আনন্দের উৎস রূপেই ধাঁধা আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে ধাঁধা ত একেবারে বালখিল্য ব্যাপারে এসে দাঁড়িয়েছে। যে কোনো শিশু বা কিশোর পাঠ্য পত্র পত্রিকাই তার প্রমাণ। অবশ্য বালখিল্য ব্যাপারে রূপান্তরিত হলেও একথা আমরা অস্বীকার করতে পারব না যে এর মধ্যেও জ্ঞানচর্চা ব্যাপারটা রয়ে গেছে।

একটা সময় ছিল, যখন সমাজ জীবনে ধাঁধার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অর্থাৎ সামাজিক প্রযোজন ছিল ধাঁধার। উদাহরণ স্বরূপ আমরা আধ্যাত্মিক ধাঁধার উল্লেখ করতে পারি, উল্লেখ করতে পারি বিবাহের মত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ধাঁধার, যে গুলি আচারমূলক ধাঁধা বলে পরিচিতি লাভ করেছিল।

পরিবর্তিত সমাজ জীবনে ধাঁধার সেই উপযোগিতা আর নেই। মানুষের রহস্যপ্রিয়তা প্রায় অন্তর্হিত, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বিপর্যস্ত মানুষ তার বক্তব্যকে সোজাসুজি প্রকাশ করতেই অধিকতর আগ্রহী। জ্ঞান বুদ্ধি পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট উপাদানাদির রাজকীয় আধিপত্য। পূর্বে বিবাহ করতে কন্যার গৃহে উপস্থিত বরকে নানা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেওয়ার রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে বরের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার তুলনায় তার আর্থিক কৌলীন্য যাচাই করাই অধিকতর শ্রেয়ঃ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাছাড়া আমাদের অতি ব্যস্ততাময় জীবন থেকে অবকাশ চলে গেছে। যান্ত্রিক যুগে আমরাও ক্রমে যান্ত্রিক হয়ে উঠছি। বৈষয়িক প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজেই আমাদের আকর্ষণ, অন্যবিধ কার্যে আমাদের অনীহা, কেননা তাতে সময়ের অপচয়।

সাহিত্য ফটোগ্রাফ না হতে পারে, কিন্তু তা যে সমসাময়িক জীবনের দর্পণ, তাতে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। দর্পণে যেমন আমরা নিজেদের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ জনিত আত্মপ্রসাদ লাভ করি, অনুরূপ ভাবে সমসাময়িক সমাজ জীবনের পরিচয় পেতে সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ব্যতীত

প্রত্যন্তর নেই। আমাদের দেশে ধাঁধা ব্যবহারের যে এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, সমাজজীবনে তার যে ভূমিকা ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, সেই পরিচয়েরই প্রমাণ মিলবে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহারের প্রাচুর্যে, সন্ধান মিলবে আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে।

বেদে অধ্যাত্ম চিন্তাকে অনেক সময়েই প্রকাশ করা হয়েছে হেঁয়ালির আশ্রয়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ নং সূক্তের ৯, ১৭, ২৬, ৫৪ নং শ্লোকের, ৮ম মণ্ডলের ২৯ নং সূক্তের, ১০ম মণ্ডলের ১৭৭ নং সূক্তের ১, ২ নং শ্লোকে ব্যবহৃত প্রহেলিকার উল্লেখ করতে পারি।

উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ।

শ্লোকটির অর্থ হল—পূর্ণ, এ পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণিত অভিব্যক্ত। পূর্ণ থেকে পূর্ণ গ্রহণ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থেকে যায়।

ঈশোপনিষদের একটি শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ।।

এই শ্লোকটির অর্থ হল- ইনি চলেন, আবার ইনি চলেন না। ইনি দূরে আবার ইনি নিকটে। ইনি এই সমস্ত জগতের ভেতরে, আবার এই সমস্ত জগতের বাইরে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৮ম খণ্ডে শিলক ও দালভ্যের মধ্যে হেঁয়ালিতে যে কথোপকথন হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ—

কা সাম্নো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ।
স্বরস্য কাগতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ ।।
প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচান্নস্য কা
গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ ১।৮।৪

ছান্দোগ্য উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের নবম খণ্ডেও শালাবত্য ও প্রবাহণের মধ্যে হেঁয়ালি পূর্ণ প্রশ্নোত্তর লক্ষিত হয়—

অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ।
সর্বাণি হ বা ইমানি ভুতান্যাকাশা দেব সমুৎপদ্যন্ত।
আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হে বৈভ্যো
জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ।। ১।৯।১

মহাভারতে বক রূপী ধর্ম পঞ্চ পাণ্ডবকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কা চ বার্তা, কিমাশ্চর্য্যম্, কঃ পন্থাঃ, কশ্চমোদতে ইত্যাদি। যুধিষ্ঠিরের মাধ্যমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইসব প্রশ্নের জবাবও দিয়েছিলেন। যেমন—

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে। সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রি দিবেন্ধনেন মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন। ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা॥ (বনপর্ব—৩১৩ অধ্যায়/১১৮ শ্লোক)

কিংবা আশ্চর্য কি, এর উত্তরে বলা হয়েছে—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥

(বনপর্ব; ১১৩ অধ্যায়। ১১৬ শ্লোক)

আদর্শ পথ হল—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

আমাদের দেশে হেঁয়ালির ব্যবহার যে কত প্রাচীন তার নিদর্শন হল ব্রহ্মোদ্য, আর্যা-তরজা, বাদাবাদি তরজা ইত্যাদি।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হত ব্রহ্মোদ্য। অংশ নিতেন হোতা স্বয়ং এবং অধ্বর্যু।

আচার্য সুকুমার সেনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি উদ্ধার যোগ্য, 'অপভ্রংশ—অবহট্টের কাল হইতে প্রহেলিকা-বিলাস লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল'।

আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদেও প্রহেলিকার সাক্ষাৎ লভ্য—

বলদ বিআ এল গাবিআ বাঁঝে
পিঠা দুহি এ এ তিনা সাঁঝে।
জো সো বুধী সোই নিবুধী
জো সো চোর সেই দুষাধী

—বলদ প্রসব করে কিন্তু গাভী বন্ধ্যা। কেঁড়ে তিন সন্ধ্যা দোয়া হয়। যে বোদ্ধা সেই নির্বোধ। যে চোর সেই আবার পুলিশ।

ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত সেক শুভোদয়ার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মেঘ উমাপতি ধরকে বলেছেন:

রাম রাজা বর্ত্তে ইন্দ্র বর্ষে জল।
যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য ধরে ফল॥

উমাপতি তদ্‌ত্তরে বলেছেন ঃ

যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ।
যদি বা শীঘ্র ফলে তবে তু হয় ছয় মাস ॥

ধর্মের গাজনে পাটভক্ত্যা-ধামাত করণিয়র মধ্যে যে হেঁয়ালির প্রশ্নোত্তর হয় তার কিছু নিদর্শন হল এই রকম—

প্রশ্নঃ তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দে
কোথা থুইবে ফুলের সাজি কোথা পূজিবে দেব।

উত্তরঃ হয় না তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দে
হৃদয়ে থুব ফুলের সাজি ভাবে পূজিব দেব ॥

আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় প্রহেলিকার ব্যবহার সুপ্রাচীন। প্রশ্নকর্তা ও উত্তর দাতার মধ্যে বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখতেই এই রীতি অনুসৃত হত। চৈতন্য চরিতামৃতকার জানিয়েছেন অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্যকে হেঁয়ালিতে প্রশ্ন করতেন—

আচার্য গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে ;
আচার্য তরজা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে। (২, ১৬)

অদ্বৈত আচার্য রচিত একটি হেঁয়ালির নিদর্শন হল -

বাউলকে কহিয় লোকে হইল আউল
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল।

স্বরূপ দামোদরকে মহাপ্রভু বলেছিলেন—

মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ।

অবশ্য মহাপ্রভু নিজেও হেঁয়াল ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, তারই প্রমাণ—

করিনু পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে

তাঁর ব্যবহৃত এই হেঁয়ালিটি।

আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ধাঁধার সন্ধান আমরা পাই।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গলে' শুক বলেছে :

বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা
নাচয়ে সারথি তাথে পসারিয়া গা।
হেঁয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে চলে রথ ভূতলে সারথি ॥

এর উত্তরটি হল 'ঘুড়ি'।

আর একটি ধাঁধার উল্লেখ করা হল—

তরু হয় বনে রয নাহি ধরে ফুল
ডাল পল্লব তায় অতি সে বিপুল।
পবনে করিযা ভর করয়ে ভ্রমণ
বনেতে থাকিয়া করে বনের দোষণ ॥

এর উত্তর হল পুকুরের পানা।

ধর্মমঙ্গলেও হেঁয়ালীর সাক্ষাৎ আমরা পাই। সুবিক্ষা নাম্নী গণিকা লাউসেনকে মুক্তির শর্তরূপে হেঁয়ালি জিজ্ঞাসা করেছে—

যার গর্ভে জন্ম লয় নাহি তারে মায়া।
জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কাযা ॥
বাসি না সম্বল রাখে দরিদ্র লক্ষণ।
আশ্রয় জনার পীড়া করে অনুক্ষণ ॥ (অগ্নি)
খায় সে সহস্রমুখে পাক নাহি পায়।
উদরে আহার ভরে অস্থিরে বেড়ায় ॥
তায় প্রহারের ঘায় পরিত্রাহি ডাকে।
আহার উপরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে ॥ (মাকু)

নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও আমরা ধাঁধার সাক্ষাৎ পেয়েছি। ময়নামতী পুত্র গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে গোপীচন্দ্র ময়নামতীর জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে গিয়ে 'বুঝান' অংশে বলেছেন—

চারি চকির পুকুর খানি মা মধ্যে ঝলমল।
কোন বিরিখের বোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল।
কেবা আন্ধে কেবা বাড়ি মা কেবা বসিয়া খাই।
কারে লইয়া শুইয়া থাকি মা কেবা নিদ্রা যাই ॥

আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি ।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কোন খানি ।
কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বানারসী ।
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসী ॥
কোনঠে রইল বঁড়শী মা কোনঠে রইল সূতা ।
কোনঠে রইল বঁড়শীর ছিপ কোন খানি ফুলতা ॥
তৃষা লাগলে মা তৃষা আইসে, কথা হনে ।
তৃষার জল ফুটিক মা খায় কোন জনে ॥
বাও নাই বাতাস নাই মা পাতা কেন নড়ে ।
দুই বিরিখের একটি ফল কোন বিরিখে ধরে ॥
যখনি আছিলাম মা জননীর উদরে ।
কোন দিগে শিথান মা কোন দিগে পৈথান ।
জননীর উদরে থাকি জপছি কোন নাম ॥

ময়নামতীর উত্তর ঃ

ওরে যাদুধন চার চকির পুকুরখানি মধ্যে ঝলমল ॥
মন বিরিখের বোটা তুই তনু বিরিখের ফল ।
গাছের নাম মনোহর ফলের নাম রসিয়া ।
গাছের ফল গাছে থাকে বোটা পড়ে খসিয়া ॥
কাটিলে বাচে গাছ না কাটিলে মরে ।
দুই বিরিখের একটি ফল জননী সে ধরে ॥
হিন্দি গয়া হিন্দি গঙ্গা হিন্দি বারানসী ।
মুখে হলো তোর জপতপ মস্তকে তুলসী ॥
মনে আন্দ তনে বাড় আত্মমায় বসিথাও ।
জীতা লয়ে শুয়ে থাকি মহতী নিদ্রা যাও ॥
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি ।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপাল খানি ॥
বিনা বাতাসে যাদু চক্ষের পাতা নড়ে ।
দুই বিরিখের একটি ফল তোর মায়ের প্রাণে ধরে ॥
যখন আছলু যাদু জননীর উদরে ।
উত্তরে শিথান যাদু তোর দক্ষিণে পৈথান ।
জননীর উদরে থাইকা জপছ নিজ নাম ॥

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কবি রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়নে'ও বর বেশী শিবকে বাসর ঘরে ঋষি পত্নীদের দ্বারা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার কথা বর্ণিত হয়েছে—

এক রূপে দুই ভাই বৈসে দুই দেশে।
চিনা পরিচয় নাই জন্মের বয়সে।।
ও চলিতে এই চলে তার পাছে পাছে।
দেখাদেখি নাঞি মাত্র থাকে কাছে কাছে ॥
তুমি বুঝহ হেঁয়ালী তুমি বুঝহ হেঁয়ালী।
একপণা বলে নহে দিব হাত তালি।।
—এর উত্তর হল 'চক্ষু'।

কাব্য রচনায় কালনির্দেশক ছত্র গুলিকে প্রহেলিকা রূপে প্রকাশে অভ্যস্ত ছিলেন সেকালের কবিরা। কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বলা হয়েছে—

বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে, অর্থাৎ ১৪৬৪ শকাব্দে বা ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যটির রচনা শেষ হয়েছিল।

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের কাল নির্দেশক ছত্র দুটি হল—

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত।

এখানে ইন্দু বিন্দু বেদ ধাতা অর্থে ১০৫১ সাল। বাম দিক থেকে পাঠ করলে দাঁড়ায় ১৫০১।

বিশারদ চক্রবর্তী ছিলেন কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সভাকবি। ইনি বিরাট পর্ব অনুবাদ করেছিলেন। বিরাটপর্বের রচনাকাল সম্পর্কে কবি হেঁয়ালিতে জানিয়েছেন—

বিরাট পর্ব সেহি কৈল লোক রসে
বেদ বহ্নি বাণ চন্দ্র শাকে চৈত্রমাসে

—অর্থাৎ ১৬৬৪ শকাব্দে কিংবা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যটির অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিল।

কামতা কামরূপের বিশ্বসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি পীতাম্বর রচনা করেন উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী –

উষা পরিণয় গীত হৈল সমাপতি।
বাণ যুত বাণ বেদ শশাঙ্ক প্রমিত
বৈশাখ মাসর শুক্ল পক্ষ পঞ্চমীত।
রস ধাতু বেদ চন্দ্র শকের প্রমাণে

অর্থাৎ ১৫৫৫ বা ১৪৫৬ শকাব্দে কিংবা ১৫৩৩/৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কাহিনীটি রচিত।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ধৃত কালজ্ঞাপক শ্লোকটি হল—

ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।

অর্থাৎ ১৪০৬ শকাব্দে বা ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা উল্লিখিত।

বর্তমানে এই ধরণের কালজ্ঞাপক শ্লোক ব্যবহারের রীতি আর নেই। কিন্তু এক সময়ে এর যে চল ছিল অনেকখানি, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিই তার প্রমাণ। বর্তমানে 'শব্দ জব্দ' ইত্যাদির বেশ জনপ্রিয়তা, এগুলিকে আমরা পরিবর্তিত হেঁয়ালী বলতে পারি।



প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

সাহিত্য সমসাময়িক কালের নির্ভরযোগ্য নিদর্শন, কারণ যথার্থ সাহিত্য কখনই সমসাময়িক কালের সমাজ তথা জীবনকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই বিশেষ একটি যুগের বা কালের পরিচয় পেতে সেই যুগের বা কালের সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্য মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। তাই এই সময়কার সাহিত্যে আমরা তেমন করে তৎকালীন সমাজ এবং জীবনের চিত্রণ আশা করতে পারি না। তবু এরই মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা তাঁদের রচিত কাব্যে যে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্য অবলম্বনে সে সময়ে প্রচলিত লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের কিছু পরিচয় গ্রহণ করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন সমাজই লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার থেকে মুক্ত নয়। বরং যে সময়ের সাহিত্য অবলম্বনে আমরা লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের পরিচয় গ্রহণ করব, সে সময়ে এসবের আধিপত্য ছিল এখনকার তুলনায় অনেক বেশি। লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার যেহেতু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেইহেতু এগুলির প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবিরা প্রকারান্তরে সমাজ সচেতনতারই পরিচয় দিয়েছেন বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল চর্যাপদ। কিন্তু চর্যাপদে প্রবাদের উল্লেখ লক্ষ্য করা গেলেও কোন লোক-বিশ্বাস অথবা লোক-সংস্কারের উল্লেখ সেখানে অনুপস্থিত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বড়ু

চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিতেই প্রথম বিশ্বাস এবং সংস্কার উল্লিখিত হয়েছে।

'দানখণ্ডে' রাধা বলেছেন :

কালিনী মাএ মোর নাম থুইল রাধা।
হাঁছি জিঠী কেহো তাত না দিল বিরোধা।।

পৃঃ ৩৮ ; ৫ম সংস্করণ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]

—এখানে রাধা বলেছেন যে কালিনী মা যখন তাঁর নাম রাধা রেখেছেন, তখন কোন বাধা পড়েনি, কারণ তখন কেউ হাঁচেওান অথবা টিকটিকিও ডাকেনি। এর থেকেই বোঝা যায় হাঁচি, টিকটিকি সংক্রান্ত সংস্কারটি কত দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের সমাজে প্রচলিত। 'দান খণ্ডে'র অন্যত্র হাঁচি টিকটিকির কথা উল্লিখিত হয়েছে—

কোণ আসুভক্ষণে বাঢ়াইলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা।।

[পৃঃ ৪০, ৫ম সংস্করণ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ দেখলে, পূর্ণ কলসীতে হাত ঢোকালে এবং মাটির ওপর জলের আঁক কাটলে মিথ্যা কলঙ্ক রটে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'ও এই বিশ্বাসগুলি উল্লিখিত হয়েছে—

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্রমাসে।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পূরিল কলসে।।
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে।। ১ ।।

[বাণখণ্ড ; পৃঃ ১১২ ; ৫ম সংস্করণ ; সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]

হাতী, ঘোড়া বা সাপের মাথায় খঞ্জন দেখলে দ্রষ্টার শ্রীবৃদ্ধি হয় বলে বিশ্বাস। কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন তাঁর ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধিলাভ দূরে থাকুক, জীবন সংশয় উপস্থিত—

মুখ কমলে আতি শোভা করে
খঞ্জন নয়ন দুই।
দুহি কালশাপ যুগল তাহাত
শোভ এ নিচল হোই।।

আন যদি দেখে রাজপদ পাএ
নানা উপভোগে লহে।
আছু রাজপদ দূর বড়ায়ি
জীবন মোর সন্দেহে ॥ ১ ॥

[দানখণ্ড ; পৃঃ ২৯ ; ঐ]

কোন কথা তিনবার করে বললে বা তিনসত্যি করলে তা যেমন সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়, তেমনি ভূমি এবং কান স্পর্শ করে কেউ কোন শপথ করলে তাও সত্য বলে বিশ্বাস করার সংস্কার প্রচলিত। এই সংস্কারটিরও উল্লেখ দেখা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'—

ভূমি ছুই আঁ হাথ পরসওঁ দুঈ কানে।
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গে আনে ॥

[দানখণ্ড , পৃঃ ৪১ ; ঐ]

দাঁতে তৃণ ধরে কোন কিছু শপথ করলে তা নিশ্চিত রক্ষিত হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই লোক-সংস্কারটি শ্রীরাধিকার মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে দেখা গেছে। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা বলেছেন :

দশনেত তৃণ করি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
যেই চাহ সেহি দিবোঁ কর মোরে পারে ॥ ১৬ ॥

[নৌকাখণ্ড ; পৃঃ ৬২, ঐ]

যাত্রাকালে কতকগুলি লক্ষণ দেখে স্থির করা হয় যাত্রা শুভ হবে না অশুভ হবে। বিশ্বাস, অশুভ লক্ষণ দেখে যাত্রা করলে যাত্রা ব্যর্থ হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এই সম্পর্কিত লোক-বিশ্বাসের পরিচয় বিধৃত হয়েছে এইভাবে—

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥ ১ ॥

[দানখণ্ড ; পৃঃ ৪৬, ঐ]

অর্থাৎ যাত্রাকালে যদি তেলেনীকে তেল বিক্রয় করতে দেখা যায়, কিংবা শুষ্ক বৃক্ষ ডালে কাককে উপবিষ্ট দেখা যায়, অথবা শূন্য কলসীসহ কোন রমণীকে আগে আগে গমনরতা দেখা যায়, তাছাড়া হাঁচির শব্দ, টিকটিকি-

ইত্যাদির ডাক যদি শোনা যায়, তাহলে বুঝতে হবে যাত্রায় বাধা পড়েছে। এইসব বাধা না মানলে যাত্রা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা সমধিক।

যাত্রার সময় যদি কেউ পেছন থেকে ডাকে, তাহলেও যাত্রায় বাধা পড়ে, এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে চন্দ্রাবলীর একটি উক্তিতে—

আজি জখনে মো বাঢ়ায়িলোঁ পাএ।
পাছে* ডাক দিল কালিনী মাএ॥
তার ফলে* মোর পরাণ-পতী।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞি* গেলা কতী॥ ১॥
[কালিয়াদমন খণ্ড ; পৃঃ ৯১ ; ঐ]

যাত্রাকালে চন্দ্রাবলীকে কালিনী পেছন থেকে ডাকার ফলেই আর তার পক্ষে প্রাণপতি কৃষ্ণকে লাভ করা সম্ভব হল না বলে চন্দ্রাবলী দুঃখ করেছে। যাত্রা কি কি কারণে অযাত্রায় পরিণত হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে 'বংশী খণ্ডে'—

কোন আসুভ খনে পাএ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ॥
শূন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞ*র শিআল মোর ডাহিনে* জাএ॥ ১॥
* * *
কথো দূরে পথে মো দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ॥ ২॥ [পৃঃ ১২৫ ; ঐ]

কি কি কারণে বদনাম হয় তার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, কাব্যের অন্যত্রও এই প্রসঙ্গে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—

ভাদরমাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।
জল মাঝে* দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী।
পাম্ব কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে॥ ১॥
* * *

গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আথর কিবা ভুমিত লেখিলোঁ ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাএ তুলী লৈলোঁ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞি* বাঁশী চুরী দোষাএ ॥ ২ ॥

[বংশীখণ্ড ; পৃঃ ১২৬ ; ঐ]

অর্থাৎ ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ দর্শনে কিংবা পূর্ণ কলসীতে হাত ঢোকালে অথবা মাটির ওপর জলের আঁক কাটা ছাড়াও যদি কেউ জলের মধ্যে চাঁদকে দেখে অথবা গুরুর আসনে উপবেশন করে তাহলেও বদনামের ভাগী হতে হয় বলে বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও আমরা বেশ কিছু লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের উল্লেখ লক্ষ্য করতে পারি।

মহর্ষি ভগীরথ তপস্যার উদ্দেশ্যে গমনকালে তাঁর দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হয়েছিল, যা নাকি শুভযাত্রার লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে—

যাত্রাকালে করে রাজা মায়ের স্মরণ।
দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন ॥

[আদিকাণ্ড ; পৃঃ ১৬ ; পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি সংস্করণ]

রাত্রে দই-ভাত খাওয়া অবিধেয়। অন্ধক মুনি পুত্রশোকে বিলাপ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত। [আদিকাণ্ড ; পৃঃ ৩৭ ; ঐ]

জাতকের জন্মের ছয়দিনের দিন বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয় জাতকের জননীকে। এই সংস্কারটির উল্লেখে বলা হয়েছে ঃ

ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে।

[আদিকাণ্ড , পৃঃ ৫৩, ঐ]

যাত্রাকালে নারীর স্পর্শলাভ অবিধেয়, কারণ তাতে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যায় বলে বিশ্বাস। মন্দোদরী ইন্দ্রজিৎকে তার নয় হাজার পরমা সুন্দরী নারীর সেবা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে ইন্দ্রজিৎ বলেছে ঃ

যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ।
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ ॥

[লঙ্কাকাণ্ড, পৃঃ ২৭৪, ঐ]

লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে যাত্রাকালে সীতা নানা অশুভ লক্ষণ দেখে আতঙ্কিত হয়েছেন এবং তাঁর মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে যে তাঁর পক্ষে আর হয়ত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হবে না।

বামেতে দেখেন সর্প শৃগাল দক্ষিণে।
অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণ, অশুভ নানা কেন দেখি পথে।
না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে ॥

[উত্তরাকাণ্ড ; পৃঃ ৪৩৯ ; ঐ]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কবি যদিও চণ্ডীমঙ্গলের প্রচলিত কাহিনীর কাঠামো অবলম্বনে তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন, তবু কাব্যটির নানাস্থলেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের বাংলা দেশে প্রচলিত বহু বিশ্বাস এবং সংস্কার উল্লিখিত হয়েছে লক্ষিত হয়। যেমন অশুভ লক্ষণের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি উল্লেখ করেছেন—

পান লৈতে নীলাম্বর কৈল জোড় কর।
ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর ॥
জ্যেঠীডাক নীলাম্বর করিল শ্রবণ।
দৈবযোগে তাহা নাহি শুনে অন্যজন ॥
বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর।
পড়িল গোসাই বাধা মস্তক উপর ॥

[ইন্দ্রের শিবপূজার আয়োজন ; পৃঃ ৫০ ; বসুমতী সংস্করণ]

মাথার ওপর শকুনির ডাক, টিকটিকির ডাক ইত্যাদি যে অশুভ, এখানে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কাব্যের অন্যত্রও শুভ-অশুভ লক্ষণের বিস্তারিত উল্লেখ লক্ষণীয়—

দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বিকশিত সরসিজ
বামে শিবা ঘটে পূর্ণ জল ॥
চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি দক্ষিণে আশুশুক্ষাণি
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।

দেখিল রুচির তনু বৎসের সহিত ধেনু
পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি ।।

* * *

গোধিকা যাত্রিক নয় সকল শাস্ত্রেতে কয়
কূর্ম গণ্ডা শশক শল্লক ।

[কালকেতুর বনযাত্রা ; পৃঃ ৪৫ ; ঐ]

পুরুষের ক্ষেত্রে দক্ষিণ আঁখি অথবা দেহের দক্ষিণ ভাগ যদি স্পন্দিত হয়, তবে তা শুভ লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়. কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম অঙ্গ অথবা বাম আঁখির স্পন্দনকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। চণ্ডীর সঙ্গে ফুল্লরার সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিতে গিয়ে তাই কবি বর্ণনা করেছেন—

বাম বাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি ।
কুঁড়ের দুয়ারে দেখে রামা চন্দ্রমুখী ।। [পৃঃ ৫১ ; ঐ]

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে রত্নমালা বিলাপকালে বলেছে যে পূর্ব থেকে সে কোন বাধার লক্ষণ লক্ষ্য করেনি, না শুনেছে হাঁচির শব্দ, না শুনেছে টিকটিকির ডাক, তবু শেষপর্যন্ত অজ্ঞাত কারণে তাকে শাস্তিভোগ করতে হ'ল, গৃহে প্রত্যাবর্তন করা আর তার হয়ে উঠল না—

কেমন দারুণ বেলা আইনু তাণ্ডব-শালা
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধ ।
বিধাতা দণ্ডিল মোরে ফিরে না গেলাম ঘরে
মনে বড় রহিল বিষাদ ।। [পৃঃ ৯২ ; ঐ]

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে বাম অঙ্গ বা আঁখি স্পন্দিত হওয়াকে শুভ ইঙ্গিত বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু তৎপরিবর্তে যদি দক্ষিণ অঙ্গ বা আঁখি স্পন্দিত হয়, তবে তা অশুভ ইঙ্গিত হয়ে দাঁড়ায়। দুর্বলার কাছে লহনা খেদ করে বলেছে—

দেখিয়ে কুস্বপ্ন বহু স্পন্দে ডানি আঁখি বাহু
লহনা কহেন মন-কথা ।
শুনিয়া লোকের মুখে শেল যেন বাজে বুকে
প্রভু দিবে নিদারুণ সতা ।।

[দুর্বলার নিকটে লহনার খেদ ; পৃঃ ৯৬ ; ঐ]

আজকের সমাজে বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলেও, আগেকার দিনে এই প্রথা ছিল বহুল প্রচলিত। তাই স্বভাবতঃই স্বামীকে নিজের বশীভূত করতে স্ত্রীরা সচেষ্ট হ'ত। এমনকি এ ব্যাপারে বশীকরণেরও সহায়তা নেওয়া হ'ত। রম্ভাবতীর বশীকরণ-ঔষধ সংগ্রহের বিস্তৃত বিবরণে বলা হয়েছে—

কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।
দুর্গার প্রদীপ পুঁতে রেখেছিল চেড়ী ॥
সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্বসু।
খুল্লনার হবে সাধু নাকবিন্ধা পশু ॥
আনিল পাকড়ি ডাল হাঁই আমলাপাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি ॥
সাপের আটুলি আনে খুঁজে বেদের ঘরে।
কই মৎস্য –পিত্ত আনে মঙ্গল বাসরে ॥
কাপাসের ক্ষেত হৈতে আনিল গোমুণ্ড।
দাণ্ডাইয়া রবে সাধু তার দুই দণ্ড ॥ [পৃঃ ৯৯ ; ঐ]

সাধু যাতে খুল্লনার প্রতি আসক্ত থাকে, সে জন্যে রম্ভাবতী আরও যে সব স্ত্রী আচারের অনুষ্ঠান করল, তা হল—

সূত্র দিয়া মাপে রম্ভা বরের অধর।
সেইরূপে মাপে আর দুইখানি কর ॥
সেই সূতা দিয়া বান্ধে খুল্লনার সনে।
সাধু রহিলেন যেন নিগড় বন্ধনে ॥
আনিল এয়োর সূতা নাটাই সহিত।
সাত ফের ফিরাইয়া করিয়া বেষ্টিত।
সেই সূতা বান্ধি রাখে খুল্লনা অঞ্চলে।
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে ॥
[স্ত্রী আচার ; পৃঃ ১০০ ; ঐ]

এ পর্যন্ত গেল স্বামীকে বিশেষ এক স্ত্রীর প্রতি আসক্ত করে তোলার বিবরণ, এইবার বিশেষ এক স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে বিরূপ করে তোলার ব্যাপারে যে সব আচার অনুসৃত হ'ত তার কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। খুল্লনা যাতে সাধুর বিষনজরে পড়ে, সেজন্যে লীলাবতী লহনাকে পরামর্শ দিয়েছে এইভাবে—

পত্রিকার কলাগাছ রোপিয়া অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তাহে দিবে রাত্রি দিনে ॥
নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হবে কিঙ্কর খুল্লনা হবে চেড়ী ॥
শ্মশানের ক্ষীরা আর কবর বিছাতি।
বসন ত্যাজিয়া তাহা আন শেষ রাতি ॥
ইহাই বাঁটিয়া দেহ খুল্লনা বসনে।
খুল্লনা পড়িবে তার বিষের নয়নে ॥
চূণে পানে খয়েরে করিয়া তার ক্ষার।
কালো গরুর গাঁজা আন ঔষধের সার ॥
দুর্গার মুখের আর আন হরিতাল।
উপরাগ সময়ে আনহ বেড়াজাল।
দুই বস্তু কপালে রাখিবে সাবধানে।
সোহাগ বাড়িবে তব দুর্গার সমানে ॥
আনিবে আধুলি কীট ফণিফণা হৈতে।
তাবিজ গড়াইয়া রাখিবে বাম হাতে ॥
* * *
যতনে আনিবে জোড়া অশ্বত্থের দল।
দুর্গার প্রদীপ তৈলে পরিবা কাজল ॥
লোচনে কাজল দিয়া চাহ একবার।
সাধুকে করিয়া দিব যেন কণ্ঠহার ॥

[লহনার প্রতি লীলাবতীর ঔষধ ব্যবস্থা ; পৃঃ ১০৮-১০৯, ঐ]

স্পষ্টতঃই শেষাংশে সাধুকে কি ভাবে বশীভূত করা যাবে, তার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মোটের ওপর স্বামীকে কোন একজনের প্রতি বিরূপ অথবা আসক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ কতকগুলো আচার এবং উপকরণ যে ক্রিয়াশীল, এখানে সেই বিশ্বাসই বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্য চরিতামৃতে'ও বিশ্বাস এবং সংস্কার বিধৃত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাঠাকুরাণী সদ্যোজাত গৌরাঙ্গকে দেখতে যাবার সময় সঙ্গে নানাবিধ উপহার-সামগ্রী নিয়েছিলেন। এ সবের মধ্যে ছিল—

ব্যাঘ্রনখ হেমজাঁড়ি কটি পট্টসূত্র ডোরী
হস্তপদের যত আভরণ।

[আদিলীলা ; পৃঃ ৭১ ; বসুমতী সংস্করণ]

ব্যাঘ্রনখ শিশুকে পরালে শিশু উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় বলে বিশ্বাস। তাই অনেকেই শিশুকে সংস্কারবশতঃ ব্যাঘ্রনখ ধারণ করান। সীতা ঠাকুরাণী গৌরাঙ্গের জন্যে যে অন্যান্য আভরণের সঙ্গে ব্যাঘ্রনখও নিয়ে গিয়েছিলেন, এখানে তার উল্লেখ লক্ষণীয়।

অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্যে শিশুর বিশেষ কয়েকটি নামকরণ করা হয়ে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস, এর ফলে অশুভ শক্তির দৃষ্টি থেকে শিশু মুক্ত থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গের নামকরণ করা হয়েছিল নিমাই, কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে চরিতামৃতকার বলেছেন ঃ

ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই ।। [আদিলীলা ঃ পৃঃ ৭২ ; ঐ]

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও আমরা বেশ কিছু বিশ্বাস এবং সংস্কারের সন্ধান পাই। যেমন,

লাংটি চিপি শাপ দেন রাজাক মঙ্গলবার দিনা ।।৭৫
[গোপীচন্দ্রের গান ; জন্ম ; পৃঃ ৫]

বাংলার লোক-বিশ্বাসে মঙ্গলবার এবং শনিবার black magic বা কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল প্রয়োগের প্রশস্ত দিন। মঙ্গল পাপগ্রহ এবং এই গ্রহের নামাঙ্কিত বারটিকেও পাপাশ্রিত বলে মনে করা হয়। তাই মঙ্গলবার কোন শুভকাজ করা হয় না। তাছাড়া এইদিন কাউকে অভিশাপ দিলে তা ব্যর্থ হয় না বলে বিশ্বাস। এই জন্যেই মহাদেব মাণিকচন্দ্রকে মঙ্গলবারে অভিশাপ দিয়েছিলেন লক্ষ্য করা যায়।

হরিবোল বলিয়া ছিনান করিয়া।
কালো ধবল পাঠা দেও বলিছেদ করিয়া ।।
[গোপীচন্দ্রের গান ; জন্ম ; পৃঃ ৫]

দেবতার কল্পিত রঙের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সেই রঙের পশু দেবতার উদ্দেশে বলি দেবার সঙ্কল্প করলে দেবতা অধিকতর সন্তুষ্ট হন এবং ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন বলে সংস্কার প্রচলিত। সেই হিসাবে কালো ধবল পাঠা বলি দেবার বিষয়টি এখানে উল্লিখিত হতে দেখা গেছে। সাধারণতঃ মিত্র দেবতার কাছে সাদা রঙের বলি এবং কালী বা বরুণ দেবতার উদ্দেশে কালো প্রাণী বলি দেওয়া হয়ে থাকে।

কালা-ধলা পাঁঠা মানত করার কথা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'তেও বর্ণিত হয়েছে—

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলাত লাগ্ছে কাঁটা।
বাদ্যার ছেড়ী মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঁঠা ॥

অবশ্য গ্রীয়ারসন সংগৃহীত পাঠে কাল পাঁঠার কথার উল্লিখিত হয়নি, উল্লিখিত হয়েছে কেবল ধলা পাঁঠার কথা।

লোক-বিশ্বাসে 'জীউ' বা আত্মা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। প্রাণীর মৃত্যুর পর তার আত্মা দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। এই বিশ্বাস পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বিশেষত আদিমজাতির সমাজে প্রচলিত। আরও ধারণা হল যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য 'জীউ' কে ইচ্ছা করলে পাত্রমধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায়। এই বিশ্বাস থেকেই গোদা যম কর্তৃক সদ্যোমৃত মাণিকচন্দ্রের জীউকে লেংটিতে বেঁধে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে—

মরণনুড়ি দিয়া রাজাক দুই ডাঙ্গ দিল।
রাজার জীউ গোদা যম লাংটিতে বান্ধি নিল ॥
[গোপীচন্দ্রের গান ; জন্ম ; পৃঃ ১৮]

মনসামঙ্গলেও অনুরূপ বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়—

সোনা রূপার কৌটাতে অনি-উষাকে ভরিয়া।
চম্পা নগরে যান জিতেন্দ্রিয় হঞা।
—বিষ্ণু পাল।

কোন দুর্ঘটনা বা অশুভ কিছু ঘটার আগে তার আভাস পাওয়া যায় বলে লোক-বিশ্বাস প্রচলিত। 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও তার পরিচয় রয়েছে। ময়না তার সিঁথের সিঁদুর এবং হাতের শাঁখা যা নাকি এয়োতির চিহ্ন, তা মলিন দেখে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে ভাবী বিপদের আশঙ্কায়ঃ

শীষের সিন্দুর হাতের শংখা মৈলান দেখিল।
কপালত চড়িয়া ময়না কান্দন জুড়িল ॥ [জন্ম ; পৃঃ ১৮]

একই কথা তিনবার উচ্চারণ করে যে শপথ করা হয় তাকে বলা হয় তিনসত্যি করা। লোক-বিশ্বাস তিনসত্যি করার পর কারো পক্ষে তা আর রক্ষা না করে উপায় থাকেনা। কারণ তিনসত্যি করার পরও যদি তা রক্ষিত না হয়, তাহলে শপথ ভঙ্গকারীর মহা অকল্যাণ হবার সম্ভাবনা।

'গোপীচন্দ্রের গানে'ও এই বিশ্বাসের প্রমাণ রয়েছে। গোপীচন্দ্র তার মা ময়নামতীকে দিয়ে তিন সত্যি করিয়ে নিয়েছে—

এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য করি।
যদি তোমাক ছাড়িয়া পালাই প্রাণ ফাইটা মরি ॥ ৫৪০
[বুঝান ; পৃঃ ৭৪]

এইবার সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' থেকে কিছু উদাহরণ উদ্ধার করা গেল। সন্তান জন্মগ্রহণের পর ছ' দিনের দিন নবজাতকের মাথার কাছে দোয়াত, কলম, মিষ্টি ইত্যাদি রেখে দিতে হয়। বিশ্বাস হল ঐদিন বিধাতাপুরুষ স্বয়ং এসে জাতকের ভাগ্যলিপি রচনা করে যান। লখিন্দরের জন্মের ছয় দিনের দিন সনকা এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট আচার পালন করেছিলেন বলে মনসামঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে :

সনকা সুন্দরী ষষ্ঠীপূজা করি
যাহার যে রীতি আছে।
হাতে অস্ত্র লৈয়া রহিল বসিয়া
মসিপত্র লৈয়া কাছে ॥
অর্ধরাত্রি গেলে বিধি হেনকালে
লিখিতে আইল ভালে। [লখিন্দরের জন্ম ; পৃঃ ১৫]

চিরুনদাঁতী রমণী অত্যন্ত অলক্ষণে বলে লোক-বিশ্বাস প্রচলিত। এইরকম রমণীর স্বামী অকালমৃত্যু বরণ করে বলে বিশ্বাস। লখিন্দরের মৃত্যুতে শোক বিহ্বলা সনকা বেহুলাকে এই বলে গালাগাল দিয়েছেন—

খণ্ড-কপালিনী তুই বেহুলা চিরুনদাঁতী।
বিভা-দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি ॥ ২০ ॥
[সনকার ক্রন্দন ; পৃঃ ৪৫]

নগরের কুলকামিনীরাও বেহুলাকে একই ভাবে ভর্ৎসনা করে বলেছে—

তুই উচ্চ কপালিনী হও চিরুনদাঁতিনী
বাসরে খাইলে প্রাণনাথ ॥ ৩৬ ॥
[বেহুলার কলার মান্দাসে ভাসিবার প্রস্তাব ; পৃঃ ৪৮]

কেতকাদাসের কাব্যেও মনসা কর্তৃক তিনসত্য করার কথা বর্ণিত হয়েছে—

সত্য সত্য তিনবার বলেন বিশ্বমাতা।
শুনহ দেবতাগণ বেহুলার কথা ॥

[সদাগরের ডিঙ্গা উদ্ধার ও বেহুলার দেশে গমন ; পৃঃ ৮০]

পরিশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্য থেকে কয়েকটি বিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ করা হল। কেউ হাঁচলে তৎক্ষণাৎ 'জীব' বলতে হয়। এইকারণে সুন্দরের আচরণে ক্ষুব্ধ রাজকুমারী বিদ্যার মান ভাঙ্গানোর জন্যে কুমার সুন্দর ইচ্ছাপূর্বক নাকে কাঠি দিয়ে হেঁচেছে, যাতে বিদ্যাকে 'জীব' বলতে হয়—

চতুর কুমার ভাবে জীব বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুর কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না কহিয়া ॥

[ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ; বিদ্যাসুন্দর ; পৃঃ ৪০, বসুমতী সংস্করণ]

বিবাহিতা রমণীর হাতে আর কিছু না থাক অন্ততঃ পক্ষে একখানি লোহার নোয়া রাখতেই হয়, এটি হ'ল সধবা রমণীর চিহ্ন। লোহা ধারণ করলে স্বামীর কল্যাণ হয় বলে সংস্কার। পদ্মিনী বলে এক দুঃস্থা রমণী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি ॥

[অন্নদামঙ্গল, পৃঃ ১১৬]

ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী-যাত্রা বর্ণনা প্রসঙ্গে যাত্রাকালীন নানা মাঙ্গলিক বস্তু ও দৃশ্যের বর্ণনা দান করেছেন কবি। যেমন—

ধেনুবৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতিটানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল। [মানসিংহ, পৃঃ ১৩৮]

এইভাবে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের বিশ্বাস এবং সংস্কারের সন্ধান পেতে পারি, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় যেগুলি মূল্যবান উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হবার দাবী রাখে।



অন্য ভূমিকায় : জীবজন্তু ও অন্যান্য প্রাণী

পৃথিবীতে অসংখ্য জীব-জন্তুর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি প্রাণীকেই সংস্কারের জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা গেছে। মানুষকে যদিও ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব বলে বলা হয়, তবু তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যাপারে যে এক চরম অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে তার থেকেই সৃষ্ট হয়েছে অসংখ্য সংস্কার; আর এই সব সংস্কারের অনেকগুলির সঙ্গেই যোগ রয়েছে বেশ কিছু প্রাণীর। আসলে মানুষ এইসব প্রাণীদের মাধ্যমে ভবিষ্যতের শুভাশুভ ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যেসব প্রাণী আমাদের চারপাশের মধ্যেই অবস্থান করে, যেগুলির সঙ্গে আমাদের প্রতিদিন সাক্ষাৎকার ঘটে, সেইসব প্রাণীদের নিয়েই সৃষ্ট হয়েছে সংস্কার। অপরপক্ষে যে সব প্রাণী মোটামুটি আমাদের নাগালের বাইরে, যেগুলি সহজলভ্য নয়, স্বাভাবিক কারণেই সেই সব প্রাণীদের আর সংস্কারের জগতে স্থান লাভ ঘটেনি। এই কারণে বেড়াল, কুকুর, গরু, ভেড়া, কিংবা ইঁদুর, বাদুড়, ব্যাঙ, টিকটিকি, মৌমাছি, প্রজাপতির মত প্রাণীদের অবাধ রাজত্ব যেখানে, সেখানে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, হরিণের মত প্রাণীরা সংস্কারের জগতের বাইরে থেকে গেছে।

আমাদের সমাজে প্রজাপতির সঙ্গে শুভ বিবাহের যোগ কল্পনা করা হয়েছে। অনূঢ়া কন্যা কিংবা অবিবাহিত কোন পুরুষের গায়ে যদি প্রজাপতি এসে বসে অথবা প্রজাপতি এদের নিকটবর্তী স্থানে উড়ে বেড়ায়, তখন কল্পনা করা হয় অবিবাহিত ছেলে অথবা অবিবাহিতা কন্যার শীঘ্র বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। এমনকি বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রেও প্রজাপতির প্রতিরূপ মুদ্রিত করার রেওয়াজ আজও রয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য

দেশে প্রজাপতিকে আমাদের মত করে দেখা হয় নি। বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রজাপতিকে মৃত ব্যক্তির আত্মা বলে কল্পনা করা হয়ে এসেছে। আর এই কারণে প্রজাপতিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখার একটা রীতি রয়ে গেছে—কারণ কে বলতে পারে আমাদের কোন প্রিয় মৃত জনের আত্মা সে নয়!

প্রাচীনকালে মিশরে বিশ্বাস করা হ'ত যেমন করে গুটিপোকা ছেড়ে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে, তেমনি কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার দেহ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে তার আত্মা। বর্মায় সংস্কার প্রচলিত আছে কোন প্রাণী যখন নিদ্রা যায়, তখন 'win-laik Pya' বা আত্মারূপ প্রজাপতি তার দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং অন্যান্য মানুষ বা প্রাণীদের আত্মাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। আবার আত্মারূপ প্রজাপতির মালিক যখন জেগে ওঠে, তখন 'win-laik Pya' তার যথাস্থানে ফিরে আসে। এইজন্যে বর্মায় ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় যাতে তারা নিদ্রিত কোন ব্যক্তিকে আচমকা না ডাকে। কারণ সেক্ষেত্রে নিদ্রিত ব্যক্তির দেহ রূপ খোলস ত্যাগ করে যে 'win-laik Pya' বেরিয়ে গিয়েছিল, সে যথাসময়ে তার খোলসে নাও প্রত্যাবর্তন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিদ্রিত ব্যক্তিটির মৃত্যু সুনিশ্চিত।

স্কটল্যাণ্ডে বিশ্বাস করা হয যদি সোনালী রঙের কোন প্রজাপতি কোন মৃত ব্যক্তির কাছে উড়তে থাকে, তাহলে মৃত ব্যক্তিটির কল্যাণ সাধিত হয়। অবশ্যই মৃতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথাই এইখানে ধরা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডেও প্রচলিত আছে মৃত ব্যক্তির শবের কাছে যদি কোন প্রজাপতি উড়তে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে মৃত ব্যক্তির অক্ষয় শান্তিলাভ ঘটবে। যে কোনও সময়ে গাছের পাতার ওপর একসঙ্গে তিনটি প্রজাপতি দেখা অশুভ। যদিও সাধারণভাবে মৃত ব্যক্তির আত্মা বলে প্রজাপতি মারা বা এই প্রাণীটির ওপর নির্যাতন চালান নিষিদ্ধ, কিন্তু ইংলণ্ডের নানা স্থানেই যে সংস্কারটি প্রচলিত আছে তা হ'ল - বছরের শুরুতেই প্রথম যে প্রজাপতিটি দৃষ্টি পথে পড়ে তাকে হত্যা করতে হয়। নতুবা পরবর্তী সারাটা বছরই ঐ প্রত্যক্ষদর্শীর সময় খুব খারাপ যায়। এরকম সংস্কারও চলিত আছে যে বছরের প্রথমেই যদি কেউ হলদে রঙের প্রজাপতি দেখে, তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি শীঘ্রই অসুস্থ হবে। অপর পক্ষে কেউ যদি সাদা রঙের প্রজাপতি দেখে তাহলে তা শুভ লক্ষণের ইঙ্গিতবহ বলে গণ্য করা হয়।

আমাদের সমাজে বাদুড় নিয়ে তেমন কোন সংস্কার রচিত না হলেও বিদেশে এই প্রাণীটির বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান সংস্কারের রাজ্যে।

Oxford shire এ প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বাদুড় যদি কোন গৃহকে তিন বার চক্রাকারে অতিক্রম করে তাহলে বুঝতে হবে সেই গৃহে কারো মৃত্যু আসন্ন। সন্ধ্যের ঠিক মুখেই যদি বাদুড়ের দল বেরিয়ে উড়তে থাকে এবং খেলায় মত্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে রমণীয় আবহাওয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। কারো মাথায় যদি হঠাৎ করে বাদুড় পড়ে যায়, তাহলে Manx-এর অধিবাসীরা বিশ্বাস করে যে সেই ব্যক্তি বিরল সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হয়। আবার 'wilkiems' এ সংগৃহীত বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় স্কটল্যাণ্ডের মানুষেরা যখন দেখে কোন বাদুড় ওপরে উড়ে হঠাৎ করে নীচেয় নেমে আসে তখন তারা ধরে নেয় যে ডাইনীদের আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত উপস্থিত। কেবল যারা ডাইনীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তারাই এইসময় রেহাই পেয়ে যায়, নতুবা এই সময়ে ডাইনীদের হাত থেকে কারো রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকে না। একটি বাদুড় দর্শনে অনেক সময় দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাই ছড়া কেটে বলতে শোনা যায়—

Black bat bear away,
Fly over here away,
And come again another day,
Black bat bear away.

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সংস্কারেই কাক ঠিক তার জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের দেশে যাত্রা সম্পর্কিত সংস্কারে বলা হয়েছে যাত্রাকালে শুষ্ক ডালে যদি কোন কাককে বসে থাকতে দেখা যায় তবে তা অশুভ। তাছাড়া কাকেরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে যদি দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে অতিথির আবির্ভাব ঘটবে। বাড়ীর সংলগ্ন কোন অংশে দুটি কাককে যদি নিজেদের মধ্যে খাবার খেতে দেখা যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও বাড়ীতে অতিথির সমাগম ঘটবে বলে সংস্কার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কাককে মূলতঃ দুর্ভাগ্য ও মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে। যাদুকরী বিদ্যায় কাকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে কাক ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস দানে সিদ্ধ। সাধারণভাবে একটি কাক দেখা অশুভ বলে গণ্য করা হয়। বিশেষতঃ কেউ যদি সকালে বাঁ দিকে কোন কাককে ডাকতে শোনে, তাহলে তার পক্ষে তা খুবই অশুভ বলে মনে করা হয়। একটি কাক যদি কোন বাড়ীর ছাদের ওপর দিয়ে তিন-তিনবার উড়ে যায় অথবা ছাদের আলসেয় গিয়ে বসে, অথবা বাড়ীর জানলার কাছে বসে পক্ষ সঞ্চালন

করে, তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে ঐ বাড়ীর কারোর মৃত্যু আসন্ন। কাক যদি কোন বাড়ীর কাছে তিনবার ডাকে, অথবা বাড়ীর ওপর দিয়ে যদি কাক উড়ে যায় তবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। একটি গাছে বসে থাকা সব কাক হঠাৎ যদি ঐ গাছ ত্যাগ করে চলে যায়, তাহলে দুর্ভিক্ষ বা এই ধরনের কোন বড় বিপদ আসছে বলে ধরে নেওয়া হয়। কাকের সঙ্গে আবহাওয়ারও একটা সম্পর্ক আছে বলে অনেক জায়গায় মনে করা হয়। যেমন সকালে যদি কাকদের সূর্যের দিকে উড়তে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে আবহাওয়া ভাল যাবে বলে ধরে নেওয়া যায়। কাকের সংখ্যার সঙ্গেও ভাল-মন্দ জড়িত। যেমন আমেরিকার Mary land-এ প্রচলিত ছড়ায় বলা হয়েছে একটি কাক দেখা মানেই দুঃখ ভোগ, দু'টি কাক দর্শনে সেক্ষেত্রে লাভ হয় আনন্দ, তিনটি কাক দেখলে হয় বিবাহ আর চারটি দেখার অর্থ কারো জন্মগ্রহণ—

One crow—sorrow,
Two crows—mirth,
Three crows—wedding,
Four crows—birth.

কাকের মত পেঁচারও একটা বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় সংস্কারের ক্ষেত্রে। আমাদের সমাজে কালপেঁচা ডাকলে অর্থহানি ঘটে বলে বিশ্বাস। অপরপক্ষে রাত্রে সাদা পেঁচা বা লক্ষ্মীপেঁচা দেখা শুভ, সেক্ষেত্রে অর্থলাভ ঘটে। আবার দিনেরবেলায় বাড়ীর চালে পেঁচা বসা অশুভ বলে বলা হয়ে থাকে। এইবার বিদেশে প্রচলিত সংস্কারে পেঁচা বা পেঁচার ডাককে কিভাবে দেখা হয় তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সে কোন সন্তান সম্ভবা নারী যদি পেঁচার ডাক শোনে, তাহলে সেই নারীর কন্যা সন্তান হয় বলে বিশ্বাস। ওয়েলস্-এ বসত বাড়ীর মাঝখানে যদি পেঁচার ডাক শুনতে পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় কোন কুমারী মেয়ের কুমারীত্ব নষ্ট হল। জার্মানীতে কোন গর্ভবতী রমণী যদি পেঁচার ডাক শোনে, তাহলে ঐ রমণী যে সন্তান প্রসব করে তার জীবন হয় খুব অসুখী।

প্রাচীনকালে মৌমাছিদের স্বর্গীয় দূত বা বার্তাবহ বলে মনে করা হত। শুধু তাই নয় এরা ভবিষ্যৎ-বাণী করাতেও দক্ষ এরকম ধারণাও প্রচলিত ছিল। বিশেষত খ্রীষ্টান ঐতিহ্যে মৌমাছিদের ত ক্ষুদ্র পাখা বিশিষ্ট ভগবানের ভৃত্য বলে গণ্য করা হয়। হঠাৎ করে যদি বাড়ীতে কোন মৌমাছি এসে উপস্থিত হয়, তাহলে তা সৌভাগ্যের সূচক বলে মনে করা

হয় অথবা ধরা হয় বাড়ীতে অনতিবিলম্বে কোন অভ্যাগতের আবির্ভাব ঘটবে। বাড়ীতে মৌমাছি এসে প্রবেশ করলে কখনও তাকে তাড়িয়ে দিতে নেই বা ধরতে নেই। অর্থাৎ মৌমাছিকে তার ইচ্ছামত বাড়ীতে থাকতে দিতে হয় অথবা তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে উড়ে যেতে দিতে হয়, কোন বাধার সৃষ্টি করতে নেই। কারণ যদি মৌমাছিকে ধরা হয় অথবা তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে সৌভাগ্য সুখ বিনষ্ট হয় বলে বিশ্বাস। ওয়েলস-এ বিশ্বাস করা হয় যে কোন ঘুমন্ত শিশুর চারপাশে যদি কোন মৌমাছি উড়ে বেড়ায় তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ শিশুটি সৌভাগ্য সুখ লাভের অধিকারী হবে। ইংলন্ডের কোন কোন অঞ্চলে এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে মৌমাছিরা যদি অলস হয়ে যায়, মধু সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে বুঝতে হবে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে। কোন বাড়ীর ছাদে যদি মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে, তাহলে ঐ বাড়ীর মেয়েরা অবিবাহিত থাকে, তারা আর বিবাহ করে না। মৌমাছি এবং মৌচাক সম্বন্ধে আরও একটি সংস্কার প্রচলিত আছে। সেটি হ'ল যে বাড়ীতে মৌচাক তৈরী হয়, সেই বাড়ীর মালিকের সঙ্গে মৌচাকের মৌমাছিদের গভীর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এর থেকেই রীতি গড়ে উঠেছে যে বাড়ীর সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মৌমাছিদের জানানো কর্তব্য। বাড়ীতে যদি কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে অথবা কারো বিবাহ হয়, কোন ব্যাপারে কারো সাফল্যলাভ অথবা দুঃখ ভোগ কিংবা কারো মৃত্যুর ঘটনা এ সবই, বিশেষত গৃহকর্তার মৃত্যু সংবাদ অবশ্যই মৌমাছিদের জানাতে হয়। গৃহকর্তার সংবাদ জানানোরও একটা বিশেষ রীতি আছে। সেটি হ'ল - গৃহকর্তার মৃত্যু হলে গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র অথবা তাঁর বিধবা পত্নীকে দরজার লৌহনির্মিত চাবি দিয়ে মৌচাকে তিনবার আঘাত করে বলতে হয়, কর্তার মৃত্যু হয়েছে। এরকমটা করা না হলে মৌচাকের মৌমাছিরা মারা পড়ে অথবা তারা মৌচাক ছেড়ে পালিয়ে যায় আর এর ফলে বাড়ীতে নতুন বিপদ দেখা দেয়। লোক-বিশ্বাস এবং সংস্কারে মৃত্যুর সঙ্গে মৌমাছিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে এমন ধারণাও ছিল যে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা কিছু সময়ের জন্যে মৌমাছি হয়ে যায়। কোন কারণ ছাড়াই যদি মৌমাছিরা মৌচাক ছেড়ে চলে যায়, তাহলে যে বাড়ীতে মৌচাকটি অবস্থিত, সেই বাড়ীতে কারো মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা, আর এক্ষেত্রে বিশেষ করে গৃহস্বামীর মৃত্যুর সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে ওঠে।

টিকটিকি নিয়েও বেশ কিছু সংস্কার রচিত হয়েছে। যেমন আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে কারো বাঁ দিকে টিকটিকি পড়লে সে রাজা হয়।

আবার এমন সংস্কারও প্রচলিত আছে—কারো বামে টিকটিকি ডাকলে তার কাজে নাকি বাধা পড়ে। একটি প্রবাদে ত এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে।

অর্থাৎ যাত্রাকালে হাঁচি বা গায়ে যদি টিকটিকি পড়ে তাহলে আটগুণ লাভ হয়। এইবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কারে টিকটিকিকে কিভাবে দেখা হয়েছে তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে কনের পক্ষে টিকটিকি খুবই এক অশুভ প্রাণী। ইউরোপের অনেক দেশে এই সংস্কার প্রচলিত যে কন্যাপক্ষেরা বিবাহ উপলক্ষে চার্চে যাবার সময় তাদের যাত্রাপথ যদি কোন টিকটিকি অতিক্রম করে যায়, তাহলে কন্যার বিবাহ সুখের হয় না। ফ্রান্সে প্রচলিত আছে টিকটিকি যদি কোন স্ত্রীলোকের হাতের ওপর দিয়ে চলে যায়, তাহলে ঐ স্ত্রীলোকটির হাতের সেলাই খুব ভাল হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডে আবার এমন এক সংস্কার প্রচলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি একটি টিকটিকিকে চাটতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তির জিভ বিশেষ এক শক্তির অধিকারী হয়ে যায়, ঐ ব্যক্তি যদি কারোর কোন ক্ষত তার জিভ দিয়ে চেটে দেয়, তাহলে ক্ষতস্থান নিরাময় হয়ে ওঠে। টিকটিকি সম্পর্কে আরও একটি অভিনব ধারণা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বিশ্বাস করা হ'ত গৃহের বাইরে শয়নকারী কোন ব্যক্তিকে যদি সাপ কামড়াতে আসত, তখন টিকটিকি ঐ ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করত সর্পাঘাত জনিত মৃত্যুর হাত থেকে।

সংস্কাবের রাজ্যে ব্যাঙও তার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের সমাজে বলা হয় ব্যাঙ মেরে চিৎ করে রাখলে বৃষ্টি হয়। আবার অতিবৃষ্টি থামাতে দুটো ব্যাঙ ধরে তাদের সিঁদুর, হলুদ আর তেল মাখিয়ে বিয়ে দিতে হয়। যেহেতু জলের জীব ব্যাঙ তাই বৃষ্টি নামানো অথবা বন্ধের ব্যাপারে এই প্রাণীর এক বিশেষ ভূমিকাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশেও বৃষ্টির সঙ্গে ব্যাঙকে যুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে। যেমন দিনের বেলা যদি ব্যাঙ ডাকে তাহলে বৃষ্টি নামে। একরকমও ধারণা প্রচলিত আছে যে একটি ব্যাঙকে হত্যা করলে বৃষ্টি নামে। নিদেন পক্ষে ঝড় ওঠে। ব্যাঙ দেখা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার—এমন সংস্কারও রয়েছে। শুধু তাই নয় কোন ব্যাঙ যদি স্বেচ্ছায় কারো বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে সেই বাড়ীর পক্ষে খুব শুভ ব্যাপার কিছু ঘটবে বলে বিশ্বাস করা হয়। অল্প বয়সের ব্যাঙ গুরুতর পীড়া নিরাময়ে সমর্থ এমন কি এই ধরণের ব্যাঙ প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক উন্নত করে বলে বিশ্বাস।

ইঁদুর সংক্রান্ত সংস্কারগুলিতে মূলতঃ দুর্ভাগ্য ও মৃত্যুর সঙ্গে ইঁদুরের সম্পর্কের কথাই বলা হয়েছে। যেমন কোন বাড়ীতে, আগে যেখানে ইঁদুরের উপদ্রব ছিল না সেখানে যদি প্রচুর ইঁদুরের আবির্ভাব ঘটে কিংবা বিপরীত ক্রমে যে বাড়ী ছিল ইঁদুর অধ্যুষিত অথচ বিনা চেষ্টাতেই সেই বাড়ী থেকে ইঁদুর যদি উধাও হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে ঐ বাড়ীর কোন ব্যক্তির মৃত্যু নিকটবর্তী। কোন অসুস্থ ব্যক্তির শয্যার পেছন থেকে যদি ইঁদুর ডাকে তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির আর নিরাময় লাভ ঘটেনা। সুস্থ অথবা অসুস্থ যেমনই হোক কোন ব্যক্তির ওপর দিয়ে যদি ইঁদুর চলে যায়, শীঘ্রই ঐ হতভাগ্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে বলে বিশ্বাস। কোন সাদা রঙের ইঁদুর যদি ঘরের মেঝে অতিক্রম করে চলে যায়, তাহলে তা মৃত্যুর সম্ভাবনাকে বহন করে আনে। প্রাচীনকালে ইঁদুরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করা হত। এমন কি আত্মার দৃষ্টি গ্রাহ্য রূপ হ'ল ইঁদুর —এমন ধারণা প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ সেই ধারণা থেকেই ইঁদুরের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে।

আমাদের দেশে ভেড়া নিয়ে কোন সংস্কার সৃষ্টি না হলেও পাশ্চাত্য দেশে এই প্রাণীটিকে নিয়ে সংস্কার গড়ে উঠেছে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বাস করা হয় বসন্তকালে যদি ভেড়া দেখা যায় তবে এই সময়ে প্রথম দৃষ্ট ভেড়াটি সৌভাগ্য-সুখ এনে দেয়। অবশ্য শুধু দেখলেই চলবেনা, যে ভেড়া দেখবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শী যে, তার দিকেই ভেড়াটিকে মাথা ঘোরাতে হবে। যদি ভেড়ার মাথা অন্যদিকে ঘোরান থাকে তাহলে তা সৌভাগ্যের পরিবর্তে দুর্ভাগ্যসূচক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত কৃষ্ণ বর্ণের প্রাণীদের সংস্কারের জগতে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে কিন্তু ভেড়ার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। অর্থাৎ প্রথম দৃষ্ট ভেড়াটি কৃষ্ণবর্ণের হলে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাগ্য ভাল বুঝতে হবে। শুধু তাই নয়, এই রকম ভেড়াকে দেখে যদি মনে মনে কিছুর বাসনা করা হয়, তবে তাও নাকি ফলবতী হয়।

সংস্কারে যে সব প্রাণীর আধিপত্য এক কথায় রাজকীয়, বেড়াল তাদের অন্যতম। বেড়ালকে নিয়ে যে কত অজস্র সংস্কার দেশে-বিদেশে তৈরী হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আর আমরা সহজেই এর কারণটা বুঝি। বেড়াল বা কুকুর আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক এ দুটি প্রাণীকে আমরা প্রত্যহই দেখে থাকি ঘরে অথবা বাইরে কিংবা ঘরে বাইরে দু'জায়গাতেই। অতএব এ হেন প্রাণী যে সংস্কার জগতে সহজেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী হবে, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখা যাক বেড়াল নিয়ে প্রচলিত সংস্কারগুলির চরিত্র কি রকম।

পৌষমাসে বাড়ী থেকে কাউকে তাড়াতে নেই, এমন কি এই সময় বাড়ী থেকে বেড়াল—কুকুরকে তাড়ানোর ব্যাপারেও নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের সমাজের একটি সংস্কারে রাত্রে বাড়ীতে বেড়াল এলে তাকে তাড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। অপর একটি সংস্কারে বলা হয়েছে বেড়ালকে হত্যা করতে নেই। হত্যা করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্তে মৃত বেড়ালের ওজনের সমান সোনা অথবা লবণ দান করতে হয়। অন্যত্র প্রচলিত আছে বেড়াল হত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মৃত বেড়ালের ওজনের সমান লবণ খাল বিল কিংবা পুকুরের জলে ফেলে দিতে হয়। রাতের বেলায় বেড়ালের কান্না শোনা খুবই খারাপ বলে বিশ্বাস প্রচলিত। বাড়ীতে কালো বেড়ালের আনাগোনাকেও মোটেই সুনজরে দেখা হয় না। কারণ এতে নাকি বাড়ীর কারোর মৃত্যু ঘটতে পারে। আবার ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম বেড়ালের মুখ দেখাও খারাপ বলে বলা হয়ে থাকে। কারণ তাহলে সমগ্র দিনটি খারাপ যায়।

এইবার দেখা যাক পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই প্রাণীটিকে কিভাবে দেখা হয়ে থাকে। প্রথমেই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে নেওয়া যেতে পারে যে পাশ্চাত্ত্য দেশে বেড়ালকে সৌভাগ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে মিশরীয়রা পুরুষ বেড়ালকে সূর্য দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপ এবং স্ত্রী বেড়ালকে চন্দ্রের প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করত। আমাদের সমাজে যদিও কালো বেড়ালকে অলক্ষ্মণে বলে বিশ্বাস করা হয়, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কালো বেড়ালকে সৌভাগ্যদাতা বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, বিশেষতঃ যদি কোন কৃষ্ণ বর্ণের বেড়াল কারো যাত্রা পথ অতিক্রম করে যায়। এমন কি কোন কালো বেড়াল যদি নিজের থেকেই বাড়ীতে এসে প্রবেশ করে অথবা কোন জাহাজে এসে ওঠে, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা খুব একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে গণ্য করা হয় এবং কোন ক্ষেত্রেই এই প্রাণীটিকে তাড়িয়ে দিতে নেই, দিলে তাড়নাকারীর সৌভাগ্য সুখ এই প্রাণীটি সঙ্গে করে নিয়ে যায় বলে ধারণা। বেড়াল যদি আগুনের কাছে পেছন ফিরে বসে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়—শীঘ্রই ঝড় হবে। যাত্রা কালে যদি কোন বেড়ালকে কাঁদতে শোনা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যাত্রা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে বেড়ালের কান্না থামিয়ে তবেই যাত্রা করা বিধেয়। হঠাৎ করে যদি বেড়াল খুব তীব্র গতিতে দৌড়তে থাকে কিংবা মেঝের কার্পেট আঁচড়াতে থাকে তাহলে ধরে নেওয়া হয় ঝড় আসছে। বেড়াল যদি একবার হাঁচে, তবে তা শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু যদি তিনবার হাঁচে, তাহলে যে বাড়ীতে তার অবস্থান, সেই বাড়ীর লোকেদের ঠাণ্ডা লাগে।

ইয়র্কশায়ারের উপকূলে খনিতে নামবার সময় কর্মীরা কখনও 'cat' কথাটি উচ্চারণ করে না। জেলেনী যদি কালো বেড়াল পোষে, তাহলে তার স্বামী অর্থাৎ জেলে নির্বিঘ্নে সমুদ্র থেকে ফিরে আসে বলে বিশ্বাস। অভিনেতারা ভুলেও বেড়ালের গায়ে পদাঘাত করে না। থিয়েটারে যদি বেড়াল দেখা যায় তবে তা খুবই শুভ ঘটনা বলে মনে করা হয়। কিন্তু অভিনয় চলাকালে যদি বেড়াল মঞ্চ অতিক্রম করে চলে যায়, তবে তা খুবই অশুভ। পূর্ব ইয়র্কশায়ারে যেখানে কালো বেড়ালের অধিকারী হওয়া খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার, সেক্ষেত্রে কালো বেড়ালের দেখা পাওয়া দুর্ভাগ্যের সূচক। আমেরিকা এবং ইউরোপে সাদা বেড়ালকে ক্ষতিকারক এবং অশুভ বলে মনে করা হয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কুকুর অশরীরী আত্মা—যেমন ভূত প্রেত, ডাইনী, পরী ইত্যাদিদের দেখতে পায় বলে বিশ্বাস করা হয়। অর্থাৎ মানুষ তার চর্মচক্ষুতে যা না দেখতে পায়, কুকুর তা অনায়াসে দেখতে পায়। ওয়েলস্-এ 'Annwn'-এর মৃত্যু আনয়নকারী শিকারীকুকুর, কেবল পার্থিব কুকুরদেরই দৃষ্টিগোচর হয় বলে সংস্কার প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে গ্রীসে যখন 'Hecate' রাস্তার সংযোগস্থলে ঘোরাফেরা করছিল, তখনও কুকুরেরা তার উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্য একসঙ্গে তুমুল চীৎকার করেছিল বলে বলা হয়ে থাকে। 'Hecate' মৃত্যু ঘোষণা করতেই উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের দেশের মতন পাশ্চাত্যদেশগুলিতেও কুকুরের ডাককে অশুভ লক্ষণ বলেই বিবেচনা করা হয়। বিশেষত রাত্রে যদি কুকুর ডাকে, তাহলে তা মৃত্যুর সূচক হয়ে দাঁড়ায়। যে বাড়ীতে কেউ অসুস্থ অবস্থায় আছে, সেই বাড়ীর সামনে যদি কোন কুকুর একটানা ডেকে চলে, তাহলে বুঝতে হবে অসুস্থ রুগীটি আর বাঁচবে না। আবার কুকুর যদি হঠাৎ একবার অথবা তিনবার ডেকেই চুপ করে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সেই মুহূর্তে কারো মৃত্যু ঘটলো। পোল্যান্ড এবং জার্মানীর কোন কোন অংশে এই রকম সংস্কার প্রচলিত আছে যে একসঙ্গে অনেকগুলি কুকুর যদি ডাকে, তাহলে শীঘ্রই প্লেগ বা মহামারী আত্মপ্রকাশ করে। বেদে বা যাযাবর জাতীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যে কোন কুকুর যদি কারো বাগানে প্রবেশ করে গর্ত খোঁড়ে, তাহলে বুঝতে হবে ঐ পরিবারের কারো মৃত্যু ঘটতে চলেছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বাস করা হয় কোন অপরিচিত কুকুর যদি কোন আগন্তুককে অনুসরণ করতে থাকে, তাহলে তা সৌভাগ্যের ইঙ্গিতবহ। আয়ার্ল্যান্ডে ভোরবেলায় কেউ যদি চীৎকাররত কোন কুকুরকে প্রথমে দেখে, তাহলে তা তার পক্ষে খুবই অশুভ।

ইংলণ্ডে কোন ব্যক্তি ব্যবসায়িক কোন কাজকর্মের ব্যাপারে যাত্রা করার সময় যাত্রাপথে যদি দাগ বিশিষ্ট অথবা সাদা-কালোয় মেশানো কোন কুকুরকে দেখে, তাহলে তার ব্যবসায়িক কাজকর্ম সাফল্যমণ্ডিত হয়। লিঙ্কনশায়ারে আবার এক বিচিত্র সংস্কার প্রচলিত আছে। কোন সাদা কুকুর দেখতে পেলে যতক্ষণ না এরপর সাদা রঙের ঘোড়া চোখে পড়ছে, ততক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করতে হয়। তানাহলে কোন দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটে যাবার সম্ভাবনা। জেলেরা সমুদ্রবক্ষে কখনও 'dog' শব্দটি উচ্চারণ করেনা এমনকি কোন কোন উপকূল অঞ্চলের মানুষ শুধু 'dog' শব্দটিই উচ্চারণ করেনা তাই নয়, নৌকা করে কখনও কোন কুকুরকে নিয়ে যায় না।

গরু নিয়ে আমাদের দেশেও যেমন বেশ কিছু সংস্কার আছে, তেমনি আছে বিদেশেও। যেমন আমাদের সমাজে গরু বাছুর মারা গেলে কাঁদতে বারণ করা হয়েছে। কারণ এতে নাকি অমঙ্গল হয়। গরুর দুধ কি করে ভাল করা যায় সেই প্রসঙ্গে সে সংস্কারটি আছে তা হল গরুর প্রসব হলে ফুল পড়ার আগে গরুটির লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত মেপে সাতগাছি কলমীলতা গরুকে খাইয়ে দিতে হয়। যাতে কেউ গরুর দুধ চালতে না পারে সেজন্যে ছেঁড়া জালের টুকরোতে কচ্ছপের খোসা, কড়ি, ঝাঁটার টুকরো—সব একসঙ্গে বেঁধে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয়। যাত্রাকালে গরুর কাশি শুনলে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাছাড়া যাত্রার সময়, বাঁধা অপেক্ষা কোন ছাড়া গরু দেখতে পাওয়া শুভের ইঙ্গিত। বিশেষত সেই গরু যদি আবার মাথা তুলে তাকায়। বেরোবার সময়ে গরু হাঁচলে বেরোতে নেই, বেরোলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। গরু চুরি করাকে আমাদের সমাজে মহা অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। লোক-বিশ্বাস এই যে গরু চোরের মৃত্যু অনিবার্য। গরু প্রসব করার পর গরুর গলায় যদি আধখানা নারকোল মালা ফুটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গরু এবং তার বাছুর উভয়েরই ভাল হয়।

বিদেশেও গরুকে নিয়ে অনেক সংস্কার তৈরী হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি কালো গরুর দুধ ভাল। কিন্তু ইংলণ্ডে লাল গরুর দুধ অন্য সব বর্ণের গরুর দুধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়। স্কটল্যাণ্ডে আবার সাদা গরুর দুধ অন্য যে কোন রঙের গরুর দুধের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে ধারণা প্রচলিত। মধ্য রাত্রের পর গরু ডাকলে নিকটস্থ স্থানে কারোর মৃত্যু ঘটে। কোন মানুষের মুখের ওপর যদি গরু তিনবার ডাকে সেই ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু ঘটে বলে বিশ্বাস। অনেক আমেরিকানের বিশ্বাস যে লাল গরুর মাংস সর্বোৎকৃষ্ট।



লোক শিক্ষায় লোক-সংস্কৃতি

প্রবন্ধটির শিরোনাম দেখেই পাঠকের মনে হতে পারে বুঝিবা লোক-সংস্কৃতিকে নিয়ে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, নতুবা লোক-শিক্ষার ক্ষেত্রে লোক-সংস্কৃতিকে ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে কেন।

আমাদের প্রচলিত ধারণায় লোক-সংস্কৃতি নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষদের অবসর সময়ে সৃষ্ট অবসর অপনোদনের কিছু উপকরণ মাত্র। শহুরে মানুষ ইদানীং ড্রইং রুম সাজানোর ক্ষেত্রে লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণকে ব্যবহার করতে কিছুটা এগিয়ে এসেছেন, তবু এই ব্যাপারে এখনও যে কিছুটা করুণার ব্যাপার নেই তা বলা যায় না। অর্থাৎ খরা কবলিত গ্রামের অসহায় মানুষগুলিকে কিংবা বন্যা প্লাবিত হতভাগ্যদের যেমন করুণার দান করে আমরা মানবিক ধর্ম পালন করে থাকি, অনুরূপ ভাবে লোকশিল্প বা লোক-সংস্কৃতির প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা মিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমরা যেন এর স্রষ্টাদের বাধিত করতে চাই। যদিও স্পষ্টভাবে তা স্বীকার করিনা, বরং প্রমাণ করতে সচেষ্ট হই সোচ্চার ভাবে আমাদের শিল্পপ্রেমকে। আপাতত শহরের মানুষদের মানসিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় ইতি দেওয়া যাক, দেখা যাক লোক-শিক্ষায় লোক-শিল্পকে কতখানি কাজে লাগান যেতে পারে। বলা বাহুল্য লোক-সংস্কৃতি একটা সামগ্রিক ব্যাপার, সম্পূর্ণভাবে তাকে আমাদের আশু প্রয়োজনে লাগানোর কোন প্রশ্ন ওঠেনা, তবে এর বিভিন্ন উপকরণ উপাদানকে যে আমাদের অভীষ্ট ব্যাপারে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই বর্তমান আলোচনাটি।

আমরা জানি আমাদের সুবিশাল দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরেও চরম অশিক্ষা কিংবা কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন

হয়ে আছেন। এতে যে কেবল এই হতভাগ্য মানুষরাই বঞ্চিত হয়েছেন তা নয়, তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরাও অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত। দেশের সামগ্রিক স্বার্থেই সকল মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা আবশ্যক। নতুবা রবীন্দ্রনাথের সেই সতর্কবাণী সত্য হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে আরও হবে।

'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিবে।'

এমনিতেই এখনও আমরা দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষাকেই সুলভ করে তুলতে পারিনি, জনসংখ্যার অনুপাতে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনতিবিলম্বে যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে এমন কথাও বলা যায় না। এজন্য প্রয়োজন অর্থের, প্রয়োজন আন্তরিক প্রযত্নের। কিন্তু ততদিন কি দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবেন? দেশের স্বার্থেই কি তাদের শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে না? সরকার অবশ্য ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। যেমন বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের কাজে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নেমে পড়েছেন। শুরু হয়েছে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার প্রসার। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ যে দুটি মাধ্যমের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করে এসেছেন, বর্তমানে সেই দুটি শক্তিশালী মাধ্যমকে আমরা প্রায় ত্যাগ করে বসে আছি। এ দুটি মাধ্যমের একটি হ'ল যাত্রা, অপরটি কথকতা। রবীন্দ্রনাথও এ দুটি মাধ্যমের প্রতি ছিলেন বিশেষভাবে আস্থাবান। 'ইতিহাস কথা'য় তিনি এ দুটি শক্তিশালী মাধ্যম প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন:

'আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে তাহা যাত্রা এবং কথকতা। .. প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।...... কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণকে স্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখান যাইতে পারে। এমনকি সামান্য স্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব তার চেয়ে অনেক ভালো করিয়াই শেখানো যাইতে পারে।'[১]

অন্যত্রও কবিগুরু বলেছেন যাত্রা এবং কথকতার শিক্ষণীয় দিক সম্পর্কে—

১. রবীন্দ্র রচনাবলী; ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪৯।

'আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাইনা…।'[২]

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও নিরক্ষর। কিন্তু আমাদের দেশের পৌরাণিক আখ্যানগুলি দেশের নিভৃততম অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষ-গুলিরও অজানা নয়। এর মূলে এই যাত্রা কথকতার দানই সর্বাধিক। যাত্রা এবং কথকতা মূলতঃ পৌরাণিক ঘটনাবলীকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইদানীং যাত্রায় সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকেও প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। শুধু জনগণের মনোরঞ্জন নয়, সেইসঙ্গে তাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সচেতন ক'র তুলতে সুচিন্তিত বিষয়গুলিকে যাত্রা এবং কথকতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এইসব বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই থাকবে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জাতীয় সংহতির পরিপুষ্টি সাধনে সহায়ক কাহিনী, সর্বনাশা নেশার পরিণাম ইত্যাদি।

লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু যাত্রা কিংবা কথকতাই নয়, লোক-সংস্কৃতির অন্যান্য উপকরণ গুলিকেও সুচিন্তিতভাবে কাজে লাগান যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আর একটি আকর্ষণীয় উপাদানের— পুতুলনাচ। জাভা ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার রাজবাড়ীতে ছায়াভিনয় দেখে ভেবেছিলেন,

'… এমনি করে যদি স্কুলে ইতিহাস শেখানো যায়, মাষ্টার মশায় গল্পটি বলে যান আর একজন পুতুল খেলাওয়ালা প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলো পুতুলের অভিনয় দিয়ে দেখিয়ে যেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব অনুসারে নানা সুরে তালে বাজনা বাজে—ইতিহাস শেখানোর এমন সুন্দর উপায় আর কী হতে পারে?'[৩]

প্রচলিত ধারণায় পুতুলনাচ নিছক বালখিল্যদের আনন্দদানের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এরই মধ্যে সন্ধান পেয়েছিলেন ইতিহাস শিক্ষাদানের একটি কার্যকরী মাধ্যমকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটিকে সহায়ক হিসাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু লোকশিক্ষার ক্ষেত্রেও পুতুলনাচ যে গুরুত্বপূর্ণ

২. স্বদেশী সমাজ; রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৭০৭।

৩. রবীন্দ্র রচনাবলী; পৃঃ ৬৫১।

ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এর সহায়তায় আমরা মনীষী বিশেষের জীবন কাহিনী, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা এবং অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারি।

কিছুকাল পূর্বে পুরুলিয়ার বলরামপুরে ছাতা পরবে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে পুতুল নাচের সাহায্য গ্রহণ চোখে পড়ল। কুষ্ঠ রোগ অন্যান্য রোগের মতই একটি রোগ কোনো পাপের ফল এ নয়, তাছাড়া অধিকাংশ কুষ্ঠরোগই নিরাময়যোগ্য। সময়মত এই রোগের চিকিৎসায় কুষ্ঠ পুরোপুরি নিরাময় হয় এসব তথ্য জনগণ বেশ আগ্রহ সহকারেই নিচ্ছিলেন দেখা গেল। অন্যান্য রোগ এবং সেগুলির প্রতিষেধক বিষয়েও পুতুলনাচের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

লোকশিক্ষাদানের ব্যাপারে আমরা পরিচিত তরজা এবং কবিগানকেও সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে পারি। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবেশ দূষণ, দেশ ও জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য, স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ বিধি, এমনকি কৃষি সংক্রান্ত নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এই সবের মাধ্যমে জনগণের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে। একই উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন প্রকারের লোকসঙ্গীতকেও ব্যবহার করতে পারি। অবশ্যই বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনার জন্য আমাদের সাহায্য নিতে হবে লোককবি এবং শিল্পীদের। আমরা জানি 'জারি গান' করুণ রসাত্মক গান। মুসলমান সমাজেই এই গানের বেশী কদর। কারবালার মর্মান্তিক কাহিনী এই গানের বিষয়বস্তু। কিন্তু এই জারিগানের ফর্মকে যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মত কাজে সার্থকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাইনা। একটি জারি গানের অংশ বিশেষ উদ্ধার করে দেওয়া গেল বাস্তব প্রমাণের জন্য—

ও ভাই জাগোরে জাইগ্যা কথা কও।
মূর্খ নাম ঘুচাইতে খাতা কলম লও।
সামনে আন্ধাইর, পাছে আন্ধাইর আন্ধাইর চারিধার
এই আন্ধারে কত কাল রইবে পড়ে আর ॥
ও ভাই জাগোরে ॥
কোন্ বা দোষে চিরকাল মূর্খ রইবে ভাই,
মূর্খ লোকের এই দুনিয়ায় কোন মূল্য নাই।

চোখ থাকতে অন্ধ তোমরা, কান থাকতে কালা,
ভদ্দর লোকে গালি দেয়—'ওরে মূর্খ শালা'।
ও ভাই জাগো রে ॥

পেটের খাটুনী অষ্ট প্রহর বইয়া থাকেনা ;
বিদ্যাধন পাইবার লাগিল্ একটু খাটনা।

বিছানাতে শুইবার আগে কষড়া হরফ পড় ;
এক দুই কড়ি তোড়াতুড়ি যোগের অংক কর ।।
ও ভাই জাগো রে ॥

মূর্খতা ভাই পাপের বোঝা দূরে ফেল্যা দেও ;
একটু অবসর পাইলে সবাই বিদ্যা শিখ্যা নেও।

পাশুরিয়া সকল দুঃখ থাক্‌বা তুমি সুখে।
দিবানিশি হাসি তোমার লাইগ্যা থাক্‌বো মুখে।

ধন্য অইব গেরাম তোমার ধন্য অইব দেশ ;
ধন্য অইব মাতা পিতা, ধন্য অইব খেল ॥
ও ভাই জাগোরে ॥[৪]

একটি জারি গান রচিত হয়েছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে—

শুনুন শুনুন ভাই সকল
শুনুন দিয়া মন ;
দুখো মিয়ার গল্প করি,
করি জয় কীর্তন ॥
ভাইও……
ভাইও…এগারই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঝলমলে দিনটিতে,
তেরোশত ছয় মাস তখন বাংলা পঞ্জিতে।
আঁধার ঘরে মানিক হয়ে এলো দুখো মিয়া,
মাতা-পিতা দুখো ডাকে বড় ব্যথা নিয়া।

৪. বাংলা দেশের লোক সংগীত পরিচিতি ; মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী. পৃঃ ২৬২।

শুনুন শুনুন ভাই সকল
শুনুন দিয়া মন।
চার ছেলে মারা যাওয়ার পর
দুখোর হইল জনম ॥
ভাইও ৫

এইভাবে নজরুলের সমগ্র জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই ধরনের গানের মাধ্যমে শ্রোতৃমণ্ডলী যত সহজে বর্ণনীয় বিষয়কে অন্তরে গ্রহণ করবে শত বক্তৃতাতে তা করবে না।

লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি মাধ্যম খুব সার্থক, তা হল পটশিল্প। পটের মাধ্যমে প্রধানতঃ পৌরাণিক কাহিনী, দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য ইত্যাদিই পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিশেষভাবে লোকশিক্ষার জন্য নির্মিত পটের মাধ্যমে আমরা নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গ্রামের নিরক্ষর মানুষগুলির সামনে উপস্থিত করতে পারি। উপস্থিত করতে পারি জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যা এবং তার সমাধানের সহজ সরল উপায়, কৃষি ঋণ লাভের প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী, অস্পৃশ্যতার অসারতা কিংবা পণপ্রথার কুফল। জনমত গঠনে এইভাবে লোক-সংস্কৃতিকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগান যেতে পারে।

লোক নৃত্যকেও যে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব তার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। পুরুলিয়ার বলরামপুরে ছৌ নাচের মাধ্যমে পরিবেশিত হতে দেখেছি বৃক্ষ ছেদনের কুফলগুলিকে অত্যন্ত সার্থক ভাবে রসোত্তীর্ণ করে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়কেও ক্রমশঃ লোকনৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা সম্ভব যাতে জনমত গঠিত হতে পারে।

শিক্ষার সার্থকতা সেইখানে, যখন তা আনন্দের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। যে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের কোন সম্বন্ধ নেই, সে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বলাবাহুল্য লোক সংস্কৃতিকে যখন লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, তখন তা আনন্দময় এক পরিবেশের সূচনা করবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষাদান বা গ্রহণ মোটেই নীরস থাকবেনা। দ্বিতীয়তঃ, এইসব মাধ্যমগুলির সঙ্গে দেশের মানুষের প্রাণের যোগ। এবং কোনটিই দেশের মানুষের কাছে

৫. বাংলা দেশের লোক সংগীত পরিচিতি ; মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী ; পৃঃ ২৬৪।

অপরিচিত নয়। তাই এইসব মাধ্যমগুলিকে সাধারণ মানুষ যত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে, তেমনটি অন্য কোন কিছুকে গ্রহণ করবেনা। তৃতীয়তঃ, এইসব মাধ্যমগুলির কোনটিই তেমন ব্যয়বহুল নয়। তাই সহজেই সরকারী কিংবা বেসরকারীভাবে এইসব উপাদান গুলিকে কাজে লাগান যেতে পারে। সর্বোপরি দেশের বেশ কিছু লোকশিল্পী এবং লোক কবিকে এইসব কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। এর ফলে নিযুক্ত ব্যক্তিরা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও অনেকখানি উপকৃত হবেন। আর সর্বোপরি গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনেও অনেকখানি সহায়তা করা হবে।

এইসব আলোচনার শেষে পাঠকের মনে হতে পারে লোক-সংস্কৃতির মাধ্যমে নিরক্ষর মানুষদের কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সচেতন করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু তাতে কি তাদের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করা যাবে ? নিছক ছবি আঁকার মত কয়েকটি বর্ণকে পরপর সাজিয়ে নিজের নামটি কোনক্রমে দস্তখৎ করাকে যদি আমরা সাক্ষর বলে বিবেচনা করি, তবে সে তুলনায় কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সচেতনতা লাভ নিঃসন্দেহে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অক্ষর জ্ঞান হল উপলক্ষ্য, লক্ষ্য তো বিষয় বিশেষের ওপর অধিকার অর্জন। তাই অক্ষর জ্ঞানের ব্যাপারটা যদি ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ হয়, তবে সেক্ষেত্রে সরাসরি নিরক্ষর মানুষ-গুলিকে শিক্ষিত করে তুলতেই কি আমাদের অধিকতর সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য হবে না ? মনে রাখতে হবে নিরক্ষর মানেই কিন্তু অশিক্ষিত হওয়া নয়।



গ্রামীণ সংস্কৃতির একাল ও সেকাল

খুব বেশিদিনের কথা নয়—কয়েক বছর আগের কথা। মুর্শিদাবাদ জেলার কুমীরদহ গ্রামে যাচ্ছিলাম। যান বলতে গরুর গাড়ী। পথ অনেকটা। তাই কুমীরদহে পৌঁছবার অনেক আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ক্রমেই সে অন্ধকার ঘনীভূত হতে থাকল। মেঠোপথ ধরে গরুর গাড়ী কিন্তু সমানেই চলতে লাগল। হঠাৎ অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলোর লেলিহান শিখা চোখে পড়ল। একটু ভয় পেলাম। এই অন্ধকারে মশাল জেবলে সামনে কে বা কারা অপেক্ষারত? কি তাদের উদ্দেশ্য? কিন্তু না, একটু পরেই সমস্ত সংশয়ের অবসান করে দিল গাড়ীর চালক। বললে আমরা গ্রামের সীমানার মধ্যে পৌঁছে গেছি। তাই গ্রামবাসীরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে—মশাল নয়, মশালের মত করে পাকানো খড়ের আঁটি কিংবা গাছের শুকনো পাতা আগুনে জেবলে। কিছুদূর অন্তর অন্তরই এই একই দৃশ্যের অবতারণা ঘটছিল। বাংলার গ্রামকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম, আবিষ্কার করলাম গ্রামীণ সংস্কৃতির মূল সত্তাটিকে যা নাকি নানা প্রতিকূলতা এবং পরিবর্তনের মধ্যে আজও হারিয়ে যায়নি তা হ'ল আতিথেয়তা, মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর আন্তরিকতা।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগোচিত পরিবর্তন ঘটবেই। একে কে প্রতিহত করবে? একদিকে যেমন শহরের বিস্তার ঘটছে, তেমনি গ্রামীণ সংস্কৃতিও প্রভাবিত হচ্ছে নানা ভাবে। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বসে আমরা যদি প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির অবিকৃত রূপটি আশা করি, তাহলে নিরাশ হতে হবে। তবু একবার সমীক্ষা করে দেখা যেতে পারে গ্রামীণ সংস্কৃতির সেকাল এবং একালটিকে।

সাধারণভাবে সংস্কৃতি একটি জাতির সামগ্রিক পরিচয়ই বহন করে। তাই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হ'ল আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান,

ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষা-দীক্ষা, খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি। এছাড়া জীবন যাপনের যাবতীয় বস্তু ও উপকরণ এমন কি সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, দর্শন, মূর্তি, স্থাপত্য—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসবও অপরিহার্য।

আপাতভাবে মনে হতে পারে যে নগর-সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির পার্থক্য অনেক। কিন্তু উপাদান প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। পার্থক্য যেটুকু আছে, তা হ'ল মনের ক্ষেত্রে। নগর-সংস্কৃতি যেখানে সূক্ষ্ম, জটিল, মার্জিত, বিচিত্র এবং মননাশ্রিত সেক্ষেত্রে গ্রামীণ সংস্কৃতি সরল, স্বতঃস্ফূর্ত ও গতানুগতিক। যোগাযোগ, সংমিশ্রণ কিংবা সাঙ্গীকরণের জন্য নগর সংস্কৃতি যেখানে নিত্যই পরিবর্তনশীল, সেখানে গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রধানতঃ ঐতিহ্যনির্ভর হওয়ায় প্রকৃতিতে তা অকৃত্রিম হলেও নগর-সংস্কৃতির মত মননশীল নয়।

আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দৈব এবং সংস্কারের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতা। গ্রামীণ অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। তাই অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, শস্যধ্বংসকারী কীটের উপদ্রব ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেতে মানুষ নানাবিধ সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। গ্রামীণ মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে—অমাবস্যায় হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। এই বিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত হয়েছে—'কুঁড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে' প্রবাদটি। জ্যৈষ্ঠমাসে বৃক্ষরোপণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অম্বুবাচীর সময় বীজবপন এবং ভূমিকর্ষণের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কৃষক নিজের জমিতে বীজ ফেলার আগে অন্য কাউকে বীজ দেয় না, কারণ তাহলে তার নিজের জমির চাষ ভাল হবে না এই আশঙ্কায়। বিশ্বাস করা হয়ে এসেছে সরষে বোনার আগে জলে হাত লাগাতে নেই, সোমবার ধান লাগালে ধানের ফলন বাড়ে, কিংবা মেঝের ওপর ধান রাখলে সেই ধানের আর চারা হয় না।

বৃষ্টি সংক্রান্ত সংস্কারের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। দু'একটির মাত্র উল্লেখ করা গেল – ব্যাঙ ঘন ঘন ডাকলে বৃষ্টি নামে, সদাচারী ব্যক্তিকে রোদে কষ্ট দিলে বৃষ্টি নামে, স্বেচ্ছায় আছাড় খেলে অতিবৃষ্টি বন্ধ হয়, কিংবা অতিবৃষ্টি বন্ধ করতে দুটো ব্যাঙ ধরে তাদের সিঁদুর-হলুদ আর তেল মাখিয়ে বিয়ে দিতে হয়। আমরা বুঝতে পারি একদিকে জীবনের প্রতি আসক্তি, অপরদিকে জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনায়ত্ত—এই অবস্থায় মানুষের পক্ষে সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আজ বিজ্ঞানের যখন চরম অগ্রগতি ঘটেছে,

তখনও কিন্তু কৃষিজীবী মানুষকে জলসেচের জন্য সেই প্রকৃতির আশিস-ধারার ওপরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল থাকতে হয়। কিংবা ট্রাক্টরের মত যতই কেন উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার চালু হোক, তবু ভূমিকর্ষণে সেই মান্ধাতার আমলের বলদে টানা লাঙল আজও কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে মুখ্য সহায়ক। তাই কৃষি বা বৃষ্টি সংক্রান্ত সংস্কার আগের মত অনুসৃত না হলেও একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি স্বীকার করতে হয়।

বর্তমানে সব গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, স্থাপিত হয়েছে হাসপাতাল বা প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র। গ্রামের অনেক মানুষই আজ জানেন যে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেগুলির ব্যবহারে নিরাময় লাভ সম্ভব। বহু মানুষ এসব ঔষধের ব্যবহার করেন, রোগ নিরাময়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। তবু একথা স্বীকার্য যে প্রয়োজনের তুলনায় এই সব স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসক কিংবা ঔষধ ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের খুবই অপ্রতুলতা। যারা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য লাভে বঞ্চিত তারা ত বটেই, এমন কি যারা সাহায্য লাভ করে তাদেরও এক বিরাট অংশ আজও সেই দীর্ঘকালের প্রচলিত গাছ গাছড়া, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, জলপড়া, তাবিচ-মাদুলি ধারণ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। এই সঙ্গে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব এবং সেগুলির নিরাময়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর সক্রিয় প্রভাব সম্পর্কে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বাস চলে আসছে। যেমন, বসন্তের সঙ্গে যুক্ত দেবী হলেন শীতলা, কলেরা ওলাবিবি, জ্বরের জ্বরাজ্বরি, সাপের বিষহরি, খোস পাঁচড়ার ঘেঁটু। তাই বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা আজও গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত। হয়ত আগের তুলনায় এসবের সংখ্যা কিছু হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায়নি একেবারে। তাছাড়া রোগ নিরাময়ের জন্য দেব-দেবীর কাছে মানত আজও প্রচলিত।

গ্রামীণ সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল শিল্পকলা। যদিও ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই লোক-শিল্পের উদ্ভাবন ঘটেছিল, কিন্তু শুধু প্রয়োজন মেটানোর দিকেই গ্রামের শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখেননি. প্রয়োজন অতিরিক্ত একটা সৌন্দর্যচেতনারও পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন—যে পরিচয় আমরা পেয়েছি নকশী কাঁথা, নকশী পাখা, নকশী পাটি, নকশী শিকা, নকশী পিঠা, নকশী ছাঁচ, আলপনা, পোড়া-মাটির মূর্তি ও খেলনা, শীতলপাটি, শৌখিন মাটির হাঁড়ি, মুখোশচিত্র পটচিত্র, ঘটচিত্রাদিতে। এখন এসবের অনেকই বিলুপ্তির পথে। জীবন সংগ্রামে লিপ্ত মানুষ একদিকে যেমন তার সৌন্দর্য চেতনাকে অনেকাংশে

হারিয়েছে, তেমনি মৃন্ময় ইত্যাদি উপকরণাদির স্থান গ্রহণ করেছে প্ল্যাস্টিক, পলিথিন, এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী তৈজসপত্রাদি। আজ শিকা তৈরীতে কিংবা ঝাঁটার বিচিত্র বিন্যাসে মুগ্ধ হবার সুযোগ আমরা কমই পাই।

গ্রামের মানুষের আনন্দলাভের উপকরণ ছিল দীর্ঘকাল পর্যন্ত কীর্তন, কথকতা, যাত্রা, পাঁচালীগান, লোকসঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদি। কিন্তু আজ এসব উপকরণকে গ্রাস করেছে সিনেমা, বেতার, রেকর্ডপ্লেয়ার। সুদূর গ্রামাঞ্চলেও সামাজিক অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাইকের ব্যবহার বেশ চোখে পড়ার মত। সঙ্গীতে যে সব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল এককালে অপরিহার্য, আজ সেই একতারা, বেনা, দোতারা, সারিন্দা কিংবা ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশী, ভেঁপুর স্থান গ্রহণ করছে বা ইতিমধ্যে করেছে হারমোনিয়াম, তবলা, গীটার, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্রগুলি।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামের মানুষের জীবনে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। এইসব খেলার বাহ্যিক উপকরণ যৎ-সামান্য, নেই বললেই চলে। খেলাধুলার বৈচিত্র্যও কম ছিল না। কোনটি ছিল শ্রম সাপেক্ষ শরীর চর্চার খেলা যেমন—হাডুডু, লাঠিখেলা ইত্যাদি, আবার কিছু ছিল শ্রমহীন আনন্দের খেলা যেমন বাঘবন্দী, ষোলঘুটি, একাদোক্কা, কড়িখেলা, কানামাছি, ঘুটিখেলা ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক খেলার মধ্যে ছিল কাদামাটি, পাতা খেলা, চুঙ্গা খেলা ইত্যাদি। আজ এসবের অনেক-গুলিই ইতিমধ্যে বিস্মৃত। যেগুলি আজও টিঁকে আছে তাদের অবস্থাও খুব সঙ্গীন। তার বদলে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ক্যারাম, লুডো, ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদি ক্রমেই জাঁকিয়ে বসছে।

গ্রামের সঙ্গে শহরের সংযোগ যত বাড়ছে, যানবাহনের সুযোগ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, লেখাপড়ার প্রসার ঘটছে, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সর্বোপরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে গ্রামের মানুষের মানসিকতা পরিবর্তিত হচ্ছে, যার প্রতিফলন ঘটছে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে। ইতিমধ্যেই ময়ূরপঙ্খীর দিন অস্তমিত, পাল্কীর অবস্থাও তথৈবচ, অদূর ভবিষ্যতে গ্রামের শিশু যদি তার অভিভাবককে প্রশ্ন করে পাল্কী কি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ পাল্কীর তুলনায় আকাশের উড়োজাহাজের সঙ্গে তার পরিচয় অনেক বেশি গভীর, গভীরতর পরিচয় রেলগাড়ীর সঙ্গে।



লোক-সংস্কৃতি চর্চায় আচার্য সুকুমার সেন

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরী, সারস্বত সাধনার কিংবদন্তী পুরুষ আচার্য সুকুমার সেনের যথার্থ পরিচয় ভাষাতাত্ত্বিক রূপে এবং সেই সঙ্গে অকল্পনীয় পরিশ্রম সঞ্জাত 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসকার রূপে, কিন্তু আচার্য সেনের বহুধা বিস্তৃত প্রতিভার পরিচয় আমরা যেমন মৌলিক গল্পরচনার ক্ষেত্রে পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি অন্যান্য নানা ক্ষেত্রেও। তাঁর নিরতিশয় কৌতূহল ছিল নানা বিষয়েই, আর তাই তাঁর অনুসন্ধিৎসা মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর প্রজ্ঞার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা তাঁর লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কিত কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ও মৌলিক চিন্তাভাবনার পরিচয় লাভ করব, এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ তিনি রচনা করেন নি। তথাপি লোক-সংস্কৃতি চর্চায় তাঁকে মনোযোগী পুরুষ রূপে আমরা পেয়েছি। আপাতভাবে মনে হতে পারে, বুঝিবা লব্ধ প্রতিষ্ঠ ভাষা-তাত্ত্বিক, সাহিত্যবেত্তা ও ভারততত্ত্ববিদ্ সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করা হচ্ছে। কিন্তু তা যে নয়, তার প্রমাণ এবারে দাখিল করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য ও অন্ত্য তথা আধুনিক যুগের আলোচনায় আচার্য সেন লোকসাহিত্যের দ্বারা আমাদের পরিশীলিত সাহিত্য কতখানি প্রভাবিত তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীর স্বরূপ নির্ণয়ে কিংবা মঙ্গলকাব্যের বিশ্লেষণে, লৌকিক দেবদেবী, লোকধর্ম ইত্যাদির প্রসঙ্গ ও প্রভাব বিষয়ে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে স্বতঃই প্রমাণিত হয় তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গি এবং প্রগাঢ় জ্ঞান সম্পর্কে। আমাদের লৌকিক উৎসব

কলার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আচার্য সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন, 'গ্রাম দেবতার পূজা ছাড়া আরও অনেক গ্রাম্য উৎসব ছিল। ভাদ্র ও পৌষ এই দুই ফসল তোলার সময়ে এমনই ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব লাগিত। এই উৎসবের ক্ষীণরেশ রহিয়া গিয়াছে। এখনকার দিনে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাদু ও টুসু পরবে এবং বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র পরিচিত ছেলে-মেয়েদের পোষলা ও তোসলা অনুষ্ঠানে। প্রাচীন ইন্দ্রধ্বজোৎসব ভাদুর মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে। তোসলা বা পোষলা পরব এ দেশের খুব প্রাচীন প্রথা, অশোকের কলিঙ্গ অনুশাসনে ইহার ইঙ্গিত আছে।' অন্যত্র আচার্য সেন বলেছেন, 'পৌষ মাস ফসল তোলার কাল। ভাদ্র মাস, কার্তিক মাস ও অগ্রহায়ণ মাসও তাই। ভাদ্র মাসের উৎসব ইন্দ্রপূজার সঙ্গে অথবা বাস্তুপূজার সঙ্গে মিলিয়া গিয়া পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে ভাদুপরব হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে আবার ইন্দ্রপূজা অগ্রহায়ণ মাসের শস্য উৎসবের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। এ উৎসব এখন পশ্চিম বাঙ্গালায় অবিবাহিত বালিকাদের ইতু পূজায় পরিণত। পৌষ মাসের উৎসব মানভুমে তুসু রূপে ভাদু পরবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে' (পৃঃ ৯০)।

পুতুল নাচ, পটুয়া সঙ্গীত ইত্যাদির উদ্ভব ইতিহাসেরও বর্ণনা করেছেন লেখক, উল্লেখ করেছেন মুখোশ ব্যবহারের প্রসঙ্গ, মূকাভিনয়ের প্রসঙ্গ—

'দেব মাহাত্ম্যময় গীতি দীর্ঘ হইলে গেয় বস্তুর 'পঞ্চালিকা' অর্থাৎ পুতুল রূপ (puppet) দেখানো হইত। অর্থাৎ পুতুল নাচের সঙ্গে চলিত নাচ গান। পুতুলের অভাবে, ছোট আসর হইলে, পট দেখাইয়া গান চলিত' (পৃঃ ৯১)।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে দুইশ্রেণীর নৃত্যাভিনয় প্রচলিত ছিল। পাত্রনৃত্য ও প্রেরণনৃত্য। পাত্রনৃত্যের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে আচার্য সেন জানিয়েছেন, 'পাত্র নৃত্যে দেব বা মানব ভুমিকার উপযোগী মুখোশ ও সাজ পরা হইত, যেমন এখনো দক্ষিণ পশ্চিম বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় 'ছো' বা 'ছোউ' নাচে দেখা যায়।' আচার্য সেন প্রসঙ্গত জানিয়েছেন, 'ছো ছোউ শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করি।' আরও অনেক মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের দেশে নাটকাভিনয় রীতির উদ্ভব পুতুল নাচ হইতে।'

আচার্য সেন ঝুমুরের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'জম্ভলিকা' নাচ হইতে আসিয়াছে রাজস্থানী ঝমাল গান। বাঙ্গালায় ইহা একদিকে 'ধামালী'তে অপরদিকে 'ঝুমুর'এ পরিণত' (পৃঃ ৯১)।

ডঃ সেন মনে করেছেন ঋতুসংহারের আদি উৎস লোকগীতি এমনকি কালিদাস তাঁর ঋতুসংহারের কল্পনা লোকগীতি থেকেই পেয়েছিলেন বলে তিনি মনে করেছেন।

'ঋতু সংহারে নায়ক নায়িকার কাছে প্রকৃতির বারমাসের ভোগ সম্ভার উপাহৃত হইয়াছে ঋতুপর্যায়ের পরিবেশনে। বারমাসিয়ায় প্রধানত বিরহ-ব্যথারই ফিরিস্তি। কিন্তু ঋতুসংহারের সঙ্গে প্রকারান্তরে এই মিল থাকিলেও ঋতুসংহার হইতে সোজাসুজি আসে নাই। আসিয়াছে প্রাচীনতর লোকগীতি হইতে' (পৃঃ ৯৫)।

সেন মশাই ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে সংকলিত ও ভাঙা সংস্কৃতে রচিত 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে কয়েকটি বাংলা ছড়া ও গানের সন্ধান যেমন পেয়েছেন, তেমনি প্রাচীনতর ভাদু গানেরও হদিস দিয়েছেন এই গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সংকলিত ভাটিয়ালী রাগে গেয় একটি সংগীতকে—

হঙ যুবতী পতিয়ে হীন
গংগা সিনাইবাক জাইয়ে দিন।
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ
বায়ু না ভাংগ ছোট গাছ ॥ ১ ॥
ছাড়ি দেহ কাহ্নু মুঞি জাঙ ঘর
সাগর মধ্যে লোহার গড় ॥ ধ্রু ॥ ইত্যাদি।

সিলেটী নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত 'চন্দ্রমুখীর পুথি'র উপসংহারে উদ্ধৃত ভেলা শাহের একটি প্রাচীন মারফতি গান আচার্য সেন মারফতী গানের নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখ করেছেন—

পন্থ চিনলি নারে আরে মনা
ভবের জনম বেথা গেল আর ত আসিব না। ধুয়া।
সাধুর সনে পন্থ লইয়া পন্থের কর দিশা
হারাইলে পুণ্যের পন্থ পাইবার নাই আশা।

সেন মশাই বহু প্রচলিত 'সারি' গানের ব্যুৎপত্তির নির্দেশ করেছেন এবং প্রাচীন সারি গানের দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করেছেন—

'শাড়ি (পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে 'সারি') শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই 'শাড়ি' গানের পরিচয় লুকানো আছে। প্রকৃত সট্ট (অর্থ আস্ফোট শব্দ) হইতে

বাঙ্গালায় 'শাট' (যেমন পাখশাট মালশাট), 'সাড়া' ও 'শাড়ি' শব্দগুলি আসিয়াছে। নৌকার দাঁড়ি ও সুরকি ভাঙ্গা অথবা ছাত পেটানো মজুর দাঁড়ের আঘাতের ও হাতুড়ি-পেটার তালে তালে যে ধরনের গান গাহিত তাহাই 'শাড়ি' গান' (পৃঃ ৩৯৪)। জয়নারায়ণ ঘোষাল বিরচিত 'করুণা নিধান বিলাসে' সংকলিত শাড়ি গানের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন সুকুমার বাবু—

'জলজন্তু ধর‍্যা বন্ভু করে নৌকা মত কৃষ্ণ তাহে মাঝি হন দাঁড়ি গোপী যূথে
কর বৈঠা কঙ্কনেতে বাজিছে পঞ্জনি, সপ্তস্বরে শাড়ি গায় গোপিনী রঙ্গিনী'।

আজ যে বাউলগান অত্যন্ত জনপ্রিয়তার অধিকারী, মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের সহায়তাতেই এর রসসৌন্দর্য আস্বাদনের অধিকারী হয়েছি আমরা। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, "তাঁহার বোধ দিয়েই আমরা বাউল গানের অনুভব গম্য রসের পরিচয় পাইয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথের বহু গান ও গীতি কবিতায় বাউল গানের ভাবভঙ্গি ছন্দ সুরের প্রভাব বিষয়েও সেন মশাইয়ের সন্ধানী দৃষ্টি আলোকপাত করেছে। রবীন্দ্রনাথের "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে", "তুমি আমার আঙ্গিনাতে ফুটিয়ে রাখো ফুল" ইত্যাদি গান গুলিতে বাউল প্রভাব দৃশ্যমান বলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

উইলিয়াম কেরী রচিত "ইতিহাস মালা"য় (১৮১২) বেশ কয়েকটি লৌকিক গল্প স্থান পেয়েছে। ডঃ সেন এই গ্রন্থটির ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। (১৯৭৭)। রেভারেন্ড লালবিহারী দে রচিত "Folk Tales of Bengal" পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা রূপকথা ও ছড়ার প্রতি মনোযোগী হন বলে সেনমশাই তাঁর ধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন, "আমার মনে হয় এই বইটি পড়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলা রূপকথা ও ছড়ার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ও 'সাতভাই চম্পা' কবিতা দুটি লেখা হয়। অবশ্য উল্লেখ করা যায়, সেনমশাইয়ের এই ধারণা তর্কাতীত নয়। প্রথম অবিমিশ্র বাংলা ছড়ার সংকলক ও রূপকথার সংকলক রূপে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দাবীকে সেন মশাই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আশুবাবুর 'ছেলে-ভুলান ছড়া' এবং 'রাক্ষস-খোক্কস' ও 'ভুতপেত্নী'র আনুপূর্বিক পরিচয় আচার্য সেনই প্রথম লিপিবদ্ধ করেছেন। "গল্পের গাটছড়া" (১৩৯২) গ্রন্থে তাঁকে মন্তব্য করতে দেখা গেছে, "ভাষায় আঞ্চলিক গান পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। সংকলককারী কিছুমাত্র কবিত্ব করতে চেষ্টা করেন নি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরে অনেক ভাল ভাল রূপকথার সংগ্রহ ও সংকলন বার হয়েছে কিন্তু সেগুলির কোনটির ভাষা, ভঙ্গি ও ভাব অবিকৃত নেই" (পৃঃ ১২৩, ১২৫)

যে "Folklore" শব্দটির অনুরূপ বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচনে অথবা গঠনে লোক সংস্কৃতিবিদ্‌গণ নানা বিতর্কে যুক্ত হয়েছেন, ডঃ সেনকেও দেখা গেছে সেই বিতর্কের অন্যতম শরিক রূপে। কেননা তিনি Folklore-এর প্রতিশব্দ হিসেবে "লোকচর্যা" শব্দটির প্রস্তাব করেছেন। ঐ পর্যন্ত গেল ডঃ সেনের লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা। এইবার আমরা লোকসংস্কৃতি বিষয়ক তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করব তাতে প্রমাণিত হবে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর অনুরক্তি ও চিন্তা ভাবনা কত সুগভীর ছিল।

ক) ঋগবেদে ঘুম পাড়ানি গান— প্রবাসী ; ভাদ্র ১৩২৮

(খ) বাংলার নারীর ভাষা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩৩ ; চতুর্থ সংখ্যা।

(গ) পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একটি গাথা কবিতা—বিশ্বভারতী পত্রিকা ; ১৩৫২।

(ঘ) লোকসাহিত্য—বেতার জগৎ ; ১৯৫২

(ঙ) ছেলে ভুলানো ছড়া— বেতার জগৎ ; ১৯৫৩

(চ) লোকসাহিত্যে রূপকথা—বিংশ শতাব্দী, ১৩৬৩

(ছ) প্রবচনের প্রচলন—শারদীয় জনসেবক, ১৩৬৫

(জ) রূপকথা ও শকুন্তলা বিশ্বভারতী পত্রিকা ; ১৩৬৬

ঝ) লোকসাহিত্যের ভাষা—বেতার জগৎ ; ৭ই জুন, ১৮৭৭

(ঞ) গল্পের গাঁট ছড়া—শারদীয় আনন্দবাজার ; ১৩৮৪

(ট) রবীন্দ্রনাথ ও গ্রীমের একটি গল্প অমৃত ; ২৬শে বৈশাখ, ১৩৭৬

(ঠ) লোকসাহিত্যের ভাষা—প-ব লো-সং ; জুলাই ১৯৭৩

(ড) ছড়ার ছোড়ান - বেতার জগৎ ; ৪০ বর্ষ ; ২০ সংখ্যা।

(ঢ) লৌকিক গাথা—মধুপর্ণী ; বসন্ত সংকলন। ১৩৬৬

(ণ) বেটা কর্তা ও শাশুড়ী গিন্নী—ঈগল ; ভাদ্র, ১৯৮৬

(ত) পাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া—আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ; ১৩৮৪।

লোক সংস্কৃতি বিষয়ে আচার্য সেন ইংরাজীতেও একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন :

(a) Women's Dialect in Bengali—J. D. L. Vol. XVIII ; 1929.

(b) Folk Loric Back ground of old Bengali literature —The Visva Bharati quarterly, Nov, 1948 - Jan, 1949.

আমাদের ঘুম পাড়ানি ছড়ার প্রাচীনতম নিদর্শন যে ঋগ্বেদে বর্তমান সে তথ্যের সংবাদ সুকুমার বাবুর মাধ্যমেই জানা গেছে। অর্থাৎ ঘুম পাড়ানি ছড়ার অস্তিত্ব যে সুপ্রাচীন, নিতান্ত অর্বাচীন কালের রচনা ঐগুলি নয়, ঐ বিষয়ে আমরা তাঁর মাধ্যমেই সুনিশ্চিত হবার সুযোগ পেয়েছি। তদুপরি যে বেদকে আমরা বলি অপৌরুষেয়, সেই বেদেও যে লৌকিক রচনা স্থান পেয়েছে এ তথ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার প্রবাসীতে "ঋগ্বেদে ঘুম পাড়ানো গান" নিবন্ধে সুকুমার বাবু বলেছেন, "ঋগ্বেদের মধ্যে কতকগুলি লৌকিক কবিতা আছে। তাহাদের মধ্যে কোনটি রোগ আরাম করিবার, কোনটি শত্রুর দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার, কোনটি অমঙ্গল দূর করিবার এবং কোনটি হারানো গরু ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্র; প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়গুলি অথর্ব বেদের নিজস্ব। ঋগ্বেদের বেশীর ভাগ মন্ত্রই দেবতার উদ্দেশে জ্ঞাপন ও যাগাদির জন্য রচিত। সুতরাং তাহার মধ্যে কবির তাৎক্ষণিক অবস্থার বিষয় কিছু জানা যায় না। এইরূপ কবিতাগুলির ৭ম মণ্ডলের ৫৫ সূক্তটি একটি ঘুম পাড়াইবার মন্ত্র; -

"সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা স্বস্তু বিশপতি :
সংসন্তু সর্বে জ্ঞাতয়ঃ সস্ত্বয়মভিতো জনঃ। ৫ ॥

অর্থ হল, "মাতা নিদ্রিত থাকুন, পিতা নিদ্রিত থাকুন, কুকুর নিদ্রিত হউক, পিতামহ নিদ্রিত থাকুন, চারিদিকের লোকসব নিদ্রিত থাকুক।"

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালার নারীর ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে আচার্য সেন কেবল, ভাষাতাত্ত্বিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন নি, মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হাবড়া, হুগলী, বর্ধমান, ২৪ পরগণার মেয়েদের ব্যবহৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন লেখক। সেইসঙ্গে আমরা উপরি পাওনা হিসেবে পাই রসিক সমালোচক সুকুমার সেনের অন্যবিধ পরিচয়। প্রবন্ধটির উপসংহারে ১৭টি প্রবাদ সংকলিত হয়েছে, সংকলিত হয়েছে একাধিক ছড়াও। ছড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের মেয়েদের যে পরিচয় উপস্থাপিত, তার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সচেতন লেখকের তীক্ষ্ন মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য, 'বাঙলার মেয়েদের সঙ্কীর্ণতা যেমন, প্রতিবেশিনীর উপর হিংসা আর বিদ্রূপ, বাপের ঘর থেকে সদ্য বিচ্ছিন্ন নববধূর প্রতি উপেক্ষা ও স্নেহহীনতা, সতীনের প্রতি হিংস্রভাব, ঘর-জামাইয়ের উপর অশ্রদ্ধা, নববিবাহিত পুত্রের উপর মায়ের সতর্ক দৃষ্টি— এইসব এই ছড়াগুলির মধ্য থেকে ফুটে বেরোয়। বাঙলার মায়েদের যে

স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় আমরা 'ছেলে ভুলানো ছড়া'য় পাই, সেই মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারা এগুলির মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'Journal of the Department of Letters'-এর অষ্টাদশ খণ্ডে (১৯২৮) ডঃ সেন 'women's Dialect in Bengali' নামে একটি দীর্ঘ মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখক ৩১০টি প্রবাদ বিষয় অনুসারে সংকলিত করেছেন এবং এগুলির ইংরাজী অনুবাদও প্রদত্ত হয়েছে। এ ছাড়াও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ২৫টি প্রবাদের ইংরাজী অনুবাদ লেখক উপস্থিত করেছেন।

'বেতার জগতে' (১৯৫২) আচার্য সেন লিখেছিলেন 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধটি। ঐ একই পত্রিকায় (১৯৫৩) লিখেছিলেন আর একটি প্রবন্ধ, 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। এই দুটি রচনাই পরবর্তী কালে 'বিচিত্র সাহিত্য' (২য় খণ্ড ১৩৬৩) গ্রন্থে বিধৃত হয়। 'লোকসাহিত্যে' ছড়ার মধ্যেই লেখক সর্বকালের আদিম কবিতার বীজের সন্ধান পেয়েছেন। মন্তব্য করেছেন 'আদি মানব জননীর কণ্ঠের অর্থহীন ছড়ার টানা সুর ছন্দের জন্ম দিয়েছে।'

ছড়ার সংগে কবিতার পার্থক্য টানতে গিয়ে লেখক চমৎকার ভাবে বলেছেন, 'সাধারণ কবিতায় লেখবার সময় কবির কল্পনা বিচরণ করে ভাব থেকে রূপে, রস থেকে ভাষায়। ছড়া কবিতায় লেখকের কল্পনা যায় রূপ থেকে ভাবে, ভাষা থেকে রসে—।'

বেশ কিছু ছড়ার দৃষ্টান্তে লেখক বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন, তথা সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

'লোকসাহিত্যের ভাষা' প্রবন্ধটির প্রকাশস্থল 'বেতারজগৎ' (৭ই জুন, ১৯৭৭)। অনেকের মনে এরকম একটা ধারণা আছে যে—লোকসাহিত্যের পৃথক কোন ভাষা বৈশিষ্ট্য নেই। প্রবীণ ভাষাতাত্ত্বিক তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই সেই বিভ্রান্তির নিরসন করেছেন।

'লোক-সাহিত্যের ভাষা ও সাধারণ সাহিত্যের ভাষা বাইরের দৃষ্টিতে এক। বাংলা দেশের লোক সাহিত্যের ভাষাও বাংলা, সাধারণ সাহিত্যের ভাষাও বাংলা। তাহলে আলাদা করে লোক-সাহিত্যের ভাষা বলি কেন ? বলি এইজন্যে যে দুটি ভাষা সর্বদা এক ছাঁচে গড়া নয়। তাই লোক-সাহিত্যের বস্তু যদি তা খাঁটি অর্থাৎ সাক্ষাৎ লোকমুখ থেকে অবিকৃত ভাবে ধরা হয় তবে সব অঞ্চলের বাংলা ভাষীদের সহজে ও সর্বদা বোধগম্য নাও হতে পারে।

অর্থাৎ লোক-সাহিত্যের ভাষা উপভাষা (ডায়ালেক্ট) অনুসারী। শুধু তাই নয়, সে ভাষায় প্রায়ই উপভাষার এমনকি নিভাষার (অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার) ছাপও মেলে। সুতরাং বলতে পারি, সাধারণ সাহিত্যের ভাষা থেকে লোক-সাহিত্যের ভাষার জাত আলাদা নয়, তবে পাঁত আলাদা।'

সুকুমার বাবু স্বীকার করেছেন লোক-সাহিত্যের ছড়ায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলির অর্থভেদ অসম্ভব। আরও বলেছেন লোকগল্পে বৈচিত্র্য অধিক হলেও 'ভাষার দিক দিয়ে ছড়ার তুলনায় এতে গোলমাল খুব কম।' কেন কম, তারও চমৎকার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন প্রবীণ চিন্তাবিদ্ লেখক, 'ছড়া ও গল্প দুইয়ের বাহন মুখ। তবে দুইয়ের শ্রোতার আসর ভিন্ন রকম। ছড়ার শ্রোতা সাধারণতঃ একজন, বিশেষ করে ঘুমপাড়ানিতে। আর বক্তা ও শ্রোতা দুজনেই ঘুমের উপাসক, একজন খরিদ্দার, আর একজন দালাল। তাই ছড়ায় ভাষার ছন্দে বক্তার সতর্কতার প্রয়োজন নেই। গল্পের বক্তাও একজন, তবে শ্রোতা একজন হতে পারে, অনেকজন হতে পারে। গল্প শোনবার সময় শ্রোতা নিদ্রাতুর থাকে না, বরঞ্চ গল্পের রসে তার ঘুমের ভাব কেটে যায়। সে কান পেতে মন দিয়ে শুনতে শুনতে ঘুমকে তাড়িয়ে রাখে। বক্তা বেফাঁস কিছু বললে প্রশ্ন করে। এই জন্যে গল্প বলিয়েকে সতর্ক থাকতে হয়। প্রধানত সেই কারণে ছেলে ভুলানো গল্পে বা রূপকথায় ভাষার বৈষম্য নেই। তবে উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে এবং থাকাও উচিত।'

'লোক-সাহিত্যে গাথা' শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রকাশ স্থলও 'বেতার জগৎ' পত্রিকা (১৯৫৩)। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধটি 'বিচিত্র সাহিত্যে'র ২য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৩৬৩)। প্রবন্ধটিতে লেখক বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন ভাদুগানের উল্লেখ করেছেন। লোক-সাহিত্যের দুটি লক্ষণের ওপর লেখক বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। একটি লক্ষণকে লেখক বলেছেন 'জৈব'। এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই অতীতের সঙ্গে বর্তমান তথা সমসাময়িকতার সংযোগ-রক্ষার প্রাণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে, 'লোক-সাহিত্যের ঝোঁক পড়েছে 'লোক'এর উপর, 'সাহিত্য'-এর উপর নয়।'

"গল্পের গাঁট ছড়া" প্রবন্ধটির প্রকাশ স্থল শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা (১৩৮৪)। এই প্রবন্ধে লেখক একটি বাংলা লৌকিক গল্পের সঙ্গে দুটি জার্মান গল্পের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বাংলা গল্পটির সংগ্রাহক ছিলেন "Grammar of the Bengali Language" রচয়িতা হ্যালহেড। গল্পটি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই সংগৃহীত হয়েছিল।

"ঈগল" পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় (১৯৭৯) প্রকাশিত "বেটা কর্তা ও শাশুড়ী গিন্নী' শীর্ষক ক্ষুদ্র রচনাটিতেও লেখককে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে দেখা গেছে। উইলিয়াম কেরীর "ইতিহাস মালা"য় (১৮১২) সংকলিত একটি গল্পের সঙ্গে একটি জার্মান গল্পের তুলনা করেছেন এবং প্রতিপাদ্য করেছেন গল্পটির উৎস ভূমি বাংলাদেশ।

লোক-সংস্কৃতি যে আচার্য সেনের প্রিয় বিষয় ছিল, তার অন্য প্রমাণও রয়েছে। বেশ কয়েকটি লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকা তিনি রচনা করেছেন এবং সেইসব ভূমিকাতেও অনেক নূতন কথা, ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। তাছাড়া বেশ কয়েকজন গবেষক তাঁর অধীনে লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণাও করেছেন।

ডঃ ভবতারণ দত্ত আচার্য সেনের অধীনে "বাংলাদেশের ছড়া" (১৩৭৭) নিয়ে গবেষণা করেছেন। 'বাংলা দেশের ছড়া' গ্রন্থটির ভূমিকায় আচার্য সেন 'ছড়া' শব্দটির ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন। বলেছেন, 'ছড়া শব্দটি পুরানো, কিন্তু এ অর্থে নয়। কবিতা, কবিতাছত্র, কবিতা ছত্রাংশ অর্থে শব্দটির ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পাই নি। তবে লোক ব্যবহারে ঐ অর্থ ছিল সন্দেহ নেই। সাধারণ লোক গদ্য জানত না, 'পদ্য' শব্দও অপরিচিত ছিল। মঙ্গলগান, পাঁচালি, যাত্রা, কথকতায় গদ্য কিছু থাকলে তা শুধু গায়েন কথকদের মন্তব্যে, সুতরাং তা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ টানত না। যা টানত তা হল গান আর কবিতা ছত্র, অথবা কবিতা ছত্রের অংশ আবৃত্তি। এই শেষোক্তই 'ছড়া'। শব্দটির দুই প্রতিষ্ঠিত অর্থ। (১) প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; (২) গ্রথিত গাঁথা মালা ছড়া পরে অর্থ হল ছুটকো ছন্দময় রচনা। এই গ্রন্থের "শিশুবেদ" শীর্ষক ভূমিকাংশে লেখক ছড়াকে যে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার কথা জানিয়েছেন তা হল 'ঘুম পাড়ানি' 'মন ভোলানি' ও 'খেলা চালানি'। এই বিভাগ তিনি করেছেন শ্রোতার বয়স এবং বক্তার অথবা শ্রোতার অথবা উভয়েরই প্রয়োজনের নিরিখে।

ডঃ কমলেশ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার', বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র ভূমিকা (১৯৮০) গ্রন্থের দু'চার কথায় সুকুমার বাবু মিথের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "প্রাচীনতম মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রণোদিত অলৌকিক রসের ঘটনানির্ভর কাহিনী মালার নামই মিথ।"

ডঃ রফিকুল ইসলাম আচার্য সেনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেছেন লোকগল্প নিয়ে। তাঁর বিষয় হল "নিম্ন দামোদরের লোকগল্প।' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় আচার্য সেন জানিয়েছেন, হুগলী ও বর্ধমান জেলার নিম্ন

দামোদর অঞ্চল লৌকিক গল্পের খনি বিশেষ। উইলিয়াম কেরী সম্পাদিত "ইতিহাস মালা"য় (১৮১২) এতদঞ্চলের বেশ কিছু গল্প গ্রথিত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। লালবিহারীদে'র "ফোকটেলস্ অব্ বেঙ্গলে" ও এই অঞ্চলের কিছু লৌকিক গল্প সংকলিত হয়েছে।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাঙলার গ্রাম্য ছড়া' (১৯৭৩) গ্রন্থের ভূমিকা সুকুমার সেনের। ভূমিকায় তিনি কৃত্তিবাসের কারণে এদেশে রাম কাহিনী বহুল প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলা দেশের ছড়ায় কৃষ্ণকাহিনী এবং শিবকথার প্রাচুর্যের কারণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বর্তমান লেখকের 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে'র (১৯৭৭) প্রস্তাবনায় আচার্য সেন বাংলায় লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস যে সুপ্রাচীন, একেবারে গ্রীম ভায়েদের গল্পমালার ১ম খণ্ড প্রকাশের (১৮১২) সমসাময়িক, সেই বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করেছেন, আর সেইসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "আমাদের লোক-সাহিত্য চর্চায় হাতে খড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু হাতে খড়ি নয়, এবিষয়ে আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রও কানে দিয়ে গেছেন।"

মৎপ্রণীত "বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্রে"র (১৯৭৯) ভূমিকাও সুকুমার সেনের। সেনমশাই ভূমিকায় একটি প্রচলিত বাংলা ছড়ার নূতন ব্যাখ্যা দান করায় ভূমিকাটি বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' শীর্ষক ছড়াটিতে যে তিন কন্যার উল্লেখ আছে, সুকুমার সেনের মতে তাঁরা হলেন যথাক্রমে চণ্ডী বা কেতকা, গঙ্গা এবং সতী। ছড়াটির নায়ক স্বয়ং শিব, অন্য কেউ নন।

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা রচিত 'রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা' (১৯৭৯) গ্রন্থের 'উদ্বোধন' অংশে আচার্যদেব গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলি প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন। লখন মাঝিকে রামকথার অভিনব রূপান্তর বলে মন্তব্য করেছেন। প্রচলিত শীত বসন্তের কাহিনীর সঙ্গেও সাদৃশ্যের সন্ধান করেছেন।

পরিশেষে তাই বলতে হয় বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় আচার্য সুকুমার সেনের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভূমিকাকে বাদ দিয়ে বা লঘু করে বিজ্ঞাননিষ্ঠ ভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস রচনা অসম্ভব।